ক্রান্তদর্শী

তৃতীয় পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীঅরুণকুমার দত্ত

করকমলেষু

ভূমিকা

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে লজ্জাকর অধ্যায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাহাঙ্গামা। প্রথমে কলকাতায়, তারপরে নোয়াখালীতে, তারপরে বিহারে। পরের বছর এর জের চলে পাঞ্জাবে। সেইখানেই চরম সীমা।

সেই লজ্জাকর অধ্যায় বাদ দিলে আমার এই উপন্যাসের সত্যতাহানি হবে। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না ভাবীকালের পাঠকদের কেন দেশভাগ প্রদেশভাগ হলো। অথচ এর বিশদ বিবরণ লিখতে গেলে আমার স্বাস্থ্যহানি হবে। এতই নিষ্ঠুর সে অধ্যায়। আটত্রিশ বছর পরেও আমরা প্রকৃতিস্থ হতে পেরেছি কি-না সন্দেহ।

বাংলার তৎকালীন গভর্নর তৎকালীন সেক্রেটারি অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে কলকাতার দাঙ্গার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Somme-এর যুদ্ধে তিনি যে বীভৎসতা দেখেছিলেন কলকাতার দাঙ্গার বীভৎসতা তারই সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর চোখের সামনেই একটা লোক খুন হয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় গলিত শব। কেউ সৎকার করছে না। মেথররাও ছোঁবে না। সৈনিকদের দিয়ে সৎকার করাতে হয়। এমনি অনেক কথা।

গভর্নরের রিপোর্টের মতো আরো কয়েকজন বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি বড়লাটকে লেখা। বড়লাট আসতে চেয়েছিলেন। গভর্নর তাঁকে বারণ করেন। সময় অনুপযোগী। বড়লাট বিচলিত হয়ে গান্ধীজীকে ও জবাহরলালজীকে অনুরোধ করেন মুসলিম লীগকে কিছু কনসেসন দিতে। তা না হলে লীগপন্থীরা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবেন না। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট অঙ্গহীন হবে। তেমন একটা গভর্নমেণ্ট গঠন করা সমীচীন হবে না। নেতারা বলেন, তা হলে আমাদের আমন্ত্রণ করার প্রয়োজন কী ছিল? কনসেসন আমরা যা দিয়েছি তার বেশী দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়। দাঙ্গা বাধিয়ে কনসেসন আদায় করা তো ব্ল্যাকমেল।

গান্ধী ও নেহরু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান। তখন অ্যাটলী ওয়েভেলকে নির্দেশ দেন যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদের নিয়ে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করতে। যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁরা আপাতত বাইরে

থাকুন। ওয়েভেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই করেন। লীগপন্থীরা বিনা কনসেনেই পরে যোগ দেন। কিন্তু একটা নতুন খেলা খেলেন। একজন তফশীলি হিন্দুকেও মুসলিম লীগের ভাগ থেকে একটা আসন দিয়ে কংগ্রেসের উপর টেক্কা দেন।

আমার উপন্যাসের এই পর্বটিতে ১৯৪৬ সালের শেষপর্যন্ত কাহিনীর গতি এগিয়েছে। কিন্তু কেউ যেন না মনে করেন যে আমি উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেছি। ইতিহাস আরো বেশী জায়গার দাবী রাখে। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার' নামক বারো খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে এই পর্বটিকে দুই খণ্ড দিয়েছেন। প্রত্যেকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা বড়ো মাপের হাজারের মতো। বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপনীয়। পঞ্চাশ বছরের আগে প্রকাশ করতে মানা। তবে ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ত্রিশবছর পরে প্রকাশ শুরু হয়েছে। নেতারা কে কী বলেছেন, কে কী চেয়েছেন এসব তো আছেই, সরকারপক্ষে কে কী বলেছেন বা লিখেছেন তাও আছে।

এই দুই খণ্ডের দাম দেড় হাজার টাকার মতো। এর পরের চার খণ্ডের দাম পাঁচ হাজার টাকার মতো। আমার সামর্থ্য কী আমি এত হাজার টাকা খরচ করি? আমার বন্ধু বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট শ্রীঅরুণকুমার দত্ত পুরো বারো খণ্ডের সেট কিনেছেন। তাঁরই সৌজন্যে আমি মাঝখানকার চার খণ্ড পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এর পরে আরো দু'খণ্ড বাকী। কী করে তাঁকে আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব? এই বইগুলি না পড়লে আমার চোখ ফুটত না। আমি একতরফা বিচার করতুম।

জিন্না সাহেবের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার আছে। লর্ড ওয়েভেলের দিক থেকেও। বিচার যিনি করবেন তাঁকে সব দিক বিবেচনা করতে হবে। সুহরাবর্দীও শয়তান ছিলেন না। আমাকে আমার অনেক ধারণা সংশোধন করতে হয়েছে। বাংলার লাট বারোজ সাহেবকে আমি ভুল বুঝেছিলুম। বড়লাট লর্ড ওয়েভেলকেও। বারোজ বাংলার পার্টিশন সমর্থন করেননি। ওয়েভেল বাংলার একাংশ হিন্দুদের দিয়ে যাবার কল্পনা করেছিলেন। সেটা তিনি করতেন আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে, অপসরণকালে। আশ্চর্যের ব্যাপার সর্দার বল্লভভাই সেটার প্রস্তাব করেছিলেন ১৯৪৬ সালেই। ওয়েভেল তখন রাজী হননি।

যেসব তথ্য ত্রিশ বছর আগে কেউ জানত না সেসব আমার উপন্যাসের

পাত্রপাত্রীরা জানত কী করে? আর সকলের মতো তারাও ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিল। ভুল ধারণা থেকে কত কী ঘটে! ঔপন্যাসিক কী করে তাকে অঘটিত করবে? যদ্‌দৃষ্টং তল্লিখিতং। ঔপন্যাসিক তার যুগকে অতিক্রম করতে পারে না।

ওয়েভেল নিজেই জানতেন না ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবেন। আরো পনেরো বছর ভারত শাসন করবেন না আরো আঠারো মাসের মধ্যে শাসন গুটিয়ে নেবেন? ইউরোপীয় অফিসারদের অধিকাংশই ঘরমুখো। তাঁরা ক্ষতিপূরণ আশা করেন। পেলে ভালো, না পেলেও তাঁরা যাবেনই। বেসরকারী ইউরোপীয়রা ব্যবসাবাণিজ্য ফেলে চলে যেতে উদ্‌গ্রীব নন, কিন্তু তাঁদের পরিবারদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সরকারও দিতে বলছেন। জিন্না যদি জেহাদ ঘোষণা করেন তা হলে শ্বেতাঙ্গরাও রক্ষা পাবেন না। আর জয়প্রকাশ নাকি শ্বেতাঙ্গবধের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য শ্বেতাঙ্গরাও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে জড়ো হয়ে আত্মরক্ষা করতেন। তারপর বদলা নিতেন।

ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট সচল হলেও কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী অচল হয়েছিল। মাইনারিটি যদি যোগ না দেয় তবে মেজরিটি কি তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটলী জানিয়ে দেন যে মেজরিটির তৈরি শাসনতন্ত্র তাঁর সরকার অনিচ্ছুক অংশগুলির উপর চাপিয়ে দেবেন না। ফলে ভারত ভাগ হয়ে যাবে। আমরা ডিসেম্বর শেষ করি ভারতভাগের সম্ভাবনা নিয়ে, যদি মুসলিম লীগ কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে না যায়। তাকে কিছু কনসেসন যদি দাও তা হলেই সে যাবে। কংগ্রেস তাতে নারাজ। এসব কথা পরের পর্বের জন্যে হাতে রাখছি। সেটাই শেষ পর্ব।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ক্রান্তদর্শী

(তৃতীয় পর্ব)

॥ এক ॥

প্যারিসের পতনের খবর শুনে স্বপনদা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদেছিলেন। তখন তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে কেউ ছিলেন না। দীপিকাদির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। পাঁচ বছর বাদে বার্লিনের পতনের সংবাদ পেয়ে তিনি সেই যে কাঁদতে শুরু করলেন চব্বিশ ঘণ্টা পরেও তার বিরাম নেই। বৌদি তো জেরবার।

"তুমি যে একজন প্রচ্ছন্ন নাৎসী তা যদি আমি জানতুম তা হলে তোমাকে বিয়ে করতুম না। হিটলার মরেছে, তাতে তোমার কী? কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার!" বৌদি ব্যঙ্গ করেন।

'না, না, আমার এ শোক হিটলারের জন্যে নয়। জার্মান জাতির জন্যে। ওরা পরাজিত, পরাধীন, দ্বিধাবিভক্ত। বিসমার্কের ঐক্যসাধনা সমাপ্ত করতে এসে হিটলার সেটাকে ধ্বংস করে গেলেন। বুদ্ধিমান হলে তিনি জানতেন কোথায় থামতে হয়। থামা উচিত ছিল মিউনিক চুক্তির পর। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানভাষী অঞ্চলটা গ্রাস করে দাঁড়ি টানা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া গ্রাস করা হয়ে গেছে। তা হলে জার্মান জাতির ঐক্য সাধনার আর কী বাকী থাকতে পারে! তা নয়। মাথায় ঘুরছিল সাতশো বছরের স্বপ্নসাধ। 'ড্রাঙ্ক নাথ অস্টেন।' পূব মুখে অভিযান। পূব দিকে দিগ্বিজয়। টিউটনিক অর্ডারের সন্ন্যাসীরা যা আরম্ভ করেছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী এক ব্রহ্মচারী তাই শেষ করবেন। হিটলার শুধু বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আসেননি, এসেছিলেন টিউটনিক অর্ডারের অসমাপ্ত কর্ম সমাধা করতে। বলটিক থেকে বলকান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড টিউটনদের জন্যে চাই। স্লাভদের ভূমি কেড়ে নিতে হবে। স্লাভরা হবে স্লেভ। এই সাতশো বছরে দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বড়ো কম হয়নি। স্লাভরা এবার পশ্চিম মুখে অভিযান চালিয়ে বার্লিনসমেত পূর্ব জার্মানী গ্রাস করেছে। ওদের রাহুগ্রাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিনদেরও রাহুগ্রাস। এরা গ্রাস করেছে পশ্চিম জার্মানী। গোটা জার্মানীর এবার পূর্ণ গ্রাস। এমন এক রত্তি জায়গা নেই যেখানে জার্মানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জার্মান রাষ্ট্রই নেই। জার্মান

সরকারই নেই। তবে সন্ধি হবে কার সঙ্গে কার? সন্ধি না হলে শান্তি হবে কী করে? শান্তি বৈঠক বসবে কী করতে? আমি তো চোখে আঁধার দেখছি, রাম্নু। ছেড়ে দাও গো, কেঁদে বাঁচি।" স্বপনদা কাতর কণ্ঠে বলেন।

"বিসমার্ক পই পই করে বারণ করেছিলেন দুই ফ্রণ্টে লড়তে। কাইজার কর্ণপাত করেনি। হিটলারও না। মস্কো, লেনিনগ্রাড, স্টালিনগ্রাড কেড়ে নিতে গেলে বার্লিন, লাইপৎসিগ, ভাইমার হারাতে হয়। জার্মানরা সাতশো বছর ধরে স্লাভদের জ্বালিয়েছে। এবার দু'শো বছর ধরে স্লাভদের দ্বারা জ্বালাতন হোক। সন্ধি! কিসের সন্ধি! সন্ধির মর্যাদা কি জার্মানরা মানে? কাইজার বলেছিলেন, স্ক্র্যাপ অফ পেপার। হিটলার তো ততটুকুও স্বীকার করেনি। এই তো জার্মান ঐতিহ্য! সন্ধি করলে সন্ধির খেলাপ হবেই। বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে জার্মানী ভাগাভাগি করে নিয়েছে। যতদিন না নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধে ততদিন শান্তি অবধারিত।" বৌদি আশ্বাস দেন।

স্বপনদা বিলাপের স্বরে বলেন, "কেন বৃথা স্তোক দিচ্ছ, রাম্নু? বাঘে গোরুতে দুর্দিনের সময় একঘাটে জল খায় বলে কি সব সময় একঘাটে জল খায়? পরে একদিন বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে গোরুর ঘাড়ে। গোরু যদি মোষ হয়ে থাকে তবে সেও তার শিং দিয়ে বাঘকে জব্দ করে। বাঘে মহিষে লড়াইয়ের অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। সেইরকম একটা লড়াই একদিন বেধে যাবে দুই প্রতিবেশী শিবিরে। যদি না ইতিমধ্যে একটা বাফার স্টেট খাড়া হয় আর দুই শিবিরের সৈন্যদল জার্মানী পরিত্যাগ করে। বাফার স্টেটই এর সমাধান।"

বৌদি তর্ক করেন। "ওটা যে ভবিষ্যতে বাফার থাকবে এ গ্যারান্টি দেবে কে? একটা পার্টি যাবে, আরেকটা পার্টি আসবে, পার্টির বড়ো কর্তা নয়া নাৎসী বিটলার। তিনিও ছদ্মনামে এক সৈন্যদল গড়ে তুলবেন। অন্য নামে অস্ত্র তৈরি করবেন। তুমি কি মনে কর প্রত্যেকবারেই রুশ মার্কিন একজোট হবে? বিটলার একদিকেই বেশী করে ঝুঁকবেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মাখামাখি করবেন। ব্রিটেনের সঙ্গে কোলাকুলি করবেন। মার্কিনের সঙ্গে গলাগলি করবেন। পরের বার দুই ফ্রণ্টে লড়াই নয়। কেবল পূব মুখে অভিযান। রাশিয়া কেন তেমন ঝুঁকি নেবে? আধখানা জার্মানী হাতে রাখাই ওর বিচারে

নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বলা বাহুল্য সেটা হবে কমিউনিস্ট শাসিত অংশ। হয়তো অত বেশী লালচে নয়।"

"তুমি দেখছি ক্রিপ্টো-কমিউনিস্ট। তা নইলে সোভিয়েটের দিকে টেনে বলতে না স্টালিনের উচিত ছিল নিজের জায়গা ফেরৎ পেয়ে সেইখানে দাঁড়ি টানা। বড়ো জোর পোলাণ্ড অধিকার করে তাকে বাফার স্টেট করা। কিন্তু ওঁরও মাথায় ঘুরছে বিপ্লবকে জার্মানীতে রফতানী করা। জার্মান কমিউনিস্টদের মদত দেওয়া। তা নইলে বার্লিন পর্যন্ত ধাওয়া করার কী সার্থকতা থাকতে পারে? রাশিয়ানরা ধাওয়া না করলে ইঙ্গ-মার্কিনরাও ধাওয়া করত না। জার্মানীর খানিকটা স্বাধীন ও সার্বভৌম থেকে যেত।" স্বপনদার ধারণা।

"ওটা তোমার ভুল। দুই শিবিরই একবাক্যে দাবী করেছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। সেটা মেনে নিলে স্বাধীন ও সার্বভৌম জার্মানী বলে কিছু থাকে না। তার ধড়টা আস্ত থাকতে পারত, কিন্তু তার হাড়-গোড় ভেঙে দেওয়া হতো। মিলিটারি ও আধা মিলিটারি হচ্ছে হাড়গোড়। দুই শিবিরই পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দখলদার ফৌজ মোতায়েন করত। জার্মানরা ভাঙবে, তবু মচকাবে না। পরাজিত হবে, তবু বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। যা হবার তা হয়েছে। এতে শোক করবার কী আছে? সুখী হবারই বা কী আছে? আমি কাঁদবও না, হাসবও না। এই নরমেধযজ্ঞ যে শেষ হয়ে এসেছে এই আমার কাছে যথেষ্ট। এখন দেখা যাক জাপান আর কতদিন খাড়া থাকে। ইটালী তো ইতিমধ্যেই কাৎ হয়েছে। মুসোলিনি নিপাত।" বৌদি বলেন।

নিচের তলায় একটা সোরগোল শোনা গেল। এলফ কাকে যেন ঢুকতে দিচ্ছে না, ঘেউ ঘেউ করছে। বাবলী বলছে, "এলফ, লক্ষ্মীটি, ওকে পথ ছেড়ে দে। ও খাবার নিয়ে এসেছে।" বৌদি নেমে গিয়ে দেখেন ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামানো হয়েছে মিষ্টির ভাঁড় আর মাছের ঝাঁকা। বিরাট কাতলা মাছ। বাবলীদের ভেড়ীর মুটে বয়ে নিয়ে উপরে যেতে চায়, এলফ তাকে আগলে রাখছে।

"বৌদি, তুমি এলফকে বুঝিয়ে বলো দেখি পমেরানিয়া এখন আমাদের দখলে। কাজেই এলফ এখন আমাদের কুকুর।" বাবলীর লজিক।

"ব্যাপার কী, বাবলী?" বৌদি আশ্চর্য হন। এসব কেন?"

"কেন? তুমি কি জানো না যে আমরাই জিতেছি? এটা আমাদের

ভিকট্রি সেলিব্রেশন। বার্লিন যার জার্মানী তার। তবে সবটা নয়, এই যা আফসোস। বর্বর, বনমানুষ, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান হিটলার নরকে গেছে। কিন্তু যাবার আগে আমাদের সঙ্গে শঠতা করে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাকে ডেকে এনে আধখানা জার্মানী ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ওরাও জয়ের অংশীদার। কী অন্যায়!"

বৌদি কোনো মতে হাসি চেপে তাঁকে উপরে নিয়ে যান। তার সঙ্গের লোকটিকে নিচের তলায় দিয়ে যান চাকরদের জিম্মা। তাদেরই একজন উপরে নিয়ে যায় মিষ্টি আর মাছ।

উপহার দেখে তো স্বপনদা হতবাক্। ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেন, কেন?

"আজ হমারা ঈদ হ্যায়। আজ আমাদের বিজয়া দশমী। আমরা মহিষাসুরকে পরাস্ত করেছি। মহিষাসুর শুধু পরাস্ত নয়, নিহত। শুনছি স্বহস্তে নিহত, কিন্তু সেটা বোধহয় মার্কিন অপপ্রচার। সত্য বোধহয় এই যে সোভিয়েট বোমারু ওর গুহা তাক করে বোমা বর্ষণ করেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তবে ওর লাশ দাখিল করে প্রমাণ করতে পারা যাচ্ছে না যে বোমার ঘায়েই মৃত। ও তো কম ফন্দীবাজ নয়। ইতিহাসের জন্যে একটা ধাঁধা রেখে দিয়ে গেছে। জীবিত না মৃত। মৃত হলে কার হাতে নিহত।" বাবলী বকবক করে যায়।

স্বপনদা ধরা গলায় বলেন, "গ্যাখ, চকোলেট, কেউ মারা গেলে তার সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলতে হয়, আপাতত মন্দ কথা বলতে নেই। এটাই সভ্য সমাজের রীতি। হিটলার এখন সব নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, সেটা একটা ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গ। ভাবীকালের উপরে ছেড়ে দাও সেই ভূমিকার বিচারভার। আমি আজ বিচার করব না, শুধু বলব হিটলার জার্মানীকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করে জার্মানদের হৃদয় জয় করেছিলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকেও ত্রাণ করেছিলেন তিনি। এর জন্যেও জার্মানরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যস্, এইপর্যন্ত। এর পরের অধ্যায়টা সম্বন্ধে আমি মৌন।"

"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আরো ঠিক হতো যদি বলতে যে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকে বুর্জোয়াদের ত্রাণ করেছিল সে। কিন্তু নীট ফল কী হলো? আধখানা জার্মানী তো কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের হাতে পড়ল। জার্মান বাসিন্দারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। খালি পূর্ব জার্মানী থেকে নয়,

সোভিয়েট অধিকৃত পোলাণ্ড থেকেও, বলটিক থেকেও। তাদের সবাই যে বুর্জোয়া তা নয়। শ্রমিক কৃষকরাও আতঙ্কিত। কারণটা শ্রেণীগত নয়, জাতিগত। এক জাতি অপর এক জাতির দাস হয়ে থাকতে রাজী নয়। হিটলার দেখিয়ে দিয়েছে কেমন করে অন্য জাতিকে দাস করতে হয়। শুধু কি তাই? কেমন করে জেনোসাইড করতে হয়। স্লাভরা যদি এর বদলা নেয় তা হলেই হয়েছে!" বৌদি শঙ্কা প্রকাশ করেন।

"ওটা তোমার ভ্রম, বৌদি। আমরা শ্রেণীশত্রুকে খতম করতে পারি, কিন্তু জাতিকে জাতি নিকাশ করতে পারিনে। জার্মানরা যা করেছে তার প্রতিফলের ভয়ে পালাচ্ছে। আমরা তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিনে। ওরা থাকুক, মার্ক্সবাদের কলমা পড়ুক। তাতে আমাদেরি বল বাড়বে।" বাবলী অভয় দেয়।

স্বপনদা মৌনভঙ্গ করেন। "কিন্তু মার্শাল স্টালিন তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ভুলটা করবেন যদি চার্চিল ও ট্রুম্যানকে বার্লিনের আধখানা ছেড়ে দেন। শুনছি সেইরকম চুক্তি হয়েছে। চুক্তির খেলাপ করলেই লড়াই। না করলেও ঝগড়াঝাটি। ভাবা যায় না বার্লিন কী করে ভাগ হবে। লাইন টানা হবে কোথায়। আমার তো ভাবতে গিয়ে কান্না পাচ্ছে।" স্বপনদা চোখে রুমাল দেন।

"ন্যাকামি রাখো। মালপোয়াতে ভাগ বসাও। নয়তো সব আমরা দুই বান্ধবীতেই সেবা করব। বৈষ্ণবদের ভাষায়। হ্যাঁ, ভাই, তোমাদের গৃহদেবতা কি রাধাগোবিন্দ?" বাবলীকে শুধান বৌদি।

"ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। সঙ্গে রাধা আছেন বইকি। তিনিই তো প্রধানা গোপী। ঠাকুরঘরের ধারে কাছে মাছ মাংস চলে না। ওটা আমরা শতহস্ত দূরে বসে খাই। নিরামিষ হেঁসেল থেকে আমিষ হেঁসেলও তেমনি দূরে। পুরনো বাড়ী, পুরনো প্রথা। জীবিকাটাও তো পুরোনো। আমি হচ্ছি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। না, না, প্রহ্লাদকুলের দৈত্য।" বাবলী হেসে ওঠে।

"তা তোমাকে দৈত্যের মতো দেখতে হলে তো? এত নরম মেয়ে কী করে এত ভয়ঙ্কর কর্ম করে তার মর্ম আমি আজও বুঝতে পারিনে। ক্ষীরের ছুরি বলে একটা কথা আছে। তুমি কি সেই ক্ষীরের ছুরি? সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়লে কেমন করে?" বৌদি কৌতূহলী হন।

"সে অনেক কথা, বৌদি।" বাবলী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। "আচ্ছা, একটুখানি বলি। আমি রোমাণ্টিক প্রেমে পড়েছিলুম। প্রেমটা দেশপ্রেমের আকার নিয়েছিল। পাগলিনী কী না করতে পারে! সে পাগলামি এতদিনে সেরে গেছে। তিনি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছেন। বুর্জোয়া সংসার। দেখে শিউরে উঠি। ভাগ্যিস, বিয়ে করিনি। এ সমাজে বিয়ে করলে আর কিছু করা যায় না। আমাকে বিয়ে করবেই বা কে!" বাবলী দেঁতো হাসি হাসে।

"কেন, তোমার কমরেডদের মধ্যে তেমন কেউ কি নেই? সবাই কি চিরকুমার থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?" বৌদি প্রশ্ন করেন।

"না, সবাই নন। তাই যদি হতো আমাদের কমিউন ভেঙে যেত না। গেল যত না সরকারী নেকনজরে তার চেয়ে বেশী নিজেদেরই ঘরসংসার করার বাসনায়। মেয়েদের দুর্বলতা কোথায়, জানো তো? ওরা বয়স থাকতে মা হতে চায়। এ সমাজে বিয়ে না করে মা হওয়া যায় না। দেশশুদ্ধ লোক কমিউনিস্ট হলেও এ সংস্কার কাটিয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। কমিউনিস্ট কন্যারাও বিয়ের জন্যে আপস করবে। বরপণ দিয়ে বিয়ে করবে। যদি না এক সর্বশক্তিমান ডিকটেটর চরম দণ্ড দিয়ে ওসব বন্ধ করেন। আর, সব শিশুকে বৈধ বলে গণ্য করেন। আমাদের হবু ডিকটেটররা বোনের বা মেয়ের বিয়ের সময় সমাজের কাছে কেঁচো। তবে বলা যায় না, বিপ্লবের পরে নতুন হাওয়া বইতেও পারে। আগে তো মেয়েদের প্রত্যেককে জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে বিয়ে না করে মা হলে কারো জীবিকা যাবে না। সন্তানের জন্যেও সুব্যবস্থা হবে। তখন ছেলেরাই ছুটবে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে।" বাবলী স্বপ্ন দেখে।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" বৌদি ভরসা দেন। "তখন তোমাকেও আমরা পাত্রস্থ করব, বাবলী।"

"ততদিনে আমার মা হবার বয়স পেরিয়ে গিয়ে থাকবে, বৌদি।" বাবলী বলে।

স্বপনদা ও প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে বলেন, "মরার আগে হিটলার তাঁর দুই মহাশত্রুকেও মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছেন। কান ধরাধরি করে বসে থাকুন ওঁরা ইউরোপের মধ্যিখানে যতদিন পারেন। কিন্তু একচুল এদিক ওদিক হলেই বেধে যাবে মহামারী। এটা একটা আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। ইতিহাসে

আর কখনো এমনটি দেখা যায়নি। এর থেকে বোঝা যায় হিটলার লোকটা কত বড়ো চালবাজ। এটা কার জিৎ? হিটলারের না স্টালিন, চার্চিল, ট্রুম্যানের? এর উত্তর তোমরা এই মুহূর্তে পাবে না। পাবে ত্রিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বাদে। যখন দেখবে তোমরা ওখানে বসে আছো স্বেচ্ছায় নয়, হিটলারের ইচ্ছায়। হিটলার নেই, তাঁর ভূত আছে। সে ভূত পেছন থেকে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। তোমাদের ফ্রী উইল একটা মায়া। তোমাদের প্রত্যেকটি পলিসি আগে থেকে ডিটারমিন্‌ড। তখন বুঝবে যে গায়ের জোরে জেতাটাই জিৎ নয়। সত্যিকার জিৎ হচ্ছে যুদ্ধজয়ের পর শান্তিজয়। ভিক্‌ট্রি সেলিব্রেশনের দিন আসবে সেইদিনই যেদিন শান্তি স্থাপিত হবে। সে শান্তি মার্কিন সৈন্যদের ফেরৎ পাঠাবে আমেরিকায়, রুশ সৈন্যদের রাশিয়ায়। ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্রিটেনে। ইউরোপের সব ক'টা রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করে ইউনাইটেড স্টেটস অভ্‌ ইউরোপ পত্তন করবে। রাশিয়া বাদে। তার আলাদা একটা ইউনিয়ন। সংযুক্ত ইউরোপ ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ের একটা সমন্বয় খুঁজে বার করবে। গণতন্ত্রই হবে মূলভিত্তি। কিন্তু নামকাওয়াস্তে গণতন্ত্র নয়। বিশের দশকে আমরা যারা ইউরোপে বাস করছি এই স্বপ্নই ছিল তাদের জীবনের স্বপ্ন। ত্রিশের দশকে ঘোরতর স্বপ্নভঙ্গ। চল্লিশের দশকে সেই ভাঙা স্বপন জোড়া লাগবে বলে মনে হয় না। তবে একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস বলে একটা সংস্থা গড়ে উঠছে। লীগ অভ্‌ নেশনস আমাদের বড়ো আশা দিয়েছিল। পরে হতাশ করে। ইউনাইটেড নেশনস যদি তারই অনুসরণ করে তবে আশা না রাখাই ভালো।"

বৌদি বাবলীর দিকে চেয়ে রঙ্গ করেন। "বিয়ে করলে বরের কাছে এইরকম লেকচার শুনতে হবে। শুনতে শুনতে একরকম ইমিউনিটি জন্মাবে। এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। উনি এইখানে বসেই ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করছেন। সে মহাদেশে আমিও কিছুদিন বাস করেছি। একদা ওদের মিলনের সূত্র ছিল এক খ্রীস্ট, এক খ্রীস্টধর্ম, এক খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ। রাষ্ট্র অনুসরণ করবে সঙ্ঘকে। সম্রাট অনুসরণ করবেন সঙ্ঘগুরুকে। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের হাজারো গরমিল। ইউরোপ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় প্রথমে ধর্মের নামে, পরে ভাষার নামে। এখন হতে যাচ্ছে মতবাদের নামে বা সমাজবিন্যাসের নামে। সংযুক্ত ইউরোপ একটা কথার কথা। রোমান এম্পায়ার, হোলি রোমান এম্পায়ার, নেপোলিয়নের এম্পায়ার, হিটলারের

বর্ণচোরা এম্পায়ার, কোনোটাই টেকেনি। স্টালিনের যদি তেমন কোনো পরিকল্পনা থাকে সেটাও ব্যর্থ হবে। রাশিয়া ঠিক ইউরোপ নয়। ইউরেশিয়া—'

বাবলী বাধা দিয়ে বলে, ''আমরা আর জায়গা বাড়াতে চাইনে। আমরা পশ্চিম জার্মানীর বা পশ্চিম ইউরোপের মাটি মাড়াব না। আমেরিকার ছায়া মাড়াব না। মহামতি স্টালিন প্রত্যেকটি চুক্তি মান্য করবেন। আমাদের জপমন্ত্র ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'' শুনে সবাই হেসে খুন। এল্‌ফ পর্যন্ত।

এর পরে ওঠে জুলির প্রসঙ্গ। স্বপনদা বলেন, "শুনছি ক্যারামেল নাকি ছাড়া পেয়েছে। কই, আসে না তো ?''

''আসবে কী করে ? ওর মা যে ওকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। সেই শর্তেই ওকে ছাডা দেওয়া হয়েছে। ছাড়া দেবার প্রধান কারণ ওর মাথার একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়েছে।" বাবলী যতদূর জানে।

''বলো কী ! মাথা খারাপ হয়েছে !'' স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

''মাথা ওর কবে ভালো ছিল ? তবে খারাপও ছিল না। এরপর যেতে হবে ওকে দেখতে। না সেটাও নিষেধ ?" বৌদি সুধান।

"না, না, সেটা নিষেধ নয়। আমি একদিন দেখা করে এসেছি। বলেছি, যা হবার তা হয়ে গেছে। মাফ করিস্, ভাই। জুলি তা শুনে খুশি হয়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, জানিস্ না বোধ হয়, আমি এখন এন্‌গেজড। যার সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড সে এখন জেলে। আমি ওকে বলেছি যে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, সরকার এবার কংগ্রেসওয়ালাদের ছেড়ে দিয়ে মিটমাটের কথাবার্তা চালাবে। তা শুনে জুলির সে কী রাগ ! তখনি টের পাই যে ওর মাথার ইস্ক্রুপ আলগা। বলে নিজের মা যদি শত্রু হয় তবে মানুষ কী করতে পারে ! বেশ তো ছিলুম আমি জেলে। সবাই আমাকে তোয়াজ করত। সাহেবরা পর্যন্ত ! গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে ওদের মধ্যে একটা পিছুটান এসেছিল, কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে নেতাজী সুভাষ আসছেন শুনে ওদের চাপা উল্লাস। আমাকে দিনে দশবার প্রশ্ন করে, আর কত দেরি ? আমি কেমন করে বলব কত দেরি ? মনটা খারাপ হয়ে গেল শুনে যে ইম্ফল অবধি এসে ওঁরা ফিরে যান। কিন্তু ফিরে যাওয়া মানে তো বরাবরের জন্যে ফিরে যাওয়া নয়। আরো ভালো করে তৈরি হয়ে আবার এগিয়ে আসতেও তো পারেন। 'আমি ঠিক জানতুম যে নেতাজী রবার্ট ব্রুসের মতো

বার বার ট্রাই করবেন শেষে একদিন সফল হবেন। সেটা হবে দেশব্যাপী বিপ্লবের সিগনাল। বিপ্লবী জনতা এসে ইংরেজদের তৈরি এই বাস্তিল দুর্গ ভেঙে আমাকে উদ্ধার করবে। আমি হাঁক দেব, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অমনি ওরাও প্রতিধ্বনি করবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আহা, সে কী উন্মাদনা! সে কী উদ্দীপনা! সে কী গৌরব! সে কী গর্ব! আমি বাংলাদেশের জোন অভ্ আর্ক। আমার নিজের মা আমাকে অসময়ে জেল থেকে বার করে এনে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকার থেকে নাকি জানিয়েছিল যে আমার মাথার ঠিক নেই। কী করে ঠিক থাকবে শুনি? ইম্ফল থেকে নেতাজী ফিরে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে? লেনিন যদি পেট্রোগ্রাড থেকে ফিনল্যাণ্ডে ফিরে যেতেন তোর মাথার ঠিক থাকত? অবশ্য তুই তখন শিশু। আমার মা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। বেরোতে দিচ্ছে না। তবে বেশী দিন নয়। বিপ্লবী জনতা একদিন বাস্তিল ভাঙার পর এ বাড়ীর সদর দরজাও ভাঙবে। আমাকে নিয়ে মিছিলে বেরোবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জুলির মুখে এইসব শুনে আমি তো একেবারে থ! ও যে কোন্ মূর্খের স্বর্গে বাস করছে তা ও নিজেই জানে না।" বাবলী দুঃখ করে।

"কাঁদিয়ে ছাড়লে! আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়লে!" স্বপনদা আবার চোখে রুমাল দেন। এবার ক্যারামেলের জন্যে কান্না।

"সত্যি, কান্না পাবার মতো ব্যাপার।" বৌদিরও দৃষ্টি সজল।

"বিবাহ!" স্বপনদা বিধান দেন, "এই ব্যাধির একমাত্র ভেষজ বিবাহ। ক্যারামেলের বরকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। হিটলার হেরেছে, মুসোলিনি হেরেছে, তোজো আর কদ্দিন? বাধছে তো ওই বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ নিয়ে। সেইজন্যে যুদ্ধশেষের বিলম্ব হচ্ছে। তার আগে কি ওরা কংগ্রেসওয়ালাদের ছাড়বে? অসম্ভব নয়। জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দম ফুরিয়ে গেছে। একবার জাপানীদের সঙ্গে লড়ে ও একবার ইংরেজদের অনুগত জওয়ানদের সঙ্গে লড়ে ওরা ক্লান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বই যথেষ্ট নয়। দম। দম যদি না থাকে তবে খেল্ খতম। আমার মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্তি আসন্ন। ওঁরা বেরিয়ে এলে ওঁদের দলবলকেও বার করে আনবেন।"

সত্যই জাপানের পরাজয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে সরকার কংগ্রেস

নেতাদের মুক্তি দেন। কথাবার্তা যাতে সুগম হয় তার জন্যে কংগ্রেস কর্মীদেরও দফায় দফায় খালাস করা হয়। সৌম্যকে যেদিন ছাড়ে তার আগে জাপানে পরমাণু বোমা পড়েছে ও জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে।

জুলি তো হাতে স্বর্গ পায়। তার মন খারাপ থেকেই মাথা খারাপ। মন এখন ভালো, তাই মাথা এখন ভালো। তবু আর আক্ষেপ, "কোথায় সেই জনতা যে আমাকে বাস্তিল ভেঙে উদ্ধার করত আর আওয়াজ তুলত, ইনকিলাব জিন্দাবাদ? ওরা বোধহয় অপেক্ষা করছে কবে বাবলীরা ডাক দেবে। আমরা ন্যাশনালিস্টরা শ্রান্ত ক্লান্ত। ওরা কমিউনিস্টরা তরতাজা। জোয়ার এলে ওরাই তার সুযোগ নেবে।"

সৌম্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। "আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব আমরা তা করেছি। ফাঁকি দিইনি। ফলাফল আমাদের হাতে নয়। ভগবানের হাতে। ভগবান না মানলে ইতিহাসের হাতে। জনগণ যদি আমাদেরকেই বেশী বিশ্বাস করে তো আমাদের আগে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। যদি ওদেরকেই বেশী বিশ্বাস করে তবে ওরাই আমাদের আগে স্বাধীনতা আনবে, বিপ্লব ঘটাবে। এতে আফসোসের কী আছে? দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তিই তো আসল। আমরা নিমিত্তমাত্র। ওরাও তাই। মুক্তি যতদিন না আসে ততদিন আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাব। যার যেমন নীতি। আমি নীতি পরিবর্তন করব না। সত্য আর অহিংসাতেই অবিচল থাকব। বছর তিনেক আগে যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তার সংশোধন করতে হবে। এই দুই বছর আমি তাই নিয়ে খুব ভেবেছি। বাপুকে আমরা পুরোপুরি মান্য করিনি। সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে তাঁকেও কতকটা অমান্য করেছি। এই ডবল অমান্য কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। তা হলেও আমাদের সান্ত্বনা আমরা নিষ্ক্রিয় বসে থাকিনি। দেখা যাক দেশ কোন্‌টা বেশী পছন্দ করে। আমাদের সক্রিয়তা না বাবলীদের নিষ্ক্রিয়তা।"

দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীর রূপযৌবন অপেক্ষা করতে পারে না। একদা মহাত্মার আপ্তবাক্য ছিল "এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট।" সৌম্য কি সেটা মান্য করবে না অমান্য করবে? জুলির মা প্রসঙ্গটা পাড়লে সে বলে, "একবার বাপুর সঙ্গে কথা বলে আসি। দেখি তিনি কী বলেন। ইতিমধ্যে একবার আশ্রমেও ঘুরে

আসতে হবে। দেখি সেটা কী অবস্থায় আছে। জুলি কি পারবে সেখানে তিষ্ঠতে? আশ্রম ছেড়ে আমিই বা যাই কোথায়? বিহারের গণ্ডগ্রামে? জুলি কি পালিয়ে আসবে না?"

জুলি মুখ খুলতে যাচ্ছিল, ওর মা কথা কেড়ে নেন। "তা জুলিও তো সফ্‌ট নয়। কতরকম দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে সীজন্‌ড। তোমার দুশ্চর তপস্যায় ও তোমার সাথী হবে।"

এই স্থির হলো যে গান্ধীজী অনুমতি দিলে বিয়ে একটি শুভদিন দেখে হবে। তা সে হিন্দু, ব্রাহ্ম, সিভিল যে মতেই হোক। জুলি তা শুনে কাঁদতে বসে। আনন্দের কান্না। ওর মা সৌম্যকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, "জুলি তোমার গলগ্রহ হবে না। ওর বাবা ওর জন্যে যথেষ্ট রেখে গেছেন। ওর মাও তো কিছু দেবে। তবে, হ্যাঁ, ওর শ্বশুর ওর মাসোহারা বন্ধ করবেন। বিয়ের পর তো জুলি ওঁর ছেলের বৌ থাকবে না। মাসোহারার টাকা জুলি নিজের জন্যে খরচ করত না। ওটা ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপে লাগত। ওটা বন্ধ হলে ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপও বন্ধ হবে। আপদ যাবে। ও মেয়ে রাজনীতির জন্যে নয়। ঘরসংসারের জন্যে। তুমি দেখবে ওর ভোল ফিরে যাবে।"

"এই তো আমি চাই। ওর ভোল ফিরলেই আমি খুশি হব। রাজনীতি ওর স্বভাববিরুদ্ধ। সঙ্গদোষে ও সন্ত্রাসবাদী হয়েছিল। পরে হয়েছে বিপ্লবী নায়িকা। এটা ওর সত্যিকারের ভূমিকা নয়! কিন্তু, মাসিমা, বিয়ে করলেও যে আমরা গৃহী হতে পারব তা নয়। সুদিনের জন্যে সবুর করতে হবে। কে জানে, আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য ভাবী শাশুড়ীকে একটা চমক দেয়।

"না, না। ওটা ভাবা যায় না। না, না। ওটা মুখে আনা যায় না। জুলিকে কখনো জানতে দিয়ো না। ও মারা যাবে। আমিও।" তিনি কম্পমান।

স্বপনদা ও বৌদি আসেন দেখা করতে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুনে স্বপনদা বলেন, "শুভস্য শীঘ্রম্‌। মহাত্মার অনুমতির কী দরকার? নিজের ছেলের বিয়ের বেলা তো অমন কোনো শর্ত নির্দেশ করেননি যে আগে স্বরাজ তারপরে বিয়ে। দেবদাস যা পারে সৌম্যও তা পারে।"

বৌদি বলেন, "এটা হলো ব্যারিস্টারের যুক্তি। কিন্তু গান্ধীজী আইন

অমান্য করতে করতে আইন কানুন সব ভুলে গেছেন। ওঁর কাছে ব্রতটাই বড়ো। দেবদাসের বোধ হয় তেমন কোনো ব্রত ছিল না। যেমন সৌম্যর।"

এর পরে কথাবার্তার মোড় ঘোরে। স্বপনদা বলেন, "তোমাদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সৌম্য। যুদ্ধ থেমেছে তোমাদের আন্দোলনের ফলে নয়, পরমাণু বোমা ব্যবহারের ফলে। আমি তো নিন্দাবাদের ভাষা খুঁজে পাইনে। ছি ছি! এ যে চূড়ান্ত অমানবিকতা। হিউমানিজমের যুগ যে শেষ হয়ে গেল। এ কোন্ যুগে আমরা পৌঁছলুম! অহিংসার নাম তো কেউ মুখেও আনতে চায় না। যেমন বিদেশে তেমনি এদেশে। একে তো পরমাণুর আঘাতে আমি শয্যাশায়ী, তার উপর এ কী অবিশ্বাস্য সংবাদ! এটা কি সত্যি!"

"কোন্ সংবাদের কথা বলছেন, স্বপনদা?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"আমার সহপাঠী সুভাষ নাকি প্লেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে। তাইপে জায়গাটা কোথায়? গেলই বা কেন সেখানে?" স্বপনদার কণ্ঠরোধ হয়।

জুলি চিৎকার করে ওঠে, "সব ঝুট হ্যায়! ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডা!"

ওর মা ওকে টেনে নিয়ে যান শোবার ঘরে। সেখানে ও পাগলের মতো চেঁচামেচি করে। বৌদিও পিছু পিছু যান ওকে শান্ত করতে।

সৌম্য দারুমূর্তির মতো নির্বাক। স্বপনদা ওর হাতে হাত রাখেন। চাপ দেন।

॥ দুই ॥

স্বপনদা ও দীপিকাদি জুলির খোঁজ নিতেই এসেছেন। জুলির সঙ্গেই গল্প করতে চান, তাই ওর মা ওকে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর ভাবী জামাতাকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "শুনলে তো ওর কথা? কেউ যদি বলে পাগল তা হলে কি ভুল বলবে? গভর্নমেণ্ট ওর দায়িত্ব নিতে নারাজ। আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। আমি ওকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। পাছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়ে। তুমি এসেছ। খুব ভালো হয়েছে। পৃথিবীতে একটিমাত্র পুরুষ আছে যে ওকে সুখী করতে পারে।

সুখী হলেই ওর পাগলামি সেরে যাবে। আশ্রমে বা সেবাগ্রামে না গিয়ে তুমি এখানেই কিছুদিন থেকে যাও। রোজ ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। কখনো স্টীমারে করে। কখনো মোটরে করে। কখনো ট্রেনে করে! সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরবে। দুপুরের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে সাজিয়ে দেব। আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গ পেয়েই ওর মতিগতি বদলাবে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেইদিন ওর বিয়ে দেব। যে মতে বলবে সেই মতে। ইতিমধ্যে যদি মহাত্মার অনুমতি নিতে হয় তো চিঠি লিখতে পারো। সশরীরে সেবাগ্রামে যেতে হবে কেন?"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "বিয়ে করলে আমার মন পড়ে থাকবে স্ত্রীর কাছে, পরে ছেলেমেয়ের কাছে। অন্তত আধখানা মন তো পড়ে থাকবেই। সংগ্রামের সময় এগিয়ে যাব কী করে? সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটা একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত। যিনি সত্যাগ্রহীদের সেনাপতি তিনি যদি নিকট ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহের জন্যে আমাকে চান তা হলে বিয়ে পেছিয়ে দিতেই হবে। যদি তার দেরি থাকে তা হলে হয়তো না তাঁর অমত হবে না। বিয়ে আমি করবই। কথা যখন দিয়েছি তখন কথার নড়চড় হবে না। জুলি যদি রাজী হয় তো ওকেও আমি বাপুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। তাতে সুফল হতে পারে।"

"কোথায় উঠবে ওখানে?" মিসেস সিন্‌হা জানতে চান।

"আমি যেখানে উঠি। সোনাদির কুটীরে। কেশবন্ তার স্বামী। দু'জনেই বিলেতফেরৎ। গান্ধীজীর গঠনকর্মে যোগ দিয়েছেন। স্বরাজের রূপরেখা তৈরি করেছেন। আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।' সৌম্য জানায়।

"আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমাকে দু'তিন সপ্তাহ ভাবতে দাও। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গগুণে জুলির অবস্থার রূপান্তর দেখি। ও মেয়ে যদি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যায় তা হলে তাঁর মুখের উপর কী যে বলে বসবে কে জানে! হয়তো বলবে, আপনার নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হবে না। কেন আমি পাঁচ বছর অপেক্ষা করব?" জুলির মা আন্দাজে বলেন।

"ঠিকই বলেছেন, মাসিমা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হয় কি না সন্দেহ। আমাদের বিচারে পূর্ণ স্বাধীনতা হচ্ছে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার স্বাধীনতা। তৃতীয় মহাযুদ্ধ কবে বাধবে, জানিনে। কিন্তু যদি বাধে তবে আমরা ওর মধ্যে নেই। আমরা নিরপেক্ষ। ব্রিটেন কি আমাদের এই

স্বাধীনতা দেবে? এর চেয়ে কম নিয়ে আমরা কী করব? ব্রিটেনের জুনিয়র পার্টনার হব? গান্ধী থাকতে তা সম্ভব নয়। আমি থাকতেও সম্ভব নয়। আমাকে শহীদ হতেই হবে। জুলির যখন শোনবার মতো অবস্থা হবে তখন একথা ওকে আমি বলব। ওর যদি আপত্তি থাকে আমাকে বিয়ে না করাই ভালো। বাগ্‌দানের বাধ্যবাধকতা থেকে ওকে আমি রেহাই দেব। ও হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হবে।" সৌম্য বলে দুঃখের সঙ্গে।

"তুমিও দেখছি আরেক পাগল। আবার এক মহাযুদ্ধ? আবার ভারতকে জড়ানো! আবার তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ! কিন্তু, বাছা, সেটা তো পঁচিশ বছরের আগে নয়। ততদিনে তোমার বয়স হয়ে থাকবে আটষট্টি, জুলির ষাট। বিয়ে করে থাকলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হয়ে থাকবে। তারা বিয়ে করে থাকলে তাদেরও ছেলেমেয়ে। সত্তর বছর বয়সে যদি কেউ শহীদ হয়—না হলেই ভালো—তবে এখন থেকেই ভয় পাইয়ে দেবার মতো কিছু নয়। জুলি আপত্তি করবে সেটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বরণ করবে না। এখন থেকে এসব সম্ভাবনার কথা তুলে বিয়েটাকে কেঁচে যেতে দিয়ো না। তা হলে ও মেয়ে আর কোনোদিন প্রকৃতিস্থ হবে না। ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সিপাই বিদ্রোহের ঘোঁট পাকিয়ে কী এক আজব তত্ত্ব বানিয়েছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠী। আমি তো তার মাথামুণ্ডু বুঝিনে। জুলির যে মাথা খারাপ হবে এর আশ্চর্য কী? তুমি যদি ওকে সেবাগ্রামে নিয়ে গিয়ে তোমার সোনাদির কাছে শিক্ষানবীশ করতে পারতে তা হলে আমার আপত্তি কী ছিল? কিন্তু আমার একমাত্র শর্ত বিয়েটা তার আগে হওয়া চাই। মেয়েদের জীবনে বিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন আনে। মাতৃত্ব আনে আরো গভীর পরিবর্তন। এসব অভিজ্ঞতার পরে তুমি ওকে যা করতে বলবে ও তাই করবে। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তোমার কস্তুরবা হবে। আমার মেয়েকে আমি ভালো করেই চিনি। তুমি আর গড়িমসি না করে ওকে একটা চান্স দাও। তোমাকে তো ও বেঁধে রাখছে না। তুমি যদি নিজেকে দায়গ্রস্ত মনে করো তা হলে ওকে আমার কাছে থাকতে দিয়ো। আমি ওকে রাজনীতি করতে দেব না। সেবাকর্ম করতে দেব। আমার নার্সারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকবে। যতদিন না ওর নিজের ছেলেমেয়ে হয়।" জুলির মা প্রাণ খুলে বলেন।

"ও নিজেই সেটা পছন্দ করবে না, মাসিমা। ও আমার সঙ্গেই থাকতে

চায়। সুখে দুঃখে আমার সাথী হতে চায়। মনে করুন আমি একজন সরকারী কর্মচারী। পূর্ববঙ্গই আমার কর্মস্থল। আমার স্ত্রী আমার কর্মস্থলেই বাস করবে। সেবাকর্ম যদি করতে চায় সেইখানেই করবে। যেমন করছে আমার বন্ধু মানসের বৌ যূথিকা। জুলির বন্ধু মিলিকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়। মিলি চলে গেছে ওর বরের সঙ্গে বিলেতে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে ওর বেশ বনিবনা। জাতিগত জীবনে সংঘর্ষ। সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে জুলিরও একই বরাত হতো। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আরেক রকম বরাত হবে। দেশ স্বাধীন হলেও আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে না। নিচের থেকে ধাপে ধাপে অথরিটি গড়ে তুলতে হবে। উপরে উপরে ক্ষমতা হস্তান্তর আমার আদর্শ নয়। উপরে উপরে ক্ষমতা ক্যাপচার তো আমার আদর্শ নয়ই। জুলির সঙ্গে আমার আদর্শের অমিল আগেও ছিল, পরেও থাকবে। যেমন সুকুমারের সঙ্গে মিলির অমিল। সুকুমার লিখেছে লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে নিরঙ্কুশ হয়েছে। ইণ্ডিয়াকে ওরা কানাডার মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে প্রস্তুত, শুধু ভারতীয় নেতাদের একমত হতে হবে। ওরা খুব শীগগির দেশে ফিরছে। সুকুমার আর মিলি। ইংলণ্ডের সঙ্গে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করবে। মিলি ততটা নয়, সুকুমার যতটা। কংগ্রেস নেতাদের হাত করতে বড়লাট ওয়েভেল সক্রিয়। তবে গান্ধীজীকে ভোলানো অত সহজ নয়। ভবী ভোলে না।" সৌম্য হাসে।

'মিঞা বিবি রাজী, কী করবে কাজী? ইঙ্গ কঙ্গ রাজী, কী করবে গান্ধী? লেবার পার্টি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কংগ্রেস পার্টিও হাত বাড়িয়ে দেবে। তারপরে দু'পক্ষের হ্যাণ্ডশেক। অ্যামিকেবল সেটলমেণ্ট। জেলযাত্রা ঢের হয়েছে। আর নয়। মানুষের ত্যাগশক্তিরও একটা সীমা আছে। সবাই তো আর মহাত্মা নয়। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জবাহরলাল, এঁরা পঁচিশ বছর ধরে জেলে যাচ্ছেন আর আসছেন। এঁরা আর কদ্দিন বাঁচবেন? মিটমাটের এই তো সময়। গান্ধীজী যদি এঁদের উপর দরাদরির ভার ছেড়ে দেন এঁরা দেশকে বিকিয়ে দেবেন না। অন্তত এইটুকু বিশ্বাস এঁদের উপর থাকা উচিত। অন্যান্য দেশের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তুলনায় এঁরা কেউ নিরেস নন। এঁরাও সমান যান। হিংসা অহিংসার প্রশ্ন এখন না তোলাই ভালো। গভর্নমেণ্ট চালাতে গেলে কিছুটা ভায়োলেন্স তো দরকার হবেই। সেই ভয়ে যদি কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব না নেয় তো ইংরেজই থেকে যাবে। কংগ্রেসকে

বাস্তববাদী হতে হবে। আদর্শবাদ নিয়ে গান্ধী থাকতে চান থাকুন। তুমিও তাঁর সঙ্গে। জুলিও তোমার সঙ্গে। আমি বাস্তববাদী। তাই সুকুমারের প্রচেষ্টার সমর্থন করি। কবে আসছে ওরা?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

"জাহাজ পেলে নভেম্বরে। ওরা সমুদ্রপথেই আসতে চায়। সেটাই সস্তা। আরাম তাতেই বেশী। বাচ্চা আছে সঙ্গে।" সৌম্য মনে করিয়ে দেয়।

জুলির মা ড্রয়িং রুমে ফিরে যেতেই স্বপনদা বলে ওঠেন, "শুভস্য শীঘ্রম্। আপনি আর দেরি না করে শাঁখ বাজিয়ে দিন। ওসব গান্ধী টান্ধী বাজে ওজর। উনি কি পোপ আর সৌম্য কি রোমান ক্যাথলিক? জানেন তো, বিয়ের সময় রোমান ক্যাথলিকদের পোপের অনুমতি নিতে হয়। ওটা অবশ্য একটা ফর্মালিটি। বিশপরাই পোপের হয়ে অনুমতি দেন। পোপের এত সময় কোথায় যে কোটি কোটি ক্যাথলিকের বিয়ের কাগজপত্র দেখবেন? আমরা হিউমানিস্টরা পোপ-টোপ মানিনে। গান্ধীজীর আশীর্বাদ অবশ্যই চাই। কিন্তু অনুমতি? যদি না দেন? সৌম্য বাপের সুপুত্রের মতো আজ্ঞাবহ হবে। কিন্তু ক্যারামেল কেন সে অপমান সহ্য করবে?"

"কিন্তু বাপুকে যে ও বাপের মতো মানে।" জুলির মা বলেন।

"পোপ কথাটার মানেও বাপু। তাঁকে বাপের মতো মানতে মানতে ক্যাথলিকরা বিবাহের মতো প্রাইভেট ব্যাপারে তাদের লিবার্টি হারিয়েছে। গান্ধীভক্ত ভারতীয় জনগণেরও সেই দশা হবে না তো? আমি বলি, সৌম্য, তুমি চোখ বুজে ঝুলে পড়ো। আমি বাপুর কাছে আপীল করে অনুমতি আনিয়ে নেব।" স্বপনদা হাসেন ও হাসান।

সৌম্য বুঝিয়ে বলে, "ক্যাথলিকদের সঙ্গে তুলনা ঠিক নয়। গান্ধীজীর কাছে সবাই আশীর্বাদ চায়। অনুমতি চায় কেবল তারাই যারা কথা দিয়েছে যে দেশ মুক্ত না হলে বিয়ে করবে না। তখন তো জানা ছিল না যে দেশের স্বাধীনতার এত দেরি হবে। জানলে কথা দিতুম না। দিয়েছি যখন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে সুধাব আমার অঙ্গীকার থেকে আমি খালাস পেতে পারি কি না। জুলি যদি আমার সহকর্মী হতে রাজী হয় বাপু খালাস দিতে রাজী হতে পারেন।"

"তার মানে ক্যারামেলকে তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে। তুমি কি তাতে রাজী হবে, ক্যারামেল?" স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

"ও যদি আমাকে গ্রহণ করে ওর জন্যে আমি সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী। স্বাতন্ত্র্য আবার কী?" জুলি আবেগের সঙ্গে বলে।

স্বপনদা তারিফ করে বলেন, "মহাত্মা চৌধুরী, এই কন্যা একদিন তোমার কস্তুরবা হবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দু'জনেরই পায়ের ধুলো নেবার জন্যে গ্রাম গঞ্জ থেকে বুলক প্লেনে করে হাজার হাজার মানুষ আসবে। ক্যারামেল তোমার জন্যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে রাজী। আর ওর বৌদিকে দেখছ তো? বিয়ের পরেও সমানে চাকরি করে যাচ্ছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না।"

বৌদি এটা প্রত্যাশা করেননি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো হাসি দিয়ে রাগ চাপেন। বলেন, "এই প্রচ্ছন্ন হিটলারটির বদ্ধমূল ধারণা নারীজাতির প্রকৃত স্থান হচ্ছে রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর আর ঠাকুরঘর। হাইকোর্টে আজকাল মহিলা ব্যারিস্টাররাও প্র্যাকটিসে নেমেছেন। তা দেখে এঁর যা আতঙ্ক। আমি অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে নিজ গুণে চাকরি পেয়েছি। নিজ গুণেই চাকরি করে যাচ্ছি। এটা পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নয়। তাই এঁর যত আক্রোশ। নারীকে ইনি স্বনাম্নী হতে দেবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে আজকাল পুরুষরাই স্ত্রীর পদবী ধারণ করে যুক্তনামা। নতুন সেক্রেটারী অভ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া লর্ড পেথিক-লরেন্স বিয়ের আগে ছিলেন পেথিক। মিস্ লরেন্সের সঙ্গে বিয়ের পর থেকে হলেন পেথিক-লরেন্স।"

মিসেস সিন্‌হা স্বপনদার পক্ষ নিয়ে তর্ক করেন। "বিয়ের পরে যদি স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি বা প্র্যাকটিস করে ঘরসংসারে শ্রী থাকে না, ছেলেমেয়েরা আদর যত্ন পায় না, চাকরবাকর লুটে পুটে খায়। স্বামীও তো স্ত্রীর জন্যে ত্যাগস্বীকার করছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে আসছে। ত্যাগটা একতরফা নয়। কিন্তু একালের মেয়েদের দোষ দেওয়া যায় না। বেশী লেখাপড়া শেখালে বড়ো চাকরির উচ্চাভিলাষ জাগবেই। যে মেয়ে ডক্টরেট পেয়েছে সে মেয়ে বিয়ের পরে ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করবে না, সুক্তুনি রাঁধবে না। সেইজন্যেই তো আমি জুলিকে বেশী লেখাপড়া শেখাইনি। বিয়ে দিই স্কুল শেষ করার আগেই। তার ফল হয়েছে শোচনীয়।"

স্বপনদার মাথায় ঘুরছিল হিটলার। খাপছাড়া ভাবে বলেন, "হিটলারকে খাটো করার চেষ্টা বৃথা। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ব্রহ্মচারী।"

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে যায়। দীপিকা বৌদি এবার তাঁর কর্তার

বক্তব্য বিশদ করেন। "বার্লিনের পতন আর হিটলারের নিধন সংবাদ শুনে উনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন, হেক্‌টরের নিধন। ট্রয়ের পতন। সেই যে উনি শয্যা নেন তার পরে চব্বিশ ঘণ্টা দরজা বন্ধ। মস্কো রেডিও, বি. বি. সি., ভয়েস অভ্ আমেরিকা আমি একাই শুনি। হিটলারের মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়নি, দাহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দাহ করা হয়েছে তার সঙ্গিনী এফা ব্রাউনের মৃতদেহকেও। হিটলারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে নাকি এফার সঙ্গে আইন অনুসারে বিবাহ। তা হলে আর ব্রহ্মচর্য রইল কোথায়? কান্নাও পায়, হাসিও পায়। ওঁকে বলিনে। পাছে শক্ পান। কিন্তু বেশীদিন না বলেও থাকা যায় না। শুনে বলেন, যে মানুষ মাছ খায় না, মাংস খায় না, মদ খায় না, তামাক খায় না, টাকা খায় না সে মানুষ বামাচারী হতে পারে না। ওটা প্লেটোনিক সম্পর্ক। ব্রতসিদ্ধির পর ওদের যথারীতি বিবাহ হতো। পতির সঙ্গে সতী একই চিতায় আরোহণ করেছেন। ব্রতসিদ্ধি হবার নয়। জয়ের আশা নির্মূল। পরাজয়ের গ্লানি অসহ্য। নাটক হিসাবে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডী। রাজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।"

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "আমার মনে আছে এক মুসলমান ফকিরনীর কণ্ঠে শুনেছি 'চণ্ডিদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দু'জন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।' হাজার বছর পরে হিটলার আর এফা ব্রাউন সম্বন্ধেও ওদেশের লোকসঙ্গীতে অনুরূপ পদ শোনা যাবে।"

স্বপনদা খুশি হয়ে বলেন, "লোকসঙ্গীতের ধারা ওদেশে এখনো শুকিয়ে যায়নি। ব্যালাড সিঙ্গার এখনো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আর বেহালা বা ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে ব্যালাড শোনায়। জার্মানদের মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য। তবে এমন দুর্ভাগা জাতি আর নেই। অনেকটা আমাদেরই মতো। এবার তো ওরাও পরাধীন। আমরাও পরাধীন। আমরা একদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হলেও হতে পারি, কিন্তু রুশের হাত থেকে ও মার্কিনের হাত থেকে জার্মানদের মুক্তি আমার দূরদৃষ্টির বাইরে। সৌম্য, তুমিও তো জার্মানী দেখে এসেছ। তোমার কী মনে হয়?"

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, "ভারত যদি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হয় তবে জার্মানীও ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে
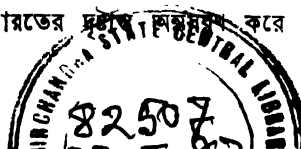
সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হবে। সত্যাগ্রহই হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প। বিদ্রোহ বিপ্লবেরও। এটা যদি ভারতের বেলা উপযোগী হয়ে থাকে তো জার্মানীর বেলাও উপযোগী। আমরা যারা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে গান্ধীপন্থা অনুসরণ করে চলেছি তারা সারা বিশ্বের জন্যে পায়ের চিহ্ন রেখে যাচ্ছি।"

"দূর পাগলা!" স্বপনদা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। "যারা এতকালের খ্রীস্টকে ছেড়েছে তারা একালের গান্ধীকে ধরবে? কেন ওরা নতুন করে পেগান হতে গেল এ নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছ? আমি তো অন্ধকারে আলো খুঁজে পাচ্ছিনে। রাজনীতি অর্থনীতির ভিতরে এর উত্তর নেই। সমাজনীতির ভিতরেও না। দর্শনের ভিতর থাকলেও থাকতে পারে।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে দীপিকাদি বলেন, "কই, সৌম্য, তুমি তো বললে না জুলির জন্যে তুমি কী বিসর্জন দেবে? না, বিসর্জনটা একতরফা হবে? যেমন তোমার স্বপনদার ধারণা।"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "আমার যা কিছু ছিল সব কিছু আমি দেশের জন্যে বিসর্জন দিয়েছি। তার মানে ট্রাস্টীদের হাতে দিয়েছি। জুলির খাতিরে ওদের একজন সরে যাবে। জুলিও একজন ট্রাস্টী হবে। গ্রামে গিয়ে বসলে খাওয়া পরার কষ্ট হবে না। পরিশ্রম করলে স্বচ্ছন্দেও থাকা যায়। কিন্তু শহরের মায়া কাটাতে হবে। গ্রামের ধন শহরে এনে খরচ করা চলবে না।"

স্বপনদা দীপিকাদিকে মুখ খুলতে দেন না। বলেন, "আমার প্রশ্ন হলো হিটলার যদি পেগানই হবেন তা হলে মদ্য মাংস বর্জন করবেন কেন? পেগানরা তো আস্ত শুয়োর পুড়িয়ে খেত। এখনো ইংরেজ অভিজাতরা তাই করে। আমার মতে হিটলার ছিলেন প্রচ্ছন্ন হিন্দু. হিন্দুদের মতো তাঁর অগ্নিসংস্কার হলো। হিন্দুদের মতোই তাঁর বিবাহিতা পত্নী সতী হলেন।"

বৌদি হাসতে হাসতে বলেন, "তুমি দেখছি ডেভিলস্ অ্যাডভোকেট। আমি কিন্তু জানিয়ে রাখছি আমি সহমরণে গিয়ে সতী হব না। যদি তুমি আগে যাও। পুরুষের মতো নারীও একটি ব্যক্তি। তার জীবন তার, মরণও তার।

সেদিন আলাপ আলোচনার পর এই স্থির হয় যে সৌম্য যাবে সেবাগ্রামে মহাত্মার অনুমতি প্রার্থনা করতে। আগে অনুমতিলাভ। তারপরে আর সব। কবে বিয়ে, কোন্ মতে। বিয়ের পর জুলি কোথায় থাকবে। আশ্রমে

না শ্বশুরবাড়ীতে না মায়ের কাছে। অনুমতি না পেলে কিন্তু অচল অবস্থা। তখন কর্তব্য স্থির করার জন্যে আবার বৈঠক বসবে। স্বপনদা ও দীপিকাদি আসবেন।

এমন সময় সৌম্য এক ফ্যাসাদ বাধায়। "আমার তো বাবা নেই, বাপুই আমার বাবা। বাপের কাছে ছেলে মুখ ফুটে বলে না, বাবা, আমি বিয়ে করতে চাই। এদেশের রেওয়াজ কন্যাপক্ষের একজন মুরুব্বি গিয়ে বরকর্তার কাছে প্রস্তাবটা পাড়বেন। বর এমন ভাব দেখাবে যেন ভিজে বেড়ালটি। কিছুই জানে না। এক্ষেত্রে মুরুব্বি হতে হয় কনের মাকেই। কিন্তু তাঁকে সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার অত্যাচার। যদিও বাপু খুব খুশি হয়ে রাজী হতেন। তাঁর দিদি তো অসুস্থ মানুষ। জুলির মুরুব্বি বলতে আমি একজনকেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি স্বপনদা।"

স্বপনদা ফোঁস করে ওঠেন। "আমি যাব পোপের সঙ্গে অডিয়েন্স যাচ্ঞা করতে রোমে! পোপ যদি অনুমতি না দেন আমার মুখ থাকবে?"

"তা হলে, চল, সৌম্য, আমিই তোমার মুরুব্বি হয়ে যাই। আমার আর্জি শুনে তোমার বাপু কিছুতেই 'না' বলতে পারবেন না। বললে আমি ধর্না দেব। জুলি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী থাকে তো আরো ভালো। ওর মুখ দেখলে পাষাণও গলে যায়। সারা জীবন কেবলি একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে আসছে। শেষ ধাক্কা নেতাজীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ।" বৌদি সমবেদনার সঙ্গে বলেন।

"বিলকুল ঝুট হ্যায়!" জুলি জ্বলে ওঠে। "ওটা আত্মগোপনের ছলনা। মার্কিনদের চোখে ধূলো দিয়ে রুশ দখলী অঞ্চলে চলে গেছেন।"

বৌদি তা শুনে বলেন, "তা হলে জুলির না যাওয়াই ভালো। আমি ওসব বিতর্কিত প্রশ্ন এড়িয়ে যাব।"

স্বপনদা ঘোরতর আপত্তি করেন। "গৃহকর্তাকে একলা ফেলে গৃহিণী কখনো ফেরার হন? আমি ফেরারি পরোয়ানা জারি করব না? ধর্না! ধর্না দেবে তুমি! আমার মাথা কাটা যাবে না। কাগজে কাগজে ঢি ঢি পড়ে যাবে না?"

জুলির মা হেসে বলেন, "স্বপন ওর বৌকে কত ভালবাসে দেখছ তো। দেখে শেখ। একটা দিনও চোখের আড় করবে না।"

"না, মাসিমা, এর একটা প্র্যাকটিক্যাল কারণ আছে। রান্না না থাকলে

ওর কুকুর এল্‌ফকে আমি সামলাতে পারব না। তা হলে কুকুরকেও সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যেতে হয়। সে বেচারার উপর অত্যাচার।"

তখন এই স্থির হয় সেবাগ্রামে গিয়ে সৌম্য সোনাদিকে অনুরোধ করবে কন্যাপক্ষের মুরুব্বি হতে। সোনাদি সহায় হলে অনুমতি সহজলভ্য।

জুলি বায়না ধরে সেও সৌম্যর সঙ্গে সেবাগ্রামে যাবে। সোনাদিদের অতিথি হবে। ওর মা সেটা এককথায় খারিজ করেন। "কনের দিক থেকে ঝোলাঝুলি লজ্জাকর ব্যাপার। আমাদেরও তো মানসম্ভ্রম আছে।"

আসল কারণ পুলিশকে তিনি কথা দিয়েছেন যে জুলিকে চোখে চোখে রাখবেন। যদিও তার আর দরকার নেই, জেলগুলো খালি হয়ে গেছে। গোলমাল যা তা ওই আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের তিন প্রধানের বিচার নিয়ে। এর মধ্যে রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, "কদম কদম বঢ়ায়ে যা।" সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও সে রেকর্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করছে।

সোনাদিকে সৌম্য চিঠি লেখে। যতদিন না তাঁর উত্তর আসে ততদিন সে কলকাতায় থাকবে। সোদপুর আশ্রমের কাজ সেরে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। ভাবী বরবধূ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় আসবে। যদিও তাদের পরিচয় পনেরো ষোল বছরের তবু প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ কেউ কোনোদিন পায়নি। প্রেম নিবেদন তো দূরের কথা। স্বরাজের জন্যে মুলতুবি রেখে দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে স্বরাজের খুব বেশী দেরি নেই। ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। এখন মুসলিম লীগকে নিয়েই ভাবনা।

একদিন গঙ্গা পার হওয়ার সময় জাহাজে তাঁর সঙ্গে দেখা। "চিনতে পারছেন? সেই পুরনো পাপী। আপনাদের সিভিল সার্জন। ক্যাপটেন ল। পরে মেজর ল। শেষ সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর যাত্রার আগে। তার পরে প্রায় ছ' বছর কেটে গেছে। এ কন্যাটি কে? মঞ্জুলিকা সিন্‌হা? সিভিল সার্জন ক্যাপটেন সিন্‌হার মেয়ে? ক্যাপটেন মুস্তাফীর মেয়ে মধুমালতীর বান্ধবী?"

সৌম্য চিনতে পারে। জুলি পারে না। ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। "সিভিল সার্জন ডাক্তার ঘটকের কন্যা কৃষ্ণকলি। ঝরনা বলে জানে সকল লোক। বাপ মায়ের অমতে ওয়াকি হয়ে যুদ্ধে যায়। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে নিজের ঘরেই ঢুকতে পাচ্ছে না। ওয়াকি বলে সমাজেও একঘরে। এখন থাকে ওর বান্ধবী সবিতার ওখানে। সেও ছিল ওয়াকি।

ওরা ইঙ্গবঙ্গ। তাই এমন গোঁড়া নয়। যুদ্ধকালে ইংরেজের মেয়ে যদি ওদেশে ওয়াকি হতে পারে বাঙালীর মেয়ে হবে না কেন? এরা বীরাঙ্গনা। তাই বীরপুরুষকে দেখে এক আঁচড়ে চিনতে পারে। সিঙ্গাপুরে নেতাজী আমাকে জাপানীদের বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করে আজাদ হিন্দ ফৌজের চিকিৎসাভার দেন। মেজরকে বানিয়ে দেন ব্রিগেডিয়ার। ফৌজের সঙ্গে আমিও ফ্রণ্টে গেছি। অ্যাকশন দেখেছি। জয় করে এগিয়ে এলে নেতাজী আমাকে মেজর জেনারেল বানাতেন। দুর্ভাগ্য! তাঁর ইচ্ছা ছিল আমরা আবার চেষ্টা করব। ট্রায়, ট্রায় এগেন। তিনি বলতেন, ডিফিট ইজ আ ওয়ার্ড নট ফাউণ্ড ইন মাই ডিক্‌সনারী। জাপানীরা যে আচমকা আত্মসমর্পণ করবে এর জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কোথায় যে অন্তর্হিত হলেন কেউ সঠিক বলতে পারে না। মাঝখান থেকে আমি পড়ে যাই ফাঁপরে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চোখে আমি একজন ট্রেটর। চেনা জানা সাহেবরা সার্টিফিকেট দেন যে চিকিৎসায় আমার হাতযশ আছে বলে বিদ্রোহী ফৌজ আমাকে বন্দিশালা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তারের কর্তব্য হলো চিকিৎসা, তা সে শত্রুরই হোক আর মিত্রেরই হোক। কাউকে তো আমি মারিনি, বরং কতকগুলি লোককে বাঁচিয়েছি। তারা দুই পক্ষের লোক। কোর্ট মার্শাল থেকে রক্ষে পেয়েছি, কিন্তু চাকরিটি গেছে। র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি কাগজে কলমে ক্যাপটেনও নই। চাকরি গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, লাহা পরিবার গরিব নয়। কিন্তু র‍্যাঙ্ক কেড়ে নিয়েছে। কী অন্যায়! আমি যাচ্ছি বিলেতে আপীল করতে। মাতাল ফিলিপের কাছ থেকে অপ্রমত্ত ফিলিপের কাছে! ব্রিটিশ জাস্টিসের উপর আমার আস্থা আছে।"

জুলি লাল হয়ে বলে, "মাফ করবেন, ব্রিটিশ জাস্টিস না ব্রিটিশ ইনজাস্টিস? আমার বাবা প্রথম মহাযুদ্ধে টার্কদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধের ডেস্‌প্যাচে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপটেনের উপরে তাঁকে উঠতেই দেওয়া হয় না। কী অপরাধে জানেন? জালিয়ানওয়ালা বাগ তিনি বরদাস্ত করেননি। হুজুর বাহাদুরদের দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি বিলেত যাচ্ছেন, যান। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে আপনাকে আমরা নেতাজীর বিশ্বস্ত চিকিৎসক হিসাবে সম্মানের পদ দেব না। সার্জন জেনারল তো নয়ই, ইনস্পেকটর জেনারল অভ্‌ প্রিজন্স পদও আপনার কপালে নেই। ক্ষেমা ঘেন্না করে আবার সেই সিভিল সার্জন।"

"তা বলে কি আমার জীবনের এই সাধটা অপূর্ণ থেকে যাবে? মরার আগে একবার বিলেত দেখতে পাব না? আর এই যে বীরাঙ্গনা এর কি এদেশে কোনো ভবিষ্যৎ আছে? তোমাদের হাতে ক্ষমতা এলে তোমরা কি একে ছেই ছেই করবে না? এ মেয়ে ওয়াকি হলেও নেতাজীর পরম ভক্ত। আমি তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী বলে আমাকেও এ মেয়ে বীরপুরুষ বলে পূজা করে। আমার সম্বর্ধনা সভা যখন যেখানে হয় তখন সেখানে হাজির হয়। সভা তো লেগেই রয়েছে। লোকে নেতাজী আর আজাদ হিন্দ ফৌজের খবর শুনতে পাগল। আমি ছিলুম তাঁর কাছের মানুষ। হাঁড়ির খবর জানতুম। তা বলে তো হাটে হাঁড়ি ভাঙা যায় না। তাঁর অনুমতি নিতে হবে আগে। প্রথমে জানতে হবে তিনি এখন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। ওই যে রটেছে প্লেন দুর্ঘটনা ওটা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু যা বলছিলুম এই যে বীর তরুণী এর কী জানি কেন আমার মতো এক বৃদ্ধকে ভালো লেগেছে। এককালে আমার স্বপ্ন ছিল বিলেত যাব, আই. এম. এস. হব মেম বিয়ে করব, তার কোনো সম্ভাবনা দেখছিনে। তাই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার কথা ভাবছি। ওর মা কিছুতেই রাজী নন। সোনার বেনের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে! ওর বাবা আমাকে কানে কানে বলেছেন, ওয়াকিকে কেউ বিয়ে করবে না। ও মেয়ে ওল্‌ড মেড হবে। আমরা মারা গেলে ওকে দেখবে কে? ওর বান্ধবী সবিতাই বা কদ্দিন আশ্রয় দেবে? শুনছি সবিতারও পাত্র জুটেছে। আমরা যদি ঝরনাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করি আত্মীয়রা কেউ আসবে না। কিন্তু তুমি যদি ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে কর তা হলে আমরা দু'দিন গালমন্দ করে পরে ঠাণ্ডা হব। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছ, তুমি ক্ষত্রিয়। ঝরনাও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজ করেছে, সেও ক্ষত্রিয়াণী! তোমাদের বিবাহ অসবর্ণ নয়। পালিয়ে যাওয়ার আইডিয়াটা তিনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেন। আমি সেটাকে একটু পল্লবিত করি। কলকাতা থেকে জাহাজে চড়ে সোজা লণ্ডন। সঙ্গে ঝরনা। বিয়ে তো জাহাজেও হতে পারে। তবে ঝরনা যদি চায় জাহাজে ওঠার আগেই সেরে নিতে পারি। কী বলো, ডারলিং।" লাহা ওর দিকে সানুরাগে তাকান।

"বিশ্রী কালো মেয়ে, তিরিশের উপর বয়স, ওয়াকি বলে অপবাদের পাত্রী, গুরুজন আমাকে পাত্রস্থ করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমিও বিলেত যেতে চাই। কোয়ালিফিকেশন আরো বাড়াব। বিয়ের কথা তার পরে ভাবা

যাবে। যদি ততদিন আপনার মেম বৌ না মিলে থাকেন। তাহাজে আমি আপনার সঙ্গিনী হব। জীবনসঙ্গিনী হব কি না সেটা পরের কথা।" ঝরনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। ইস্পাতের ফলার মতো ঋজু দীঘল গড়ন। ঈষৎ পুরুষালি চেহারা। টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

লাহা ওর হাত ধরে বলেন, "সৌম্য সাক্ষী, জুলি সাক্ষী, গঙ্গা সাক্ষী, অন্তরীক্ষ সাক্ষী, তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি এন্‌গেজড। যার কাছে আমি হীরো সেই আমার কাছে হীরোইন। গায়ের রং নিয়ে আমি কী করব? মনের রংটাই আসল। ইউ আর আ লাভলী গার্ল। তিরিশ নয়, উনিশ।"

॥ তিন ॥

স্বপনদার জন্যে আরো প্রচণ্ড শক অপেক্ষা করছিল। এটা তাঁকে একেবারে কাৎ করে দেয়। নাৎসীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বিনা বিচারে আবদ্ধ ইহুদী, পোল ও জিপসীদের গ্যাস চেম্বারে পুরে গণহত্যা। সর্বমোট ষাট লক্ষের মতো। যুদ্ধকালে এসব গোপন ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সভ্য জগৎ শিউরে উঠছে। যারা ঘটিয়েছে, যাদের উপর ঘটানো হয়েছে তারা দুই পক্ষই সভ্য। এ কেমনতরো সভ্যতা? মানবিক না দানবিক?

হিটলার সম্বন্ধে তাঁকে নতুন করে ভাবতে হয়। বোমার মুখে যারা পড়ে তারা নারীও হতে পারে, শিশুও হতে পারে, তাদের মৃত্যু ইচ্ছাকৃত খুন নয়। কিন্তু গ্যাস চেম্বারে পুরে যাদের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন গ্রামে বাস করত। তাদের বাড়ী থেকে একে একে ধরে বেঁধে বা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বলিদানের জন্যেই। লক্ষ লক্ষ বাল বৃদ্ধ বনিতা, তাদের আর কোনো দোষ নেই, তারা ইহুদী বা পোল বা জিপসী। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এক একটা জাতির বংশলোপের অভিযান। যেমন মশককুল বিনাশের জন্যে ডি ডি. টি. প্রয়োগ।

"ব্রহ্মচারী নয়, ব্রহ্মদৈত্য।" স্বপনদা অস্ফুট স্বরে বলেন।

তা শুনে বৌদি মন্তব্য করেন, "চোখ একটু একটু করে ফুটছে। আরো ফুটবে। তবে হিটলারকে তুমি হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে পাবে না। পেতে পারো বরং খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে। হিটলারই সেই অ্যান্টিক্রাইস্ট যার আসার কথা খ্রীস্টের পুনরাগমনের পূর্বে।"

স্বপনদা খ্রীষ্টীয় থিয়োলজি পড়েননি। পড়তে আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁর অধ্যয়নের সীমা ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও শিল্প অবধি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যেটুকু থিয়োলজি পান সেইটুকুই তিনি জানেন। যেমন দান্তের ডিভাইন কমেডির ভিতর দিয়ে। কিংবা মিলটনের 'প্যারা াইজ লস্টে'র।

নেপথ্যে রিহার্সলের পর বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে অভিনীত এক মহানাটক হচ্ছে মহাযুদ্ধ। হিটলার, মুসোলিনি, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন, পেতাঁ্যা, দ্য গল, সুভাষ প্রভৃতি তার কুশীলব। প্রেক্ষাগৃহে বসে পাঁচ ঘণ্টা ধরে উপভোগ করা যায়। আর সব নাটকের মতো, উপন্যাসের মতো, আর্টের মতো এটাও হচ্ছে মায়া। মহাযুদ্ধ যখন, তখন মহামায়ার মায়া।

হিন্দুদের দুটি মহাতত্ত্ব আছে যা দিয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের অর্থ বোঝানো হয়। লীলাময়ের লীলা। মহামায়ার মায়া। যে নাটকে প্রেমের দৃশ্য নেই লীলাময়ের লীলা বলে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। মহামায়ার মায়া বলে ব্যাখ্যা করলে তবু কতকটা বোধগম্য হয়।

স্বপনদার মুখে 'মহামায়ার মায়া' শুনে বৌদি জিজ্ঞাসা করেন, "কবে থেকে তুমি মায়াবাদী হলে?"

"কেন? আমি কি বলেছি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া?" দাদা জবাব দেন, "আর্ট মাত্রেই মায়া। আর এটা তো মহানাটকের বিষয়—এই মহাযুদ্ধ, যা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। মায়া! মায়া! মহামায়ার মায়া! এ ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। অর্থ এর রাজনীতিতে নেই, অর্থনীতিতে নেই, সমাজ-নীতিতে নেই, ধর্মনীতিতেও নেই। ওসব যেন আঁধার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজা, যে বেড়াল সেখানে নেই।"

বৌদি সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, "বুঝতে পারছি তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার স্বধর্মভ্রষ্ট হবে কেন? তুমি হিউমানিস্ট। তোমার ধর্ম হিউমানিজম। মহামায়ার মায়া তোমার মুখে মানায় না। তোমার পক্ষে ওটা একটা পরাজয়। তুমি কেন ডিফিটিস্ট হবে?"

"ছাখ, রান্নু, যে কোনো একটা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়েই আমি মর্মে আঘাত পাই। আর এ তো কোটি কোটি হত্যাকাণ্ড! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী ও শিশুর নিধন। একদিকে পরমাণু বোমা, আরেক দিকে গ্যাস চেম্বার। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার ব্যভিচার। আসল খুনী সৈনিকরা নয়, বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরাই। মানুষকে এরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিছু দিয়েছে বইকি। কিন্তু কত দামে? পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর মহামারী। তাও বেছে বেছে ঠগ উজাড় নয়, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা বলতেন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন। সারভাইভাল অভ্ দ্য ফিটেস্ট। কিন্তু এই শতাব্দীতে দেখা গেল যোগ্য অযোগ্য সবাই এক নৌকায় ডুবেছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে গোটা পৃথিবীটাই টাইটানিক জাহাজের মতো সবাইকে নিয়ে ডুববে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন একটা ফ্যালাসী।" স্বপনদা অভিযোগ করেন।

"বেশ তো, তোমরা সাহিত্যিকরা সে ফ্যালাসী শুধরে দাও। নাটক লেখ, উপন্যাস লেখ, গল্প লেখ। তুমি তো কেবলি ভাবছ আর ভাবছ। রদ্যাঁর ভাবুকের মতো। কলম ধরে লিখছ না কেন? বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরা যে অনিষ্টটা করছেন তোমরা সাহিত্যিকরা সেটাকে ইষ্ট দিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারো। ইভিল যত প্রবল হোক না কেন গুড তার চেয়েও প্রবল হতে পারে। শয়তান যত শক্তিশালী হোক না কেন ভগবান তার চেয়েও শক্তিশালী। যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে ভাবতে চাও তো শয়তানকেও বাদ দিয়ে ভাবো। কোথাও যদি ভগবানের হাত দেখতে না পাও তো শয়তানের হাতই বা দেখতে যাও কেন? আজকের দুনিয়ায় যেসব ফোর্স কাজ করছে হিটলার, স্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট হচ্ছেন তাদের হাতের যন্ত্র। ওঁরা কেউ ব্যক্তিগত খামখেয়ালির দ্বারা চালিত হয়ে মারাত্মক সব সিদ্ধান্ত নেননি। নৈর্ব্যক্তিক চাপ তাঁদের বাধ্য করেছে। প্রাইভেট লাইফে কেউ হয়তো খারাপ লোক নন। পাবলিক লাইফে প্রত্যেকেই কম বেশী খারাপ। বৈজ্ঞানিকরাও তাই, যদি রাষ্ট্রের অর্থ গ্রহণ করেন। তুমি স্বাধীন ব্যারিস্টার। তোমার মতো স্বাধীনতা কার? তুমি তোমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করো। অন্যের ব্যভিচার নিয়ে ওল্ড মেডদের মতো যত কুটকচালি করতে যাও কেন?"

"আমি ওল্ড মেড!" স্বপনদা করুণ কণ্ঠে বলেন।

"ওল্ড মেড বলিনি। বলেছি ওল্ড মেডদের মতো। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে? কবে লিখবে তোমার ক্লাসিক উপন্যাস? কবে থেকে শুনে আসছি তুমি এই লিখবে, ওই লিখবে, কিন্তু লিখতে তো হাত ওঠে না। মাদাম বোভারীর ব্যভিচারের মতো ব্যভিচারই তোমার প্রিয় বিষয় মনে হচ্ছে। লেখ না কেন একটা মুখরোচক কেচ্ছা। তোমাদের ব্যারিস্টার মহলে তো পরকায়া প্রেমের অভাব নেই। পরকীয়াকে পরে স্বকীয়াও করা হচ্ছে। স্বকীয়াকে পরকীয়া।" বৌদি রসিয়ে রসিয়ে বলেন।

"লিখি আর তারপরে লাইবেলের মামলায় জড়িয়ে পড়ি। এদেশে 'মাদাম বোভারী' লেখার মতো ঝকমারি আর নেই।" স্বপনদা সহাস্যে বলেন।

"চিরন্তন ত্রিভুজ না হলে কি চিরায়ত সাহিত্য হয়? পশ্চিমের আদি কবি হোমারের 'ইলিয়াড' কি এর সেরা দৃষ্টান্ত নয়?" বৌদি পরিহাস করেন।

"তা যদি বলো ভারতের আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণও তাই। হেলেন, পারিস, মেনেলাউস। রাম, রাবণ, সীতা। রাবণ সীতার সতীত্বহানি করেনি, এই যা তফাং। তবে অযোধ্যার লোক সেটা বিশ্বাস করল না। তাই শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডী।" স্বপনদা দরদের সঙ্গে বলেন।

"মধ্যযুগেও তো একই থীম। এদিকে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস। ওদিকে দান্তে, পেত্রার্কা। পরকীয়া না হলে চিরায়ত সাহিত্যই হয় না। তার মানেই চিরন্তন ত্রিভুজ। এ সমস্যা তিন হাজার বছর আগেও ছিল, তিন হাজার বছর পরেও থাকবে। তুমি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে দিনরাত ভাবছ, কিন্তু এক আধ শতাব্দী পরে এসব সমস্যা বাসী হয়ে যাবে। হিটলারের আমলের কোনো চিহ্নই থাকবে না। চার্চিলকেও লোকে ভুলে যাবে। স্টালিনের ডিকটেটরশিপ রাশিয়ানদের অসহ্য হবে। রুজভেল্টের নিউ ডীল তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে। জাপান আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু তার এটুকু শিক্ষা হয়েছে যে পার্ল হারবারে বোমা ফেললে হিরোশিমায় বুমেরাং হয়। ওটা জার্মানদেরও শিক্ষার সূত্র। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এ শিক্ষা হতো না। পরকে মেরে তার হাতে মরাও একপ্রকার পরোক্ষ আত্মহত্যা। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এটা আরো পরিষ্কার হবে।" বৌদির বিশ্বাস।

"তৃতীয় মহাযুদ্ধ কি সত্যি বাধবে?" স্বপনদার সন্দেহ।

"বাধলে আশ্চর্য হব না। না বাধলে আনন্দিত হব। মানবজাতির উপরে তোমার যতখানি ভরসা আমার ততখানি নেই। তুমি ধরে নিয়েছ এ জাতি

দিন দিন আরো বিজ্ঞ হবে। আমি কিন্তু দেখছি যতবার নতুন কোনো যন্ত্র বা নতুন কোনো অস্ত্র উদ্ভাবন করছে ততবার ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ফলে প্রগতিটাই হয়েছে দুর্গতির সঙ্গে একাত্ম। এর যদি কোনো প্রতিকার খুঁজে বার করতে পারো তো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখ। নয়তো মন দাও চিরন্তন বিষয় নিয়ে চিরায়ত কাব্য নাটক উপন্যাস রচনায়। যদি সে ক্ষমতা থাকে।" বৌদি গুরুজনের মতো উপদেশ দেন।

"একেই বলে কান্তাসম্মিত।" স্বপনদা হাসেন। "তুমি ছাড়া আর কে আমার উপর মাস্টারি করবে? কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাগুলো আমাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে আমি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পাঁচ দশ পৃষ্ঠার বেশী লিখতে পারিনে। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেরাজ ভরে গেছে। একদিন না একদিন সমাপ্ত করব বলে সংরক্ষণ করছি। কিন্তু মনের মতো মুড পাচ্ছিনে। ডসটয়েভ্স্কির মতো যদি অন্নাভাব থাকত তা-হলে পেটের জ্বালায় সমাপ্ত করতুম আর প্রকাশকের হাতে দিয়ে প্রাণরক্ষা করতুম। বাবা যা রেখে গেছেন তা তোমার আমার পক্ষে ঢের। আর একজন কি দু'জন এলে অবশ্য গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হবে। তার জন্যেই তো ব্যারিস্টার হয়েছি। বই লেখার চাড় নেই। ডসটয়েভ্স্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অফুরন্ত সৃষ্টি করতে পারছিনে। যার অন্নাভাব নেই তার থাকে রবি ঠাকুরের মতো ড্রাইভিং ফোর্স। যে ফোর্স ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে যায় হাওড়া থেকে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। বঙ্কিমের ভিতরেও সে ফোর্স ছিল। কিন্তু ছিল না মাইকেলের ভিতরে। হয়তো থাকত ব্যারিস্টার না হলে।"

ইতিমধ্যে সৌম্যর চিঠি পেয়ে সোনাদি লিখেছেন, "তোমরা বিয়ে করতে চাও শুনে পরম আনন্দিত হয়েছি। বাপু আজকাল কারো বিয়েতে বাধা দেন না। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়েও উদার। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের চেয়েও উৎসাহী। তিনি এত জোরে জোরে হাঁটছেন যে আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিনে। যেমন কায়িক অর্থে তেমনি মানসিক অর্থে। আগে ছিলেন কট্টর বর্ণাশ্রমী। এখন কাস্টলেস সোসাইটির প্রবক্তা। অসবর্ণ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনো বিবাহে তিনি আশীর্বাদ করেন না। তাঁর সব চেয়ে পছন্দ ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহ। হরিজনকে পুরোহিত করাও তাঁর আর একটি নীতি। এতে ব্রাহ্মণদের মনোপলিতে হাত পড়ে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের ঘাঁটি পুণা। সেখান থেকে প্রায়ই হত্যার হুমকি আসে।

বাপুকে সাবধান করে দিলেও তিনি গা করেন না। বলেন, মরতে তো একদিন হবেই। স্বধর্মে নিধনই শ্রেয়। আমার ধর্ম সত্য আর অহিংসা।"

এর পর আসল কথা। "তোমাদের বিয়েতে বাপু সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। তবে তুমি যদি দেশের মুক্তির জন্যে আবার লড়তে চাও তবে তোমাকে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে। নয়তো দুজনে মিলে গঠনকার্যে আত্ম-নিয়োগ করো।"

আক্কেল গুড়ুম। চিঠিখানা সৌম্য জুলিকে দেখায় না। তার মাকেও না। সটান চলে যায় স্বপনদার কাছে।"

"অ্যাঁ!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। ছুটে আসেন বৌদি। চিঠি পড়ে তিনিও আঁতকে ওঠেন। "অ্যাঁ!"

"ওল্ড ম্যান গান্ধীর ওই এক অবসেসন। ব্রহ্মচর্য! এক বছরেই স্বরাজ হবে এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে অনেকেই ব্রহ্মচর্যে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কোথায় এক বছর! কেটে গেছে পঁচিশ বছর। ব্রহ্মচর্যে অটল রয়েছে এমন সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ক'জন! তুমি যদি তাদের একজন হতে চাও তা হলে বিয়ের জন্যে বাগ্‌দান করে ভুল করেছ। ইংরেজ কোন্ দুঃখে ভারত ছাড়বে! এখন সে আপদমুক্ত। আবার লড়তে হবে। তবে অহিংসভাবে কি না সন্দেহ। গান্ধীর দিন গেছে। সুভাষের দিন এখনো যায়নি। তবে সুভাষ যদি না ফেরে কমিউনিস্টরাই সহিংসভাবে লড়বে। তুমি গঠনের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থেকো। তা হলে একটি অনিচ্ছুক বধূর উপরে ব্রহ্মচর্য চাপিয়ে দিতে হবে না। ওর সম্মতি থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ও সম্মতি দেবে। মিলনবাসনার সঙ্গে রয়েছে মাতৃত্বের বাসনা। এসব বাসনা চরিতার্থ না হলে যা হয় তা ফ্রয়েড পড়লে জানতে পারবে। মানসিক অসুখের প্রধান কারণ রিপ্রেসন। এটা মেয়েদের বেলাই বেশী। পুরুষরা তো এদিক ওদিক চরে বেড়াতে পারে। মেয়েদের সে স্বাধীনতা নেই। জুলির মা গোপন করতে চাইলে কী হবে? জুলি এখন অর্ধ পাগল। আস্ত পাগল হবে তুমি যদি বিয়ের পরে ওর উপর ব্রহ্মচর্য চাপাতে যাও। হিটলারের মতো ব্রহ্মচারী আর কে? কিন্তু তিনিও এফা ব্রাউনের উপর ব্রহ্মচর্য চাপাননি।" স্বপনদা অম্লানমুখে বলে যান।

বৌদি ফিক করে হাসেন। "তুমি কী করে জানলে? তুমি কি ওদের বেড চেম্বারে আড়ি পেতেছিলে।"

"মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হিটলার যে এফাকে বিয়ে করেন এটা কৃতকর্মকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্যেই। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় মৃত্যু আসন্ন ভেবে গ্যেটেও তাই করেছিলেন। অসাধারণদের সঙ্গে সাধারণদের তফাৎটা এইখানে যে সাধারণরা আগে বিয়ে করে, তারপরে সহবাস করে।" স্বপনদা উত্তর দেন।

"আমি কেবল ভাবছি আমার দেশোদ্ধারের প্রতিজ্ঞার কী হবে। ওটা কি তবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়? অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা জেলে যাবে, জরিমানা দেবে, জায়গা জমি হারাবে, কেউ কেউ প্রাণও হারাবে। আর আমি কিনা বিয়ে করে বৌ নিয়ে নিরাপদে ঘরসংসার করব? আশ্রমে বাস করে ঘরসংসার করা বিসদৃশ দেখাবে। আশ্রমের বাইরেই থাকতে হবে। বাইরে থেকে আশ্রম চালানো যেন বাড়ী থেকে আপিস আদালত চালানো। আশ্রম ওভাবে চালানো উচিত নয়। আশ্রমেই বাস করতে হবে জুলিকে আর আমাকে। আলাদা একখানা কুঁড়ে ঘরে। কিন্তু আশ্রমের নিয়মই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন। বিবাহিত কর্মীদের তাই করতে বলা হয়। যারা পারে না তারা বাইরে বাসা নেয়। তারা কেউ আশ্রমের পরিচালক নয়। আমাকে পরিচালকের দায়িত্ব ছাড়তে হবে দেখছি। কিন্তু সে দায়িত্ব নেবে কে? মুক্তিযুদ্ধেও থাকব না, আশ্রম পরিচালনাতেও থাকব না, এতদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম সেটা কি তবে বৃথা যাবে? দেশ লাভবান হবে না?" সৌম্য উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "সত্যাগ্রহ বিগিন্‌স অ্যাট হোম। সত্যটা এক্ষেত্রে কী? সত্যটা এই যে তুমি একটি মেয়েকে বিবাহ করবে বলে বাগ্‌দত্ত হয়েছ। দেশের স্বাধীনতা যদি আজ আসে তবে কাল তাকে তুমি বিয়ে করবে। তার পরে যথারীতি ফুলশয্যা। ব্রহ্মচর্যের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা কবে হবে কেউ জানে না। দু'বছর পরেও হতে পারে, দশবছর পরেও হতে পারে। আরো একবার সংগ্রামের প্রয়োজন যদি হয় তবে সেটা যে গান্ধীজীর নেতৃত্বেই হবে এটা তোমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার কাছে নয়। জবাহরলাল তো ব্যারিস্টারের গাউন এঁটে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের তিন সর্দারের মামলায় আসামী পক্ষের কৌঁসুলী হয়েছেন। অমনি করে আস্ত ফৌজটাকেই তিনি আপনার করবেন। দরকার হলে ওদের নিয়ে লড়াইয়ে নামবেন। তখন কোথায় গান্ধী আর কোথায় তুমি। সত্যাগ্রহই বা কোথায়।

তুমি যাও, মহাত্মাকে বুঝিয়ে বলো যে বিয়ের পরে ব্রহ্মচর্য স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। রাস্‌কিন তো তাঁর অন্যতম গুরু। রাস্‌কিনের বেলা কী হয়েছিল তিনি কি তা জানেন না?"

"কী হয়েছিল?" বৌদি কণ্ঠক্ষেপ করেন।

"সে কী! তুমি জানো না?" স্বপনদা আশ্চর্য হন। "কিন্তু রাতের পর রাত যায়, মাসের পর মাস যায়, বছরের পর বছর যায়, পাঁচ বছরেও বিয়ের জল পড়ে না। রাস্‌কিনের বিশ্বাস ওতে নরনারীর দেহমনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। বেচারি এফি অতিষ্ঠ হয়ে বিখ্যাত চিত্রকর মিলেসের সঙ্গে ইলোপ করেন। তার পরে রুজু হয় সেই প্রসিদ্ধ মামলা। পাঁচ বছরেও কনসামেশন হয়নি। রাস্‌কিন নপুংসক। বিবাহ বাতিল। মিলেসের সঙ্গে এফির বিবাহ ফলপ্রসূ হয়। সাবধান, সৌম্য! অশরীরী প্রেম সারা জীবন স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু অশরীরী বিবাহ যে কোনো দিন আদালতের বিচারে বাতিল হবার যোগ্য। ক্যারামেল পরের হবে না, কিন্তু সেও একদিন গৃহত্যাগ করতে পারে। সেই যে একটা কথা আছে, অতি ঘরন্তী না পায় ঘর। তেমনি, অতি আদর্শবাদী না পায় ঘরণী। তোমাকে ঘরণীহীন হয়ে ধরণী ত্যাগ করতে হবে।"

সৌম্য এত কথা জানত না, শুনে তাজ্জব বনে।

স্বপনদা সৌম্যর মুখ দেখে সদয় হয়ে বলেন, "সব মেয়ে এফি নয়। বার্নার্ড শ'র সঙ্গে যখন শার্লটের বিয়ে ঠিক হয় তখন শার্লটই জেদ ধরেন বিয়ের পরে তাঁর বন্ধু যেন তাঁর গায়ে হাত না দেন। অর্থাৎ বিয়ের পরেও তাঁরা বন্ধু ও বন্ধুনী। সখা ও সখী। সম্ভব, সম্ভব, এই সম্পর্কটাও সম্ভব। লোকে কী মনে করবে, তাই একসঙ্গে থাকতে হলে বিবাহ বলে একটা অনুষ্ঠান করতে হয়। একসঙ্গে থাকাটাই আসল, বিয়েটা লোক দেখানো। তা তোমরা ইচ্ছে করলে বিবাহিত বন্ধু ও বন্ধুনী হতে পারো। যদি ক্যারামেল সম্মতি দেয়। বলা যায় না, দিতেও পারে। কিন্তু সেটা হয়তো মন থেকে নয়, শুধু বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার আগ্রহে। ইউরোপে এর নাম কম্পানিয়নেট ম্যারেজ। এদেশেও এর নজীর আছে। কিন্তু ক্যারামেল যে রকম মেয়ে তার সম্মতিটা পরে অসম্মতিতে দাঁড়াতে পারে। ও কি মা না হয়ে সুখী হবে ভেবেছ?"

সৌম্য সামলে নিয়ে বলে, "ওর অসম্মতির আভাস পেলে বাপুকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি চাইব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে সোনাদির চিঠিখানা দেখাতে সাহস হচ্ছে না। ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করতে পারে। তখন হয়তো আশ্রমে বাস

করতে নারাজ হবে। গঠনের কাজে সহযোগিতা করবে না। সবচেয়ে ভালো হতো ইংরেজরা যদি আজকেই ভারত ছাড়ত।"

"আহা! সেইখানেই তো গোল। সব চেয়ে যেটা ভালো সেটা কি কোথাও কখনো হয়েছে না হবে? মানুষকে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি ও ক্যারামেল দু'জনে দু'জনাকে ভালোবাসো। এ ভালোবাসা দীর্ঘকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড আর জেল এর ব্যাঘাত ঘটায়নি। এ ভালোবাসার জয় হবেই। দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে একে অযথা ঘোরালো করার মানে হয় না। তোমার কৌমার্য ভঙ্গ হবে, অথচ ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হবে না এটা একটা অবাস্তব অনুশাসন। তুমি এর বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করো। পোপ কি অভ্রান্ত? পোপের অমনতরো দাবীর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে গিয়েই প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এদেশেও তাই হবে। গান্ধীজীর সঙ্ঘেও। তুমিই ভারতের মার্টিন লুথার হতে পারো। তিনি ক্যাথলিক সন্ন্যাসী থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রটেস্টাণ্ট হয়ে বিবাহ করেন। তখন থেকেই প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রীরা বিবাহ করে আসছেন।" স্বপনদা সৌম্যকে উস্‌কে দেন।

তা লক্ষ করে বৌদি বলেন, "সৌম্য যদি স্বাধীনতা সংগ্রামের সংশ্রব ছেড়ে দিয়ে গঠনের কাজ নিয়ে থাকে তবে গান্ধীজী কৌমার্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্যভঙ্গেরও অনুমতি দেবেন। ইচ্ছা করলে সে আর কারো নেতৃত্বে সংগ্রাম করতেও পারে, আর কেউ ব্রহ্মচর্যের উপর এতখানি জোর দেবেন না। তবে আমি যতদূর বুঝি বিবাহিত ব্রহ্মচারী একটা নতুন কনসেপ্ট। ক্যাথলিক বা প্রটেস্টাণ্ট কোনো সম্প্রদায়েই এ কনসেপ্ট নেই। থিওসফিস্টদের মধ্যেই এর চল দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরই সমসাময়িক সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীদের মধ্যেও। পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরেও এর পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। এ সাধনা সর্বসাধারণের জন্যে নয়। বাছা বাছা স্ত্রীপুরুষের জন্যে। সৌম্য আর জুলি যদি তাদের পর্যায়ে পড়ে তো সভ্যতাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।"

দরদী শ্রোতা পেয়ে সৌম্য বলে, "আমার যে কী সঙ্কট তা কেমন করে বোঝাব, দাদা, বৌদি! আমি ছিলুম দেশের কাছে সত্যবদ্ধ, তার পরে হলুম নারীর কাছে সত্যবদ্ধ। এক সত্যের সঙ্গে আরেক সত্যকে মেলাই কী করে? বিয়াল্লিশ সালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজরা সেই বছরই ভারত ছাড়বে, তার মানে ভারত সরকার গদী ছাড়বে। জন রীডের 'টেন ডেজ

স্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড' পড়েছেন নিশ্চয়। আমার মাথায় তেমনি ঘুরছিল থার্টি ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড। সেই ধারণার বশে আমি জুলিকে বাগ্‌দান করি। তখন তো খেয়াল ছিল না যে জাপানীরা ভারতের দিকে পা বাড়াবে না, বার্মায় তটস্থ থাকবে। এখন আমি কথা রাখতে গিয়ে সঙ্কটে পড়ে গেছি। আমার উদ্ধারের উপায় কী? বাপুর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ? কেন, তিনি এমন কী নতুন কথা বলেছেন? রামকৃষ্ণদেব আর সারদামণি দেবী এঁরাও তো ছিলেন বিবাহিত ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী। জুলি যদি রাজী হতো আমার তাতে আপত্তি থাকত না। তবে সেটা সারাজীবনের জন্যে নয়। আমারও ইচ্ছা করে ঘরসংসার পাততে, সন্তানের পিতা হতে। আমার আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। ব্রহ্মচর্যব্রতধারী সন্ন্যাসী নয়। কিন্তু যার দেশ পরাধীন তাকে স্বাধীনতার জন্যে লড়তে হবে। লড়াই যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন আরামে ঘরসংসার করা চলবে না। তাই বলে কি একটি মেয়ে তার জন্যে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করবে? যৌবন বয়ে যেতে দেবে? জরাগ্রস্ত হবে? সন্তানের জননী হবে না? স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে না? অ্যাবনর্মাল হবে? আমি বড়ো আশা করেছিলুম যে জুলি সুকুমার দত্তবিশ্বাসকে বিয়ে করে সুখী হবে। তা তো হলো না। জুলির আমাকেই পছন্দ। কোনোদিন ওকে আমি ভোলাবার চেষ্টা করিনি। বরং দাড়িগোঁফ রেখে হোঁদলকুৎকুতের মতো চেহারা করে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আমি যা খাই তা কি ও কোনোদিন খাবে? আকাঁড়া চালের ভাত, অড়হরের ডাল, কাঁচা আনাজ, সিদ্ধ তরকারির ঘোঁট। জুলিকে নিবৃত্ত করতেই চেয়েছি। কিন্তু কমলী নেহি ছোড়তি। বিয়ে ওকে করতেই হবে। বিয়ের পর বিয়ের সুখ দিতেই হবে। দুঃখও যে দিতে হবে না তা নয়। বিরহের দুঃখ। ওর যা মতিগতি ও কখনো গ্রামে বা আশ্রমে থাকবে না। কিছুদিন পরে পালিয়ে আসবে কলকাতা শহরে। ওর মায়ের কাছে। ওকে সুখী করার জন্যে আমিও আমার কর্মস্থল ছেড়ে চলে আসব নাকি? তা হয় না। পুরুষের কাছে তার কর্মক্ষেত্রই যথাস্থান। শেষপর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে দু'জনের দুই কর্মক্ষেত্র। সেটা মেনে নিয়েই বিবাহিত জীবন। তাতেও আমি রাজী। তবে আপাতত আমরা একসঙ্গে থাকার কথাই ভাবছি। জুলি আপাতত আমার আশ্রমেই বা তার আশেপাশেই থাকবে। সোনাদি যেমন আছেন সেবাগ্রামে। তার আগেই বিয়েটা যেন চুকে যায়। কিন্তু আরো আগে আমাকে একবার আশ্রমে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে।"

বৌদি সহানুভূতির সুরে বলেন, "ভেবো না, সৌম্য। সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক করে দেবে প্রকৃতি। সে তোমার বাপুর চেয়েও বলবান। তার কাছে কত ঋষি মুনি হার মেনেছেন। তাঁদের আশ্রমে কী না হতো! প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে আপস করতে হয়। তোমাদেরও করতে হবে। বাপুকে মান্য করতে গিয়ে প্রকৃতিকে অমান্য করলে তার ফল হবে মানসিক বিকার। এর মধ্যে আমি কোনো নৈতিক স্খলন দেখিনে। হিন্দুদের গৃহস্থ আশ্রমে পতিপত্নীর সহবাসই সুনীতি।"

স্বপনদা জুড়ে দেন, "রাজনীতি ছেড়ে দিলে বাপুও তোমাদের গৃহস্থের মতো আচরণ করতে বলবেন। তবে সংগ্রামের বেলা ডাকবেন না। কী আসে যায়?"

সৌম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার অংশ থাকবে না! তপস্যা ব্যর্থ যাবে!"

স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দেন। "ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম এত বেশী ভায়োলেণ্ট হবে যে তাতে তোমার অংশ থাকতেই পারে না। যদি না তুমি সুভাষের মতো জঙ্গী নেতা হও। তা যদি হও তবে তোমার বাপুর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ অনিবার্য।"

"না, না। আমি কখনো আমার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হব না। উদ্দেশ্য যেমন মহৎ হবে উপায়ও তেমনি বিশুদ্ধ হবে। মিলিটারিজমের সাহায্য নিলে পরে তার সঙ্গে লড়তে পারা যাবে না। স্বাধীন ভারত মিলিটারিস্ট হলে সেটা কি আমার সহ্য হবে? আবার আমি জেলে যাব। বাপুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অসম্ভব। সত্য আর অহিংসা তো আমি বিসর্জন দিচ্ছিনে। সেখানে স্থির থাকছি। অস্থিরতা কেবল ব্রহ্মচর্যের বেলা। আরো কিছুদিন লাগবে মনঃস্থির করতে। দেশকে ভালোবাসা আর নারীকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাপুর সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আমার বোঝাপড়া হবে। কিন্তু এখন নয়। এখন তিনি সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার পর বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পলিসি নির্ধারণ নিয়ে ব্যস্ত। বড়ো বড়ো নেতাদেরই সময় দিতে পারছেন না। আমাকে দিলে কতটুকু সময় দেবেন? বাপুর সঙ্গে বোঝাপড়া ধীরে সুস্থে হবে। আপাতত জুলির সঙ্গে বোঝাপড়া তো হোক। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি যদি ওর হাত না ধরি ও সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের টানে তলিয়ে যাবে।" সৌম্য উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

"ঠিক বলেছ। সাবাশ!" বৌদি তারিফ করেন। "এবার আমার একটা পরামর্শ শোন দেখি। তুমি জঙ্গী নেতা হবে না। কিন্তু তার বদলে হবে জংলী নেতা। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে তোমার মুখ চোখ ঢেকে যাবে। সেটা কোন্ বৌ পছন্দ করবে? বিয়ের আগে হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে এসো। তখন তোমাকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাবে।"

সৌম্য হো হো করে হাসে।

স্বপনদা হাসি থামিয়ে বলেন, "দেশমাতার চল্লিশ কোটি সন্তান। তুমিই একমাত্র নও। কিন্তু ক্যারামেলের তুমিই একমাত্র বর। তুমি না থাকলেও সংগ্রাম দিব্যি চলবে, ফলাফলের এমন কিছু ইতরবিশেষ হবে না। কিন্তু তুমি না থাকলে ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তা হলে বুঝতে পারছ তোমার উপস্থিত কর্তব্য ওর পাশে দাঁড়ানো। ওকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। কোথায় থাকবে, কী খাবে, এসব প্রশ্ন গুরুতর নয়। তুমি দেখবে ও তোমার সঙ্গেই আশ্রমে বা গ্রামে থাকবে। আকাঁড়া চালের ভাত আর অড়হরের ডাল খাবে। তবে হজম করতে পারবে কি না সন্দেহ। প্রেমে পড়লে বা প্রেমে পড়ে বিয়ে করলে মেয়েরা সব দুঃখ সইতে পারে। সইতে পারে না কেবল স্বামীর ভালোবাসার শরিক। সেদিক থেকে তুমি ঠিক থাকলেই হলো। অন্য কোনো নারী তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তোমার ওই জঙ্গলটিই ওদের ভয় পাইয়ে দেবে। খবরদার, ওটি সাফ করতে যেয়ো না। রাজপুত্তুর হলেই তুমি গেছ। তোমাকে নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হবে। তবে ক্যারামেল যদি তোমাকে সভ্য ভব্য করতে চায় সেকথা আলাদা। বৌরা নিজেরাই কাঁচি ধরে শিল্পকর্ম করে, জানো তো। তুমিও হয়তো একদিন একটি শিল্পকর্মে পরিণত হবে।" এই বলে স্বপনদা শাসান ও হাসান।

॥ চার ॥

শিয়ালদা স্টেশন। চিটাগং মেল। সৌম্যকে তুলে দিতে এসেছে জুলি, সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীর ড্রাইভার। ট্রেন ছাড়তেই জুলি রুমাল নেড়ে বিদায় দেয়। সৌম্য কিছুক্ষণ বাইরে মাথা বাড়িয়ে তাকায়। তারপর সদ্য কেনা সংবাদপত্রে মুখ ঢাকে।

একটু দূরে বসেছিলেন এক পরিচিত সহযাত্রী, সন্তোষ সাধুখাঁ। কুশল প্রশ্নের পর তিনি কথাবার্তা জুড়ে দেন। "গান্ধী মহারাজের ওটা কি সত্যিকার অসুখ, না ডিপ্লোমাটিক অসুখ? অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংএ হাজির না থাকার অজুহাত? আছেন বোম্বাইতে, যোগ দিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে, অথচ এ. আই. সি. সি'র বেলা অসুস্থ!"

সৌম্য জুলির কথা ভাবছিল। ভাবনায় ছেদ পড়ায় মনে মনে বিরক্ত হয়। বলে, "আজকাল তিনি কথায় কথায় গুরুদেবের গানের একটি পঙ্‌ক্তি আওড়ান। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে তুই একলা চল রে।' ওঁর ছেলেরা এখন সাবালক হয়েছে। বাপের কথায় ওঠে না, বসে না। মানে মানে সরে থাকাই বুড়ো বাপের পক্ষে শ্রেয়। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা ওরাই নিজেদের বিবেচনায় নেবে। ফলাফলের জন্যে নিজেরাই দায়ী হবে। আপৎকালে কংগ্রেস একটা সৈন্যদল। অন্য সময় একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। একজনের নির্দেশে নয়, অধিকাংশের মতে কাজ করবে। আজকের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতারা সাবালক পুত্রের মতোই ব্যবহার করবেন। তাঁদের মধ্যেও সে রকম একটা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে জবাহরলালের মধ্যে। মনে হচ্ছে তিনিই বাপের বড় ছেলে। যদিও বয়সে বল্লভভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে ছোট। বাপু তো অনেক আগে থেকেই ঘোষণা করে বসে আছেন যে জবাহরলালই তাঁর উত্তরাধিকারী।"

সন্তোষবাবু তা শুনে বলেন, "জবাহরলালের নেতৃত্ব কি কংগ্রেসসুদ্ধ সবাই মেনে নেবে? দেশসুদ্ধ তো দূরের কথা।"

"তা যদি বলেন দেশসুদ্ধ লোক কি গান্ধীজীকেই মানে? তাঁকে ভক্তি করে সবাই, কিন্তু কেউ তাঁর একটি কথাও মানে না। উপায় হিসাবে অহিংসার উপরে কারো বিশ্বাস নেই। গত মহাযুদ্ধে জার্মান পক্ষে দু'কোটি আর রুশ পক্ষে দু'কোটি লোক মারা গেছে। এ ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষেও বহু লোক মরেছে। কিন্তু কোথাও কি হিংসার প্রেস্টিজ কমেছে? আমাদের এ দেশেও না। বাপু এখন রাশ ছেড়ে দিচ্ছেন। কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় অন্য পথ নিতে চায় নিতে পারে। তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে কংগ্রেস নির্বাচনে নামবে। যদি জেতে আবার মন্ত্রিত্ব করার আহ্বান পেলে আবার মন্ত্রিত্ব করবে। অবশ্য জিন্না সাহেব যদি বাগড়া না দেন। তিনি পাঁচবছর আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছেন যে তুলকালাম কাণ্ড করবেন।" সৌম্য স্মরণ করে।

"বাপ রে, বাপ। জিন্না সাহেব! গান্ধীজী সতেরো বার তাঁর দরবারে হাজির হয়েছেন। তিনি একবারও রিটার্ন দেন'নি। দ্বিতীয় এক বড়লাট আর কী! বড়লাটকেও কি তিনি তোয়াক্কা করেন। সিমলা বৈঠকটা তো তাঁর জেদের জন্যেই ভেস্তে গেল। ওয়েভেল চেয়েছিলেন লীগের বাইরে থেকে একজন ইউনিয়নিস্ট মুসলমান। তাঁরা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। জিন্না বাদ সাধলেন। লীগপন্থী ভিন্ন আর কেউ মুসলিম প্রতিনিধি হতে পারে না। যাঁর অনমনীয় জেদের কাছে রাজপ্রতিনিধি পর্যন্ত নতজানু। তিনি তুলকালাম কাণ্ড করলে কংগ্রেস নাচার।" সন্তোষবাবু বলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। সৌম্যর মাথায় গান্ধী টুপী দেখে জনতার ভিতর থেকে একজন মৌলবী বলে ওঠেন, "দাদাজী, এমন দিন ছিল যখন জিন্না সাহেবই মহাত্মাজীকে বাঁচাবার জন্যে বোম্বাই থেকে বারডোলী ছুটে যান। তাঁর দৌরার জন্যেই তো সেবার গণ সত্যাগ্রহ শুরু হবার আগেই বন্ধ হলো। অসময়ের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাঁর দলের লোকদের বাদ দিয়ে সাত আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করলে তাঁর মান থাকে কোথায়? আরো আগে সাধারণ নির্বাচনের সময় মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলিতে লীগ প্রার্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী মুসলমানদের খাড়া করা হয়েছিল। মুসলমানে মুসলমানে লড়াই বাধিয়ে দেওয়াটা কি ইংরেজ শাসকদের মতো হিন্দু শাসনপ্রত্যাশীদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নয়? গান্ধী মহাত্মাকে চেপে ধরলে তিনি বলবেন তিনি কংগ্রেসের সদস্যও নন। কায়দে আজমের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর ওই একই কৈফিয়ৎ। তিনি কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবার অধিকারী নন। আবার সাধারণ নির্বাচনের দিন আসছে। আবার তেমনি ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হতে যাচ্ছে। দাদাজী, আপনি কি সেটা ভালো মনে করেন? যদি না মনে করেন তো গান্ধী মহাত্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে আপসে আসন ভাগ করে নেয় তা হলে তার সুর বদলে যাবে। সে আর পাকিস্তানের ধুয়ো ধরে নির্বাচনের কেল্লা ফতে করতে চাইবে না। আমরা মুসলমানরাও বুঝি যে পার্টিশন আমাদের পক্ষেও ভালো নয়। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমানদের কাছে হার মানতেও আমরা নারাজ। ওঁরা দেশের জন্যে জেলে গেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের দিক থেকে চিন্তা করলে কায়দে আজমের মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো

উচিত নয়। আমিও তো এক কালে কংগ্রেসে ছিলুম। জেলেও যে যাইনি তা নয়। কিন্তু এখন আমার বিচারে কায়দে আজমের হাত শক্ত করাই সব মুসলমানের কর্তব্য।"

সৌম্য হতবাক্। জাপানীদের আক্রমণের মুখে যাদের বাঁচাতে সে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়েছিল তারাই এত সহজে ভুলে গেল কংগ্রেসের কী ভূমিকা আর লীগেরই বা ভূমিকাটা কী। মহাত্মার কথা ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে। যাক গে!

"দেখুন, মিঞা ভাই, আপনি নিজেই তো একদিন কংগ্রেসে ছিলেন। আপনার নিজেরও একটা দাবী আছে কংগ্রেস থেকে দাঁড়াবার। দলে ভারী হলে মন্ত্রী হবার। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মতো নির্যাতন সহ্য করেছে কে? খান্ আবদুল গফ্‌ফার খান্ নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না, মন্ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনিও গান্ধীজীর মতো নিঃস্পৃহ সত্যাগ্রহী। আমিও তাঁদের অনুগামী। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে না লড়ত, মন্ত্রিত্ব না চাইত তা হলে সত্যাগ্রহ আরো ভালো জমত। দেশের স্বাধীনতা আরো গৌরবময় হতো। কিন্তু পলিসি স্থির করতে হয় পার্টির নাড়ী টিপে। নির্বাচনে নামতে না দিলে কংগ্রেস ভেঙে দু'খানা হতো। মন্ত্রিত্ব করতে না দিলেও তাই। ফলে যা হবার তা হয়েছে। গান্ধীজীর হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি এককোঁটাও বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই। কংগ্রেস মুসলমানদেরও পার্টি। যাঁরা পাকিস্তান চান না তেমন মুসলমানের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। মুসলমানরা একবাক্যে পাকিস্তান চাইলে তাঁদের গায়ের জোরে বাধা দেওয়া কংগ্রেস নীতি নয়। আপসও নয় কংগ্রেসের নীতি। কংগ্রেসের নীতি অহিংস অসহযোগ। মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস যাবে বনবাসে।"

মৌলবী সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, "অহিংস অসহযোগের বংশীধ্বনি শুনে আমিও তো কুলত্যাগ করেছিলুম, দাদাজী। কুলত্যাগ বুঝলেন না? স্কুলত্যাগ। মদের দোকান পিকেট করতে গিয়ে মাস ছয়েক বন্দীও ছিলুম। সেসব দিন কি ভোলা যায়? তার পরে এল উল্টোরথের দিন। প্রায় সবাই সুড়সুড় করে স্কুলে কলেজে ফিরে যায়। আমিও। অহিংস অসহযোগের উপর বিশ্বাস টলে যায়। নেতাদের অনেকেই কাউন্সিলে গিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়বার নতুন কায়দা শেখান। মনে হলো সেইটেই ঠিক পথ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর আমার অগাধ আস্থা। হিন্দু মুসলমানকে একজোট করতে

হলে চাই নির্বাচিত সদস্যদের দু'পক্ষের একটা চুক্তি। তার নাম বেঙ্গল প্যাক্ট। মুসলমান সদস্যদের কথা হলো শতকরা পঞ্চান্নটি চাকরি তো মুসলমানদের এমনিতেই পাওনা। তার উপর আরও পঁচিশটা দিতে হবে, যাতে তারা এগিয়ে থাকা হিন্দুদের ধরে ফেলতে পারে। তা হলে দাঁড়ায় শতকরা আশি। অবশ্য সাময়িকভাবে। দেশবন্ধুর দরাজ দিল্। তিনি এককথায় রাজী। কিন্তু মুশকিল বাধায় হিন্দু জনমত। আশি দূরের কথা, পঞ্চান্নতেও হিন্দুদের আপত্তি। তার মানে হিন্দুরা বরাবর এগিয়ে থাকবে, মুসলমানরা কোনো দিন তাদের ধরতে পারবে না। কংগ্রেস লীগের লখনউ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের হিন্দুদের সংখ্যানুপাত কম বলে তারাই পাবে ওয়েটেজ। শতকরা পঞ্চাশের বেশী। তারা কম করে পঞ্চাশে রাজী হতে পারে। তার কমে নয়। বি. সি. চ্যাটার্জির ফরমুলা হলো ফিফটি ফিফটি। মুসলিম প্রতিনিধিরা নারাজ। অমনি করে বেঙ্গল প্যাক্ট ফেঁসে যায়। হিন্দু মুসলিম একজোট হয় না। দেশবন্ধু কাউন্সিলের ভিতরে গিয়েও ভোটের জোরে সরকারকে হারাতে পারেন না। তাঁর পলিসি ব্যর্থ হয়। তিনি মনের দুঃখে মারা যান। তখন থেকেই কংগ্রেসের উপর আমাদের অনাস্থা শুরু। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদের পর কংগ্রেসের মুখোস খুলে গেছে। তা বলে সব মুসলমান লীগপন্থী বনে গেছে তা নয়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি আর কোনো দল দিচ্ছে না। যে দল দিচ্ছে তারই ভোটে জেতার সম্ভাবনা বেশী। পাকিস্তান যদি হয় ভোটের জোরেই হবে। গায়ের জোরে নয়। সারা ভারতে মুসলমানদের ভোটের জোর হিন্দুদের তুলনায় কম, সারা ভারত পেলে মুসলিম লীগ ভোটের জোরে শাসন করতে পারবে না। তাই ভারতের একটা অংশই চায়। সমস্তটা নয়। আপনারা তো দুই-তৃতীয়াংশই পাবেন, তবে অহিংস অসহযোগ করতে যাবেন কোন্ দুঃখে ?"

"বাঙালী হিন্দু, পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখ, উত্তরপশ্চিমের পাঠান, এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান চাপিয়ে দিলে এরা তো বিদ্রোহ করবেই। করবে আসামের হিন্দু ও খ্রীস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও। যদি আসামকে পাকিস্তানের সামিল করা হয়। বিদ্রোহ যাতে গৃহযুদ্ধের আকার না নেয় সেইজন্যেই তো আমাদের অহিংস অসহযোগ। আমাদের মানে গান্ধীজীর অনুগামীদের। কংগ্রেসের হয়ে আমি কথা বলতে পারব না। তিনি নিজেও পারবেন না। সেকালের যাঁরা নো-চেঞ্জার একালে তাঁরাও হয়েছেন প্রো-চেঞ্জার। কাকে নিয়ে কাজ

করবেন গান্ধীজী ? জিন্না সাহেব কি বুঝতে পারছেন না যে গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তার চেয়ে জবাহরলাল, বল্লভভাই ও আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ? পাকিস্তান আপসে পেতে হলে এঁদের সঙ্গেই আপস করতে হবে। গান্ধীজী আপস করবেন না। দরকার হলে অহিংস অসহযোগ করবেন।"

"আপস কে না চায়, দাদা ?" মৌলবী সাহেব একান্ত আন্তরিকভাবে বলেন, "কিন্তু তার একটা পদ্ধতি আছে। চাই আর একটা কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট। যেমনটি হয়েছিল লখনউতে ১৯১৬ সালে। উদ্যোক্তা হয়েছিলেন টিলক মহারাজ আর জিন্না সাহেব। আহা, টিলক মহারাজ যদি থাকতেন তা হলে কি জিন্না সাহেব পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করতেন! তেমনি চাই আবার এক বেঙ্গল প্যাক্ট। দেশবন্ধু যদি অকালে চলে না যেতেন তা হলে কি বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের আজকের এই হাল হতো ? কাগজ খুললেই খিস্তি খেউড় ! মুসলমানমাত্রেই রাবণ, হিন্দু মাত্রেই রাম। কিংবা হিন্দুমাত্রেই শয়তান, মুসলমানমাত্রেই ফেরেস্তা। কই, আপনাকে তো শয়তানের মতো দেখায় না, আর আপনিই বলুন, আমিও কি রাবণের মতো দেখতে ?"

সন্তোষ সাধুখাঁ বলে ওঠেন, "আরে না, না, ভাই সাহেব। আপনাকে বরঞ্চ পীর সাহেবদের মতো দেখতে। আমরা হিন্দুরা পীরদের খুব মানি। আপনিই মিটিয়ে দিন না আজকের এই বৃথা কলহ। হিন্দু কি মুসলমানকে ছেড়ে বাঁচতে পারে, না মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে ? পাকিস্তানের প্রস্তাবটা তো পরস্পরকে এলিয়েন করার পরিকল্পনা। মুসলমানের রাজ্যে হিন্দু থাকবে না, থাকলে এলিয়েন হিসাবে থাকবে। আর হিন্দুর রাজ্যে মুসলমান থাকবে না, থাকলে সে হবে এলিয়েন। হিন্দু মুসলমানের অতীতের সম্পর্ক কি ছিল এলিয়েনের সঙ্গে এলিয়েনের সম্পর্ক ? সিরাজের জন্যে হিন্দুরা যত কেঁদেছে আর কে তত কেঁদেছে ? এই বিভেদ নবাবী আমলে ছিল না। এটা ইংরেজেরই সৃষ্টি। ইংরেজ বিদায় নিলেই এর বিলোপ ঘটবে। আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কে জানেন ? তিনি প্রথম সারির গান্ধীবাদী কর্মী সৌম্য চৌধুরী। সম্প্রতি দু'বছর জেল খেটে ফিরছেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়াতে গিয়ে এই দুর্ভোগ।"

"গোস্তাকী মাফ করবেন, দাদা।" মৌলবী সাহেব সশ্রদ্ধ হয়ে বলেন, "ছোট ভাইয়ের নাম গোলাম রহমান। আপনি বাইরে এসেছেন, ভালোই

হয়েছে। বাইরে না এলে বুঝতে পারতেন না পদ্মানদীর জল কতদূর গড়িয়েছে। আপনাকে বাইরেই থাকতে হবে, আবার জেলে গেলে চলবে না। জেলে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন। গান্ধী মহারাজও খেই হারিয়ে ফেলেছেন। সমস্যাটা শুধু ইংরেজদের থাকা না থাকা নিয়ে নয়। হিন্দুদেরও থাকা না থাকা নিয়ে। মুসলমানদেরও থাকা না থাকা নিয়ে। সিরাজের আমল থেকে আমরা সবাই এখন বহুৎ দূরে সরে এসেছি। পরস্পরের উপর বিশ্বাস চলে গেছে। ইংরেজদেরকে যেমন কংগ্রেসওয়ালারা ভারত থেকে সরতে বলছেন তেমনি কংগ্রেসওয়ালাদেরও লীগওয়ালারা বলছেন পাকিস্তান থেকে সরতে। ইংরেজরা ভারত ছাড়লে হিন্দুরাই সমগ্র ভারত পাবে, তাই মুসলমানরা চায় ভারতের একাংশ। মুসলিম ভারত বা পাকিস্তান। এই ভাগাভাগির থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট আর বেঙ্গল প্যাক্ট। জিন্না সাহেবের সঙ্গে দরাদরি করতে হবে মহাত্মা গান্ধীকে। হক্, নাজিম, সুহরাবর্দীর সঙ্গে দরাদরি করতে হবে শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদকে।"

সৌম্য অন্যমনস্কভাবে বলে, "আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি শর্তে। আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তারপরে নেতাদের মধ্যে দরাদরি বা ভাগাভাগি হবে। যাবার বেলা ওরা লীগনেতাদের হাতেই সারা ভারত সঁপে দিয়ে যাক।"

এবার আরো কয়েকজন তর্কে যোগ দেন। তর্ক করতে করতে সবাই যখন অন্যমনস্ক তখন ট্রেন এসে দাঁড়ায় রানাঘাট স্টেশনে। বহু যাত্রী নেমে যায়; বহু যাত্রী ওঠে। হঠাৎ এ কী! এ কে। জুলি।

"কেমন আছো, সৌম্য? কষ্ট হচ্ছে না তো? যা ভিড়।" জুলি বলে।

"তুমি এলে কোত্থেকে?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"মেয়েদের কামরা থেকে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এক মিনিটের মধ্যেই মনঃস্থির করি যে তোমার সঙ্গেই যাব। নইলে তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরব। ড্রাইভারকে বলি মাকে জানাতে। আর চেকারকে বলি প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিতে। এখানে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়ায়? একটা টেলিগ্রাম করতে হবে মুস্তাফী মেসোমশায়কে যে, তোমার সঙ্গে আমিও আসছি।" জুলি এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"কী কাণ্ড! লোকে ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি ইলোপ করছি।"

প্ল্যাটফর্মে নেমে টেলিগ্রাফ অফিসের খোঁজে যেতে যেতে বলে সৌম্য। আর কেউ শুনতে পায় কি না কে জানে!

"সেটা ভুল। আমিই তোমার সঙ্গে ইলোপ করছি।" জুলি হাসে।

গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে দেখে হুড়মুড় করে ওরা দু'জনেই সৌম্যর কামরায় উঠে পড়ে।

জুলিকে উঠতে দেখে তিন চারজন পুরুষ জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হন। সে হাত জোড় করে মাফ চায় ও ধন্যবাদ দেয়। আসন করে নেয় সৌম্যর পাশাপাশি। বলে, "পরের স্টেশনেই আমি নেমে যাব।"

পরের স্টেশনে গাড়ী অল্পক্ষণ থামে। সেখানে নামা নিরাপদ নয়। এর পরে পোড়াদা জংশন। রিফ্রেশমেন্ট রুমে গিয়ে ওরা উপবাস ভঙ্গ করে। তারপর যে যার কামরায় যায়।

গোয়ালন্দে নেমে ওরা চাঁদপুরের স্টীমারে ওঠে। এবার আর ঠাঁই ঠাঁই নয়। একসঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন। একসঙ্গেই ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা নদীর রূপ অবলোকন। গল্পগুজব। নানা কথা।

"রাইন ট্রিপ মনে পড়ে যায়। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। ছিল সুকুমার।" জুলি বলে সসঙ্কোচে।

"আমারও মনে পড়ে। আমিও নিঃসঙ্গ ছিলুম না। ছিলেন আমার এক বিদেশিনী বান্ধবী।" সৌম্য বলে অসঙ্কোচে।

"তা হলে তুমি ওঁকেই বিয়ে করলে পারতে?" জুলির অভিমান।

"ক্ষেপেছ! তাঁর সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক নয়। বিয়ে করলে করতুম অলকাকে। কিন্তু তা হলে আমাকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে হতো। আমার জীবনের ধারাভঙ্গ হতো। অলকার ভালো বিয়ে হয়েছে। ও সুখেই আছে।" সৌম্য তাকে ভোলেনি।

"অলকাকে নিয়ে রাইন ট্রিপ করলে না কেন তাই ভাবছি। তোমার মতো স্বদেশী মানুষের কেন বিদেশিনী বান্ধবী?" জুলি কটাক্ষ করে।

"উনিও ভারতভক্ত আর শান্তিবাদী। আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। আমি তো লঘুচেতা নই যে একে আপন ওকে পর ভাবব। স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, আবার লড়ব, কিন্তু শত্রুভাবে নয়, বন্ধু ভাবেই।" সৌম্য বলে।

"সেইখানেই তো তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ ও পথভেদ। তোমার

বিশ্বাস ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তন হবে। যেন প্রত্যেকেই এক একটি অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বা মীরা বেন। গান্ধীজীর ওই এক ধারণা। অন্তঃপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে কষ্ট যা সইবার তা আমাদেরই সইতে হবে। ওদের নয়। কেন, ওদের নয় কেন ? সত্যি, ভগবানের কী অবিচার। রাশিয়া আর জার্মানী ধ্বংস হয়ে গেল, ইংলণ্ডের গায়ে আঁচড়টি লাগল না। যেটুকু লাগল সেটুকু ধর্তব্যই নয়। কী ভাগ্যবান ওরা। জিতে গেল শঠতার জোরে। কমিউনিস্ট রাশিয়া, তার সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটেনের আঁতাত। অবিকল প্রথম মহাযুদ্ধের মতো। যেন বিপ্লবটা মায়া। দেখে শুনে গা জ্বালা করে। বাবলীটা জিতে গেল।" জুলির ক্ষোভ।

"ওসব হলো উচ্চ রাজনীতি। কার সাধ্য বোঝে! সবাই তো ধরে নিয়েছিল চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। জার্মানীকে লড়তে দেবেন রাশিয়ার সঙ্গে। রাশিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে। ব্রিটেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। কিন্তু চার্চিল হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নতুন শত্রু হিটলারকে টিট করতে পুরনো শত্রু স্টালিনের সঙ্গে হাত মেলালেন। মান অপমান তুচ্ছ করে ছুটে গেলেন মস্কোতে, খোসামোদ করলেন, 'মার্শাল স্টালিন!' 'মার্শাল স্টালিন!' যেন কতকালের ইয়ার। খানাপিনার বহর কত! চার্চিলের পেট টাইটম্বুর। একটা আস্ত শুয়োর ছানাকে রোস্ট করে এনে চার্চিলের সামনে রাখা হয়। পেটে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। খেলে গোটা খেতে হতো। কেটে নিলে চলত না। চার্চিল মাফ চান। তখন স্টালিন সেটাকে নিজের পাতে টেনে নিয়ে অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করেন। চার্চিল তো হাঁ! ওদিকে হিটলার হলেন পরম নিরামিষাশী। সসেজটুকুও মুখে তুলবেন না। যেটা শশার মতো সব জার্মান কামড়ে কামড়ে খায়।" সৌম্য নিজে নিরামিষভোজী।

"ভগবানের কী অবিচার! নিরামিষ খায় যে হাতী তারই হয় হার। আমিষ খায় যে সিংহ তারই হয় জিৎ। তুমি ভাবছ গান্ধী জিতবেন। সরকার হারবে। দুরাশা! সেটা তোমাদের দুরাশা!" জুলি সহানুভূতির স্বরে বলে।

"গান্ধী জিতবেন কেন বলছ ? সত্যাগ্রহ জিতবে। সত্য আর অহিংসা মিলে যে অস্ত্র তার নাম সত্যাগ্রহ। এ অস্ত্র পরাজয় জানে না ও মানে না। তবে এর জয় যুদ্ধক্ষেত্রে জয় নয়, যা সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর জয় প্রতিপক্ষের হৃদয়কন্দরে। প্রতিপক্ষ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাত মেলাও।

আর ঝগড়া নয়। এখন থেকে সদ্ভাব। গান্ধী আরউইন চুক্তি। তেমনি একটা চুক্তি হতে পারত লিনলিথগোর সঙ্গে। হলো না। হতে পারে ওয়েভেলের সঙ্গে। হচ্ছে না। হতে পারে তাঁর পরে যিনি আসবেন তাঁর সঙ্গে। এখন থেকে আশা ছাড়বেন কেন? বাপু চিরকাল আশাবাদী।" সৌম্যও তাই।

"গান্ধী-বড়লাট চুক্তি ওই একবারই হয়েছিল। আর হয়নি, হবেও না। ওটা ব্রিটিশ পলিসি নয়। ওরা জিন্নাকেও গান্ধীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। জিন্না সেটা জানেন বলেই গোঁ ধরে বসে আছেন তাঁর পাকিস্তান চাই। তাতে গান্ধীর জয় নয়, পরাজয়। আমি তো আশাবাদের লেশমাত্র কারণ দেখছিনে। লড়তে আবার হবেই। আর সেটা অহিংসমতে নয়। কিন্তু আমি আর লড়তে চাইনে। বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে পারলেই ধন্য হব।" জুলি আন্তরিকতার সঙ্গে বলে।

"তোমাকে আমি আর লড়তে বলব না। কিন্তু আমি লড়তে চাইলে তুমি যেন বাধা না দাও।" সৌম্যর আকুল মিনতি।

"বাধা দেওয়া দূরে থাক আমি তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব। যদি না খোকাখুকুরা বাধা দেয়।" জুলি স্মিত হেসে বলে।

"তার মানে কি জুটি?" সৌম্য কৌতুক করে।

"জুটি না হলে ভাইবোনের জুটি হয় না। সেটাই তো কাম্য। তবে কে বলতে পারে কী হবে না হবে?" জুলি গম্ভীর হয়ে যায়।

"আমি চাইনে যে আমার ছেলেমেয়েরা ব্রিটিশ প্রজা হয়। তোমারও চাওয়া উচিত নয়। সবুর করতে হবে।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"সবুর করতে করতে মা হবার বয়স পার হয়ে যাবে। যারা জন্মাতে চায় তারা জন্মাতে পারবে না। এ কী রকম অহিংসা! আমি তো মনে করি ব্রহ্মচর্যও একপ্রকার হিংসা।" জুলি বেপরোয়া ভাবে বলে।

সৌম্য চমকে ওঠে। "কই, একথা তো কোনদিন শুনিনি। তোমার মুখেই প্রথম শুনেছি। কোথায় পড়েছ? কে লিখেছে?" সৌম্য জানতে চায়।

"কোথাও পড়িনি। কেউ লেখেনি। এটা আমার মৌলিক চিন্তার ফল। আবার বলছি, ব্রহ্মচর্যও একপ্রকার হিংসা। যারা জন্মাতে চায়, জন্মাতে পারত, তাদের প্রতি হিংসা।" জুলিও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"যাদের অস্তিত্ব নেই তারা জন্মাতে চাইবে কী করে? ওটা তোমার সন্তান-কামনার কল্পরূপ।" সৌম্য হেসে উড়িয়ে দেয়।

"তুমি কি বলতে চাও যে জন্মের আগে তোমার অস্তিত্ব ছিল না? আমার অস্তিত্ব ছিল না? বলতে পারো সাকার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু নিরাকার অস্তিত্ব? যেমন পরমাত্মার।" জুলি চেপে ধরে।

সৌম্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আত্মা থাকলে তার অস্তিত্বও থাকে। সাকার ভাবেই হোক আর নিরাকার ভাবেই হোক।

''আত্মার অস্তিত্ব যদি থাকে তবে নিরাকার আত্মা সাকার হতে চাইবে, তোমার আমার কল্যাণে সাকার হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমি তো স্পষ্ট অনুভব করি যে অজাত শিশুরা জন্মানোর অপেক্ষায় আছে। কী করবে, বেচারিরা অসহায়! একটি মা থাকাই যথেষ্ট নয়, একটি বাপও থাকা চাই। বাপ না থাকলে মা-ও অসহায়। পৃথিবীতে কত রকম দুঃখ আছে। এটাও এক রকম দুঃখ।'' জুলি করুণ-কণ্ঠে বলে।

"তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, জুলি। তোমাকে যারা পাগলী বলে তারাই পাগল। তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারা কঠিন। তোমার মতো বুদ্ধিমতী নারী ওই একজনই ছিলেন। সাবিত্রী। যমকেও তর্কে হারিয়ে দিলেন। তুমি কি পূর্ব জন্মে সাবিত্রী ছিলে?" সৌম্য সবিস্ময়ে ও সকৌতুকে সুধায়।

"সব মেয়েই সাবিত্রী। কেউ কম, কেউ বেশী। সবাই তো আর শতপুত্র চায় না। কারো কারো একটিই যথেষ্ট।" জুলি উত্তর দেয়।

সৌম্য হেসে বলে, "হিসেব করে দেখছি ক'বার যমজ, ক'বার ত্রয়ী, ক'বার চতুষ্টয় জন্মালে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে শতপুত্র হয়। সাবিত্রীদের শুধু দীর্ঘজীবী নয়, দীর্ঘযৌবনা হতে হবে।"

"পোড়া কপাল! মেয়েরা কি কুকুর বেড়াল যে একসঙ্গে এতগুলির জন্ম দেবে? পয়োধর তো মোটে দুটি।" জুলিও হাসে।

বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা চাঁদপুরে পৌছে যায়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। নদীর জলে লক্ষ তারা।

বাকীটুকু রেলপথে আবার। ট্রেনে ওঠার আগে দু'জনে মিলে ভোজনাগারে নৈশ আহার সেরে নিতে যায়।

"টেলিগ্রাম ওঁরা পেয়েছেন কি না কে জানে! তোমার জন্যে তৈরি

থাকবেন, হয়তো আমার জন্যে নয়। কেন ওঁদের বিব্রত করা? তার চেয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া ভালো। কী বলো, সৌম্য?" জুলিই অর্ডার দেয়।

"এমনিতে পৌছতে দেরি হবে। সময়ে আহার বিধেয়। কিন্তু বেশী নয়। ওঁদের ওখানে না খেলে ওঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন।" সৌম্য অনুমান করে।

ট্রেনে ওঠার সময় চেকার বলেন, "আপনার তো সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট। আপনি থার্ড ক্লাসে কেন?"

"পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তেমনি, পড়তে যাচ্ছি গান্ধীবাদীর হাতে, থার্ড ক্লাসে যেতে হবে সাথে। তবে এতে যদি কোনো থার্ড ক্লাস যাত্রীর জায়গায় টান পড়ে তবে আমাকে স্বস্থানে যেতে হবে।" এই বলে জুলি আসন ছেড়ে দাঁড়ায়।

"না, না, আপনি বসুন। এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি, ম্যাডাম। এঁকে তো আমরা বহুবার দেখেছি। ইনি কোথায় এতদিন ছিলেন! বেশ কয়েক বছর দেখিনি মনে হয়।" চেকার জিজ্ঞাসু হন।

"দেখবেন কী করে?" সৌম্য উত্তর দেয়। "গান্ধীজী থাকবেন জেলে আর আমরা থাকব বাইরে, এটা কি ভালো দেখায়? ইনিও জেলখানায় আটক ছিলেন।" সৌম্য জুলির দিকে থাকায়।

"আমার কী সৌভাগ্য!" চেকারের উক্তি প্রতি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়।

"অমন করলে আমি কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসেই পালাব।" জুলি শাসায়।

"না, না, আপনারা আরাম করে বসুন। আপনারা এঁদের আরো একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিন।" সহযাত্রীদের বলে চেকার নেমে যান।

গল্প করতে করতে সময় কেটে যায়। লোকের যা স্বভাব, অচেনার সঙ্গেও চির চেনার মতো আলাপ জমায়।

স্টেশনে সৌম্যকে ও জুলিকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন স্বয়ং ক্যাপটেন মুস্তাফী। সঙ্গে ও কে? ও যে মিলি!

"মিলি? সত্যি তুই?" জুলি ওকে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তোলে। "কই, বেবী কই? কী যেন ওর নাম?"

"রণ। যুদ্ধের সময় জন্ম। ইংরেজদের মুখেও উচ্চারণ করা সহজ। রণকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। ঠিক সময়ে খায়, ঠিক সময়ে শোয়। আমি এসব বিষয়ে ইংরেজদের মতোই কড়া।" মিলি জুলিকে জড়িয়ে ধরে।

"তারপর, সৌম্য, কবে শুভকর্ম সম্পন্ন হবে? আর কোনখানে? আমরা সপরিবারে যোগ দেব।" মুস্তাফী বলেন।

"চাল নেই, চুলো নেই, বিয়ে! যেন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, লড়াই। গান্ধীবাদীরা একটা করে, আরেকটা করে না। যতদিন না দেশ মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু জুলির মা অপেক্ষা করতে চান না। আমার বাপুও অনুমতি দিয়েছেন। এখন একটা আস্তানার জন্যেই আটকাচ্ছে।" সৌম্য জানায়।

"আচ্ছা, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।" তিনি আশ্বাস দেন।

"না, সুকুমার আসেনি। পরে আসবে। আমি প্লেন ধরে পালিয়ে এসেছি।" মিলি বলে জুলির জিজ্ঞাসার উত্তরে।

॥ পাঁচ ॥

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তার হিসাবনিকাশ করতে বসে মানস দেখছে বাংলাদেশ যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়নি তবু এখানে ত্রিশ লক্ষের মতো মানুষ মারা গেছে। এত মানুষ ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা আমেরিকায় মারা যায়নি। এমন কী, ভারতীয় সৈনিকদের মৃত্যুসংখ্যাও এত বেশী নয়। আর সবাই মারা গেছে যুদ্ধবিগ্রহে, বাঙালীরা মারা গেছে দুর্ভিক্ষে। ওদের তবু সান্ত্বনা আছে, ওরা ফাসিস্ট অসুরদের পরাস্ত বা নিপাত করেছে। বিশ্বকে করেছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার। ওদের প্রাণদান সার্থক। কিন্তু এদের কী সান্ত্বনা!

এই ত্রিশ লাখ লোক তো দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেমে প্রাণ দিতে পারত। তা হলে অন্তত একটা প্রদেশ তো স্বাধীন হতে পারত। এদের প্রাণদান সার্থক হতো। এদের গৌরব গাথা গান করতেন গায়করা, গ্রথিত করতেন কবিরা। চিত্রকররা আঁকতেন এদের বীরত্বের ছবি। ভাস্কররা গড়তেন এদের বীরোচিত মূর্তি। এদের নিয়ে লেখা হতো নাটক ও যাত্রা। কিন্তু এদের মৃত্যুর জন্যে কোথায় সেই গৌরববোধ? দুঃখ, শোক, করুণা, বিবেকের দংশন ও অসহায়তার জন্যে লজ্জা, এছাড়া যদি আর কিছু থাকে সেটা সরকারের অব্যবস্থার উপরে অভিশাপ। এ সরকার খুনী সরকার। শয়তান সরকার। স্যাটানিক গভর্নমেন্ট। কথাটা হামিদের।

বছর দুই আগে কলকাতার রাস্তায় হামিদের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে ট্রাম থেকে নামেন। বলেন, "কোথায় যাচ্ছেন ? চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। অনেকদিন পরে দেখা। কিছু বলতে চাই।"

হ্যাঁ, তিনবছর বাদে দেখা। হামিদ ও তার সঙ্গীর পরণে খাকসারদের মতো খাকি পোশাক। হাতে বেলচা নেই। এই যা তফাৎ।

"এইমাত্র ইস্তফাপত্র পেশ করে আসছি।" হামিদ মানসকে চমকে দেন। "চীফ সেক্রেটারি নিতে চান না। আমি বলি নিতেই হবে। এ সরকারের হুকুম আমি তামিল করতে পারিনে।"

মানস জানতে উদ্‌গ্রীব। "ব্যাপার কী, হামিদ !"

"আমার মহকুমায় কেউ না খেয়ে মারা যায়নি। আমি যেমন করে পারি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি ও রাখতুম। সরকারের এতে এক পয়সা খরচ হয়নি ও হতো না। কিন্তু আমার ব্যবস্থাটা ওঁদের পছন্দ নয়। যাতে ব্যাপারীদের মুনাফা সেটাই ওঁদের পছন্দ। মানুষের প্রাণ ওঁদের কাছে তুচ্ছ। আমার উপরে রাগ আমি ব্যাপারীদের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছি। লোকে আমার উপর খুশি, সরকার অখুশি।" হামিদ একনিঃশ্বাসে বলে যান।

"তা বলে আপনি ইস্তফাপত্র দিতে গেলেন কেন ? ছুটি চাইতে পারতেন। কিংবা অন্য কোনো পদে বদলী।" মানস তাঁর মঙ্গলের জন্যেই বলে।

"না, জজ। তা হয় না। দুর্ভিক্ষের জন্যে সরকারী কর্মচারী মাত্রেই দায়ী। আপনিও। প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে। আপনারও উচিত ইস্তফাপত্র দেওয়া। ছুটি নিয়ে বিবেককে এড়ানো যায় না।" হামিদ চলতে চলতে বলেন।

ট্রামে করে ওঁরা তিনজনে মিলে মানসের বন্ধু স্বপনদার ওখানে যায়। দুই খাকসার চা খেয়ে এক আনা করে চায়ের পিরিচে রেখে দেন। ওঁরা বিনামূল্যে কিছু নেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও না।

মানস দুঃখ করে বলে, "আমার বন্ধু ব্যথা পাবেন।"

কিন্তু ওঁরা অবুঝ। ওঁদের নিয়ম ওদের মানতে হবে।

হামিদকে জেরা করে মানস জানতে পেরেছিল যে তাঁর বিরোধটা যাঁর সঙ্গে তিনি খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সুহরাবর্দী। কিন্তু দোষটা পুরোপুরি মন্ত্রীরও নয়। বর্ধনের কাছে মানস শুনেছিল যে মার্চ মাসের শেষের দিক কলকাতার বাজারে ধানচাল মজুত ছিল মাত্র দশদিনের উপযোগী। অগত্যা নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে

হয়, মফঃস্বল থেকে অবাধে ধান চাল কলকাতায় আসে। মফঃস্বলের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় ধানচালের চলাচলে বাধা না দিতে। বাধা দিতে গেলে শাস্তি। মফঃস্বলে টান পড়লে সরকার থেকে ধান চাল 'ডাম্প' করা হবে। ধান চালের বান বইয়ে দেওয়া হবে। ব্যাপারীদের ভয় দেখানো হয়, মজুত করেছ কি আঙুল পুড়িয়েছ। কে কার কথা শোনে! ওরা যে-কোনো দামে কেনে। যে-কোনো দামে বেচে। দাম আরো বাড়বে বলে ধরে রাখে, লুকিয়ে রাখে। গোপন মজুতদার কে নয়? যে নিজের বাড়ীর জন্যে ছ'মাসের খোরাক কিনে রাখে সেও দোষী। ওদিকে আরেকজন ছ'দিনের খেরোক কিনতে পাচ্ছে না। যাদের ক্রয়শক্তি কম, যারা একসঙ্গে বেশীদিনের খাদ্য কিনতে পারে না তাদের সংখ্যাই তো বেশী। সরকার তাদের জন্যে রেশন ব্যবস্থা করেননি। সেটাই হলো গোড়ায় গলদ।

বাংলাদেশের অবস্থা দেখে সাবধান হন যুক্তপ্রদেশের সরকার। গভর্ণর হ্যালেট তখন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা জেলে। তিনি একটা ইকনমিক বোর্ড গঠন করেন। তার সেক্রেটারি করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর রুদ্রকে, রুদ্র তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে বোর্ডের কাজ নিয়েই থাকেন। আর হ্যালেট স্বয়ং বোর্ডের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বোর্ড গম চালের গতিবিধির খুঁটিনাটি খবর রাখে। বাছা বাছা আই. সি. এস. অফিসারদের জেলার শাসনকার্য থেকে সরিয়ে এনে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা বুলডগের মতো পাহারা দেন। ব্যাপারীরা চোরাবাজারি বা মজুত করতে গেলে খ্যাঁক করে কামড় দেন। গম চাল সবাই সব সময় কিনতে পারে, মজুত করার দরকার হয় না! মানস যে সময় ছুটিতে ছিল সে সময় যুক্তপ্রদেশেও অন্নাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু সরকার সতর্ক থাকায় ব্যাপারীদের পৌষমাস আর সাধারণ ক্রেতাদের সর্বনাশ হয়নি।

ছুটি থেকে ফিরে হামিদের মুখে তার অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনে ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেখে মানসও বিবেকের জ্বালায় দগ্ধ হয়। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেই কি এর প্রতিকার হবে? একটি মানুষও কি প্রাণে বাঁচবে? হামিদকে একথা বোঝায়, নিবৃত্ত হতে বলে। ইস্তফাপত্র ফেরৎ নিতে পরামর্শ দেয়। হামিদ বলেন, "না, জজ। এরা নরঘাতক, এরা মহাপাপী। আমি কেন পাপের ভাগী হব?"

উচ্চতর পদগুলিতে তখন মুসলিম অফিসারদের প্রভূত চাহিদা। দু'দিন বাদে পদোন্নতি। হামিদকে ছাড়তে চায় কে? কিন্তু তিনি কেবল নিয়মনিষ্ঠ নন, নীতিনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি শয়তানী সরকারের সঙ্গে আপস করেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান আলীগড়ে। সেখানে তালা তৈরি করেন। বেকার সমস্যার সমাধান করতে তাঁর যেটুকু সাধ্য। হিংসা অহিংসা ব্যতীত আর সব বিষয়ে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাঁর মিল। মানসকে তিনি একজন গান্ধীবাদী মনে করেন বলেই তার সঙ্গে এমন সাযুজ্য। কিন্তু অহিংসায় তাঁর অবিশ্বাস।

শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, শত সহস্রমারী ভবেৎ ধন্বন্তরি। রেশন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতি হয়। তার জন্যে দরকার হয় প্রোকিয়োরমেণ্ট ব্যবস্থার। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও এ ত্রুটি রহিত হয়নি, হবেও না কলকাতার ক্ষুধা আর কলকাতার লোকের ক্রয়শক্তি অব্যাহত থাকতে। মানস চিন্তা করে কলকাতার বিকেন্দ্রীকরণের। আবার যদি মন্বন্তর হয় গ্রামের লোক এসে কলকাতা লুট করবে। বিপ্লব ডেকে আনবে কলকাতার অপরিমিত ভোগ।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যুর অভিশাপ মানসকে দু'বছর কাল বিষাদগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে যে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে হলে চাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে হাতে এসেছিল টাটা বিড়লার পরিকল্পনা। তার কিছুদিন পরে গান্ধীজীর পরিকল্পনা। সেও তার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে মেতে ওঠে। যেন কত বড়ো অর্থনীতিবিদ্! স্বরাজই যথেষ্ট নয়। চাই নিউ অর্ডার। নতুন শৃঙ্খলা। নতুন করে বাঁচা।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের শোচনীয় মৃত্যু বৃথা হবে না, যদি তাদের দেশের লোক নতুন করে বাঁচতে পারে। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে নীতিধর্ম। নিছক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে মানস আরো গভীরে যায়, তার থেকে আরো গভীরে। তার প্রতীতি দৃঢ় হয় যে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের খাতে যে ব্যয়টা হবে সেটা বন্ধ না হলে বা খুব কম না হলে সাধারণ মানুষের অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় চিকিৎসায় বাসস্থানে টান পড়বেই। রাষ্ট্রকে বন্দুক আর মাখন এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবেই। বন্দুক বেছে নিলে মাখনের অভাব হবেই। মাখন

দূরের কথা, রুটিও পর্যাপ্তভাবে মিলবে না। মানুষ আধপেটা খেয়ে তিলে তিলে মরবে।

কিন্তু বন্দুক বেছে না নিলে দেশরক্ষার বেলা সৈনিকরা কি খালি হাতে লড়বে? সৈনিকরা হেরে গেলে নাগরিকরা কি অসহযোগ ও গণসত্যাগ্রহের জোরে আত্মরক্ষা করতে পারবে? স্বাধীন ভারতকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। উত্তরগুলি যদি গতানুগতিক হয় তবে দরিদ্রতম দেশবাসীর ভাগ্যে আবার ক্রয়শক্তির অভাব ও তার থেকে অন্নাভাব আছে।

মানস গান্ধীবাদীদের সঙ্গে একমত হয় যে ভারতের গ্রামগুলিকে অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করতে হবে। যাতে তাদের ওসব কিনতে না হয়। আলো হাওয়া জল তো কেউ কেনে না। তেমনি, মোটা চাল আর মোটা কাপড়ও কেউ কিনবে না। নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেরাই উৎপাদন করবে ও নিজের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত হলেই বিক্রী করবে। ফাঁপা টাকার লোভে বিক্রী করলে পরে পশতাতে হবে। মন্বন্তর থেকে যদি লোকে এইটুকু শিখে না থাকে তবে লোকশিক্ষার জন্যে আবার মন্বন্তর অবতীর্ণ হবে। যুদ্ধও তো সেইরকম এক লোকশিক্ষা। গত দুই মহাযুদ্ধ থেকে দুনিয়ার লোক যদি নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকতা শিখে না থাকে তবে তাদের শিক্ষার জন্যে যুদ্ধও আবার অবতীর্ণ হবে। ভারতের লোক দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ দেখেনি। না দেখলে শিখবে কী করে?

তিনবছর আগেকার যুদ্ধবিরোধিতা ছিল ত্বক্‌গভীর। কংগ্রেসনেতারা যদি বড়লাটের পরিষদে যেতেন ও যুদ্ধ চালাবার ভার নিতেন যুদ্ধবিরোধিতার রূপান্তরিত হতো যুদ্ধোন্মাদনায়। সেটা জাপানের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওদিক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন তা হলে যুদ্ধোন্মাদনার মোড় ঘুরে গিয়ে হতো ব্রিটিশবিরোধী। কোথায় অহিংসা আর কোথায় তার প্রেস্টিজ? জনমানসে তার শিকড় কোথায়?

জনগণকে যদি অসামরিক প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত না রাখা হয়, যুদ্ধের দিন তাদের ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্র না জোটে তা হলে তারা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করবে, না স্বদেশী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করবে? আগস্ট অভ্যুত্থান ইংরেজদের হটাতে ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতের জন্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার না হয়ে কংগ্রেস সরকার যদি যুদ্ধে নামে

আর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে অভুক্ত রেখে পরলোকে পাঠায় তা হলে কেরেনস্কি সরকারের মতো সে সরকারেরও পতন হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে যদি বোঝায় অক্ষমতারও হস্তান্তর তা হলে দেশের লোক যেমন ইংরেজকে ক্ষমা করছে না তেমনি কংগ্রেসকেও ক্ষমা করবে না।

তবে দোষটা পুরোপুরি ইংরেজদের নয়। কলকাতার নাগরিকদেরও। তাদের ক্রয়শক্তি দিয়ে তারা গ্রামবাসীদের মুখের গ্রাস কিনে নিয়েছে। বোকার মতো ওরা কাঁচের বদলে কাঞ্চন বেচে দিয়েছে। টাকা নিয়ে মানুষ করবে কী, সে টাকা দিয়ে যদি ন্যায্য দামে খাবার কিনতে না পাওয়া যায়। যদি খাবার কিনতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়? শহর ও গ্রামের মধ্যে এটা স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়, এটা শোষক শোষিত সম্পর্ক। এর জন্যে ইংরেজকে দায়ী করা আত্মপ্রবঞ্চনা। যদি স্বাধীনতার পরেও শোষক শোষিতের সম্পর্ক থাকে তা হলে শোষিতরা একদিন দলবদ্ধ হয়ে শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব বাধাবেই। সেটা অহিংসার থেকে হিংসার মোড় নিতে পারে।

ইংরেজরা তো একদিন না একদিন যাবেই, তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কলকাতার যদি বিকেন্দ্রীকরণ না হয় তবে বিপত্তি অনিবার্য। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ত যদি মাথায় ওঠে তবে মরণ অবশ্যম্ভাবী। তেমনি, সারা বাংলাদেশের বিভব যদি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় তবে গ্রামগুলো মরবে, গ্রামবাসী জনগণ মরার আগে মারবে। সমস্যাটা যুদ্ধকালেই সঙ্গীন হয়, শান্তিকালে নয়। তাই শান্তিকালে সবাই নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুময়। সময়ে সাবধান হলে এই মন্বন্তর নিশ্চয়ই এড়ানো যেত। যে পরিকল্পনা এটা এড়াতে শেখায় সেই পরিকল্পনাই শ্রেয়।

মন্বন্তরের সময় দেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতিগতি দেখে মানসের মোহভঙ্গ হয়েছিল। বিদেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতোই তাঁরা মুনাফা উপাসক। সৎ অসৎ যে কোনো উপায়ে তাঁরা মুনাফা লুটবেনই। অমনি করে কাপিটাল বাড়াবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তরিত হয় তবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হবে দেশীয় ধনপতিদের হাতে হস্তান্তরিত। গান্ধীজী বলছেন বটে ধনপতিদের স্বেচ্ছায় ট্রাস্টী হবার কথা, কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় না হন তবে তাঁর উপর জোর করে ট্রাস্টীশিপ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একপ্রকার না একপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। নইলে সোশিয়াল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না। কংগ্রেসকে বুর্জোয়া অপবাদ বহন করতেই

হবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের জায়গা নেবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। মানস এর পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। পক্ষে নয় এইজন্যেই যে এতে ধনসম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত হবে না, গরিবের পেট ভরবে না। বিপক্ষে নয় এইজন্যেই যে সন্থ স্বাধীন দেশের জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্র প্রবর্তন, তা না করে একলম্ফে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হতে গেলে ডিকটেটরদের কবলে পড়তে হবে। তারা সিভিলও হতে পারে, মিলিটারিও হতে পারে।

স্বাধীনতার পর যা হবার হবে, আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। দুই শতকের বিদেশী শাসন তো অপসৃত হোক। বিদেশী সৈন্যদেরও যেতে হবে, নইলে বিদেশী শাসন প্রকারান্তরে থেকেই যায়। গান্ধীজীর প্রথম শর্তই হলো বিদেশী সৈন্যদের বিদায় নিতেই হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত বিদেশীদের সৃষ্ট দেশীয় সৈন্যদলকেও ভেঙে দিতে হবে। এ কাজটা কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্যায়ে পড়ে না। যাদের হস্তান্তর করা হবে তাদের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এটা যেমন সিভিল সার্ভিসের বেলা তেমনি আর্মি নেভী এয়ার ফোর্সেরও বেলা। ব্রিটেন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করে তা হলে যারা সিংহাসন অধিকার করবে তারা বিদেশীদের সৃষ্ট সিভিল সার্ভিস তথা আর্মি নেভী এয়ার ফোর্স বিলোপ করতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে বোঝায় এক মালিকের হাত থেকে অপর এক মালিকের হাতে তুলে লওয়া। আর ক্ষমতার হস্তান্তর না করে সিংহাসন ত্যাগ করা বলতে বোঝায় ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত সামরিক ও অসামরিক যাবতীয় কর্মচারীর চাকরি খতম। তাদের মধ্যে যারা বিদেশী তারা বিদেশে গিয়ে ক্ষতিপূরণ ও পেনসন দাবী করবে। যারা ভারতীয় হলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তারাও ব্রিটেনে গিয়ে ক্ষতিপূরণ ও পেনসন দাবী করতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তর হলে তাঁদের চাকরি খতম হবে না। পূর্ব শর্ত সংরক্ষিত হলে চাকরির জের চলবে।

কলকাতা থেকে সিভিলিয়ান বন্ধু প্রমোদকুমার পুরকায়স্থ তাঁর বিভাগীয় কাজে মানসের স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা গেল যে ইংরেজ অফিসাররা সদলবলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথাই ভাবছেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের দিতে হবে ক্ষতিপূরণ ও আনুপাতিক পেনসন। পেনসনের হার গণনা করা কঠিন নয়, সেটা একটা আইনে গণনা করে রাখা হয়েছে। সেটা এতদিন ইংরেজদের বেলাই খাটত, এবার ভারতীয়দের বেলাও খাটবে। মানস চাইলে যখন খুশি আনুপাতিক পেনসন নিয়ে সরে পড়তে পারবে। কিন্তু

ইংরেজ সরকার যদি ক্ষমতার হস্তান্তর না করে ভারত ত্যাগ করে তবে মানসকেও বিলেতে গিয়ে আনুপাতিক পেনসন আদায় করতে হবে। আর যদি ক্ষমতার হস্তান্তর করে যায় তবে স্বদেশে থেকেই নতুন সরকারের কাছ থেকে আনুপাতিক পেনসন পাবে।

মানস বলে, "খাসা খবর। কিন্তু ক্ষতিপূরণের কী হবে?"

পুরকায়স্থ বলেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ অফিসাররা যখন ঈজিপ্ট থেকে বিদায় হন তখন যে হারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন সেই হারে ক্ষতিপূরণ চাইবেন কি না তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন। ইনফ্লেশনের দরুন বর্ধিত হারে চাইতে পারেন। কিন্তু লাগে টাকা দেবে কোন্ সেন? ব্রিটিশ সরকার না ভারত সরকার? চুক্তি অনুসারে দিতে বাধ্য ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সেই বাধ্যতাটাকেও ব্রিটিশ সরকার হস্তান্তরিত করতে পারেন, যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ হস্তান্তরের প্রত্যাশায় ইংরেজরা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে আর ঝগড়াঝাটি করতে চান না। তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরে গেলে আজকাল নতুন চাকরি পাওয়া যায়। যুদ্ধের পর অনেক পদ খালি আছে। দেরি করলে সেসব পদ ভর্তি হয়ে যাবে। তাড়াটা ইংরেজ অফিসারদেরই। ওঁরা হৃদয়ঙ্গম করছেন যে ভারতে ওঁদের রাজত্ব গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভেদনীতির সাহায্যেও না। মুসলমানরাও অধীর। হিন্দুদের তো কথাই নেই।"

পুরকায়স্থ এর পরে যা বলেন তা শুনে মানস তো হাঁ। বাংলাদেশ নাকি দু'ভাগ হবে। কলকাতা, চব্বিশপরগণা আর বর্ধমান বিভাগ মিশে যাবে বিহারের সঙ্গে। বাদবাকী সামিল হবে পাকিস্তানের।

'দূর! বাজে কথা! এটাও কি ইংরেজদের মুখে শোনা?" মানস সুধায়।

"না, এটা ওদের মুখে নয়। একজন কংগ্রেস নেতার মুখে। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে একটা আপসের সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন। ইংরেজ কখনো কংগ্রেসের হাতে সারা ভারত সমর্পণ করবে না। মুসলিম লীগকেও তো কিছু দেবে। কিন্তু সারা বাংলা, সারা পাঞ্জাব, সারা আসাম দিলে কংগ্রেস বাকীটা নেবে না। আবার গণ আন্দোলন করবে। আবার জেলে যাবে। ইংরেজ অফিসারদের ভারতে আটকে রাখবে। ওঁরা যদি থাকতে না চান তো আপস করবেন। এক হাতে কংগ্রেসের

সঙ্গে, আরেক হাতে লীগের সঙ্গে। তার মানেই হলো পার্টিশন। সব দিক রক্ষা করতে গেলে বাংলাদেশে পার্টিশন চাই। যেমন হয়েছিল আমাদের ছেলেবেলায়। চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই বিন্দুতে এসেছে। যাকে বলে পূর্ণ বৃত্ত। তবে সেবার পূর্ববঙ্গ ভারতেই ছিল। এবার যাবে পাকিস্তানে। ফলে বাকী দেশটার নাম হবে হিন্দুস্তান।" পুরকায়স্থ যতদূর জানেন।

"না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না।" মানস চেঁচিয়ে ওঠে।

তা শুনে যুথিকা ছুটে আসে। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

মানসের উত্তর শুনে সে হেসে কুটি কুটি। "কালনেমির লঙ্কাভাগ। কারা এঁরা? কে এঁদের পোঁছে? গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। বাংলাদেশ কখনো ভাগ হতে পারে? অসম্ভব! অবাস্তব! গাঁজা!"

মানস উত্তেজিত হয়ে বলে, "শুধু তাই নয়, বিহারের সঙ্গে মার্জার!"

পুরকায়স্থ ওদের ঠাণ্ডা করে বলেন, "বিহারে যতরকম খনিজ আছে আর কোথাও তত নেই। সেসব খুঁড়ে বার করলে আরো চার পাঁচটা জামশেদপুর গড়ে উঠবে। মার্জার হলে বাঙালীরই লাভ। পূর্ববঙ্গে আছে কী? চা, পাট, মাছ। ওর থেকে আর কতটুকু লাভ হবে?"

মানস মেনে নিতে পারে না। "পূর্ববঙ্গে আছে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা, মহানন্দা, গোরাই, মধুমতী, ইছামতী। পূর্ববঙ্গে আছে বাংলাদেশের প্রাণ। বাংলাদেশের হার্টল্যাণ্ড। 'কলকাতা', 'কলকাতা' করে তোমরা পাগল। কলকাতার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমরা পূর্ববঙ্গ বিকিয়ে দেবে। কলকাতায় আছে কী? আফিস, আদালত, সওদাগরী কোম্পানীর হাউস। সবই তো ইংরেজের কীর্তি। তোমাদের গর্ব করবার মতো কী আছে? ওটা একটা ব্যাড বার্গেন। ওতে রাজী হওয়া মানে মুসলিম লীগের কাছে যুদ্ধে হার মানা। ওরা যেন যুদ্ধে জিতে কংগ্রেসওয়ালাদের উপর পার্টিশন চাপিয়ে দিচ্ছে। কংগ্রেস কি হেরে গেছে? লীগ কি জিতে গেছে? হোক না গৃহযুদ্ধ। দেখা যাক না কে হারে কে জেতে। জিতলে সমস্তটাই কংগ্রেস পাবে। সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। হারলে সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। আর নয়তো দেশ ও প্রদেশ ভাগ হয়ে যাবে তলোয়ারের ধারে।

যুথিকা উৎসাহ দিয়ে বলে, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। এটা কিন্তু কৌরব পক্ষের কথা নয়, পাণ্ডব পক্ষের কথা। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ল না তারা কোন্ সুবাদে দেশের এক ভাগ চায়?"

পুরকায়স্থ হাসেন। "শুনেছিলুম আপনারা দু'জনে অহিংসাবাদী, গান্ধীশিষ্য। কিন্তু আপনাদের জঙ্গী চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঢাল তরোয়াল পেলে আপনারাও লড়াইয়ে নেমে পড়বেন, ইংরেজকে তাড়াতে নয়, মুসলমানকে হারাতে।"

"ওমা, মুসলমানকে হারাতে কে বলেছে?" যূথিকা অনুযোগ করে। "আমরা মুসলমানদের পর ভাবিনে, ওরাও আমাদের আপন। কথা হচ্ছিল পাকিস্তানপন্থীদের নিয়ে। যারা পাকিস্থানপন্থী নয় তাদের নিয়ে নয়।"

"আজকের পরিস্থিতিতে দুই অভিন্ন হয়ে উঠছে, মিসেস মল্লিক। অশিক্ষিতদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু শিক্ষিতরা প্রায় সকলেই পাকিস্থানপন্থী। যাঁরা নন তাঁরা ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি আফিসেই এক একটি পাকিস্থান ব্লক। এ এক অদ্ভুত মেণ্টালিটি। এঁদের সঙ্গে যুক্তি বৃথা, তর্ক বৃথা। এঁদের ইনস্টিংট এঁদের বলছে যে ইংরেজ আর বেশীদিন থাকবে না, তখন কংগ্রেসই রাজা হবে। দিল্লীতে কংগ্রেস রাজা হলে বাংলার গভর্নরও হবেন কংগ্রেসের আজ্ঞাবহ। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরাও তাঁর বশংবদ হবেন। সুযোগ সুবিধা হিন্দুরাই বেশী পাবে। কারণ কংগ্রেস কার্যত হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান। দু'চারজন মুসলমান আছেন বলে কি কংগ্রেস অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান? তার কাছে অপক্ষপাত প্রত্যাশা করা যায় না। তা ছাড়া মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই যে দরকার। ওরা বহুকাল থেকে পশ্চাৎপদ। কী করে এগোবে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের পেছনেই থাকে? চাকরির প্রতিযোগিতায় হিন্দুরাই জিতবে। প্রমোশন হিন্দুরাই পাবে। যে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু সে প্রদেশেও চাকরিবাকরিতে তারা হবে সংখ্যালঘু। ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুর পাদোন্নতি হবে, মুসলমানের তাতে কী? পাকিস্থান বানিয়ে দাও, দেখবে মুসলমানেরও পদোন্নতি হবে। এই যাদের মেণ্টালিটি তাদের সঙ্গে মারামারি করে কী হবে? ভাগাভাগি করাই শ্রেয়। একভাবে না একভাবে করতেই হবে ভাগাভাগি। দেশ ভাগ না করলে ক্ষমতা ভাগ। ক্ষমতা ভাগ না করলে দেশ ভাগ। দেশ ভাগ করলে প্রদেশ ভাগ। আমি তো রাজী হব না পাকিস্থানে চাকরি করতে। মল্লিকের কথা আলাদা। উনি তো চাকরিই করবেন না।"

"না, আমি চাকরিই করব না। আমার জীবনে অন্য কাজ আছে। কিন্তু আমাকে অবাক করছে এই ভাগাভাগির জল্পনা কল্পনা। কেন, মিলে মিশে

কাজ করতে পারা যাবে না কেন ? কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল কেন সম্ভব হবে না ? দিল্লীতে সম্ভব হলে কলকাতায়ও হবে। কলকাতায় হলে দিল্লীতেও হবে। গভর্নর হবেন নিরপেক্ষ সুযোগ্য ব্যক্তি। কোনো একটি দলের আজ্ঞাবহ নন। তিনি একজন পার্শী বা খ্রীস্টানও হতে পারেন। আমাদের আদর্শ হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শীর সমন্বয়। মহামানবের সাগরতীরে। ভারত মহাসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না ভারতবর্ষকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। বঙ্গোপসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না বাংলাদেশকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। মুসলিম লীগের পার্টিশন প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারিনে। কিন্তু মুসলিম অফিসার ক্লাস যদি একবাক্যে পাকিস্থান দাবী করেন তা হলে তো আমি বন্দুক নিয়ে তাঁদের সঙ্গে লড়তে পারব না। হিন্দু অফিসার ক্লাস যদি রণবিমুখ হন তা হলে তো আফিসে আফিসে গৃহযুদ্ধের কথাই ওঠে না। তার আগে আমি চাকরিই ছাড়ব।" এই বলে মানস দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

যূথিকা রাগ করে বলে, "তুমি ডিফিটিস্ট। মুসলিম অফিসার ক্লাস সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় নয়। দেশভাগ চাকুরেদের স্বার্থ হতে পারে. চাষীদের স্বার্থ নয়, মজুরদের স্বার্থ নয়। সকলের বৃহত্তর স্বার্থেই দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে।"

"দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে, এইপর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি একমত, দিদি। কিন্তু তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে, এতদূর যেতে আমি নারাজ। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখুন যুদ্ধের কী পরিণাম। কোথায় জার্মানীর ঐক্য! প্রোলিটারিয়ানরা গ্রাস করেছে আধখানা জার্মানী। ওদের হাত থেকে কেড়ে নিতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তবে হয়তো ওরাই কেড়ে নেবে বাকী আধখানা। মুসলমানদের অধিকাংশই প্রোলিটারিয়ান। ওরা যদি একধার থেকে কমিউনিস্ট বনে যায় ভারতের একভাগ তো জয় করে নেবেই, বাংলাদেশের বেশীর ভাগই ওদের দখলে যাবে। যুদ্ধ না করে সন্ধি করে মুসলিম লীগকে দিলে ক্ষতি কী ? আমি তো মনে করি মুসলিম লীগই লেসার ইভিল।" পুরকায়স্থ বলেন।

"একমত হতে পারছিনে।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "মুসলিম লীগ হচ্ছে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। আর কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্র না মানলেও সামাজিক ন্যায় মানে, সুতরাং একদিক থেকে প্রগতিশীল। সুতরাং লেসার ইভিল।"

"আপনি কি জানেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে? কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের পক্ষে। ওদের লক্ষ্য জমিদারি উচ্ছেদ, ফসলের তেভাগা ইত্যাদি। পাকিস্তানে সেসব সুগম হবে।" পুরকায়স্থ শুনেছেন।

"মুসলিম লীগ কারো বন্ধু নয়। কমিউনিস্টদেরও একদিন সায়েস্তা করবে। একবার ইসলাম বিপন্ন বলে শোর তুললেই মুসলিম চাষীরাই হিন্দু কমিউনিস্টদের কাস্তে নিয়ে কোপাবে আর মুসলিম মজুররাই হাতুড়ি দিয়ে পেটাবে। মুসলিম কমিউনিস্টরাও পার পাবে না, নাস্তিক বলে ফাঁসীকাঠে ঝুলবে। মুসলিম শাসনে নাস্তিকের ক্ষমা নেই। পৌত্তলিকের থাকলেও থাকতে পারে।" মানস বলে।

যূথিকা রাগ করে বলে, "ইভিল তো ইভিল, তার আবার লেসার কী? গ্রেটার কী? তার সঙ্গে সন্ধি কিসের? মানুষ তোমরা নও তো, মেষ! তোমাদের কেউ সম্মান করবে না।"

এই বলে রান্নাঘরে যায়। অতিথির জন্যে রাঁধতে। দুই বন্ধুতে অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে। সরকারী বদলী ও প্রমোশন।

"ইংরেজরা কেউ যুদ্ধের সময় হোমে যায়নি। অনেকেই সাত আট বছর হলো হোম থেকে নির্বাসিত। জানেন তো ওরা হোম বলতে অজ্ঞান। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোম আমার কেমন লাগল। হা হা! ইংলণ্ড কি আমার হোম? এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ওরা সবাই এখন ঘরমুখো। কিন্তু ছুটি দিচ্ছে কে? একসঙ্গে পাঁচশো কি ছ'শো অফিসারকে ছুটি দিলে শাসন চলবে ঠিকই, কিন্তু সেটা ব্রিটিশ শাসন হবে না। তা বলে সবাইকে জোর করে আটকে রাখাও যায় না। ছুটি নিয়ে বহু ইংরেজ যাচ্ছে। তাদের জায়গায় বহু পদ খালি হচ্ছে। এই তো বর্ধন প্রমোশন পেয়ে দিল্লী চলল। 'দিল্লী চলো' স্লোগানটা এখন আমাদের মুখে মুখে। আমি ভাবছি দিল্লীকা লাড্ডু পাইলেই খাইব। আপনি?" পুরকায়স্থ সুধান।

"না, ভাই। আমার দাঁত ভেঙে যাবে। পেটে সইবে না। আমি বাংলায় লিখি। যেখানে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক সেখানেই আমার স্থান। যেখানে বাংলাদেশের মাটি, জল, মানুষ সেখানেই আমার স্থিতি। 'দিল্লী চলো' নয়, 'পল্লী চলো' এই আমার স্লোগান। যাক, বর্ধনের জন্যে আমি আনন্দিত।" মানস যূথিকাকে খবরটা দেয়।

॥ ছয় ॥

অনেকদিন বাদে সৌম্যদার চিঠি। সে আশ্রমে ফিরে গিয়ে জীর্ণসংস্কার করছে, সেই সঙ্গে তৈরি করছে একটি কুটির। সেখানে জুলির সঙ্গে সংসার পাতবে। বাপু অনুমতি দিয়েছেন। তবে একটা শর্ত আছে, সেটা মুখে বলবে। ভাবনায় পড়েছে। আপাতত বিবাহ স্থির। স্বরাজের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। জুলির মা আর ওকে সামলাতে পারছেন না। তাঁরও তো বয়স হয়েছে।

"আপাতত আমরা মুস্তাফীদের অতিথি। জুলি মিলিকে ও তার বাচ্চাকে সঙ্গ দেয়। আমি বেশীর ভাগ সময় আশ্রমে ও ভাণ্ডারে কাটাই, মাঝে মাঝে পরিদর্শনে যাই। বিয়েটা কোনো একটা আশ্রমে হবে। সেবাগ্রামে তো যেতে পারছিনে, তার বদলে সোদপুরে যাবার কথা ভাবছি। এতে জুলির মায়ের ভার হালকা হবে। তা ছাড়া যে মেয়ের বিয়ে তারা ঘটা করে একবার দিয়েছেন সেই মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্তব্য নয়। যাকে একবার সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। জুলি এখন স্বাধীনা নারী। আমরা সিভিল ম্যারেজের আগে কোয়েকারদের প্রথা অনুসরণ করব। ওদের সোসাইটিতে একটা ঘর থাকে। সেই ঘরে গিয়ে ওরা বিবাহের বইতে নাম সই করে। আমরাও তাই করব। তবে আশ্রমের কর্মীদের মিষ্টিমুখ করাব। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু জুলির ইচ্ছায় রবীন্দ্রসঙ্গীত আর আমার ইচ্ছায় লালনগীতি হবে। তার উপর যদি আরেকটি গান যোগ করতে হয় তো বাপুর প্রিয় গান "লীভ কাইণ্ডলি লাইট"। ও গান আমাকেও বিচলিত করে। আমি মনে মনে জপ করি 'ওয়ান স্টেপ ইনাফ ফর মী।'

জুলির মা বলেছেন তিনি তাঁর বাড়ীতে একটা পার্টি দেবেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। আমি বলেছি বর সাজতে পারব না। আমি যা পরি তাই পরব। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা জওহর কোট। মাথায় গান্ধী টুপী। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি বা

কোলহাপুরী চপ্পল। কী বলো? খুব খারাপ দেখাবে? হংসো মধ্যে বকো যথা। ইঙ্গবঙ্গ ব্যারিস্টার ডাক্তার অধ্যাপকের সভায় ইতর জন। যাক, জীবনে একবার তো? জুলিকে খুশি করার জন্যে আমি রাজী হয়েছি।

এখন এক আজব সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা জানতুম না যে মিলি সুকুমারকে ফেলে তার ছেলেকে নিয়ে আগে ভাগে আসবে। মা বাবাকে দেখবার জন্যে আর তাঁদের নাতি তাঁদের দেখাবার জন্যে সে প্লেনে জায়গা পাওয়া মাত্রই চলে আসে। সুকুমার ছুটির অপেক্ষায় আর সেইসঙ্গে জাহাজের অপেক্ষায় লণ্ডনে থেকে যায়। মন্দ কী? অমন তো কত হয়। কিন্তু মিলি তো জুলিকে এখানে প্রত্যাশা করেনি। জুলির উপস্থিতি প্রথম দিকে ও আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই ওর ব্যবহারে একটা শীতলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটা জুলির বেলা। আমার বেলা নয়। আমার বেলা উষ্ণতা। আমি তোমার মতো মনস্তত্ত্ববিদ্ নই। নারীচিত্ত আমার কাছে রহস্যময়। আমার মনে হয় মিলির বিশ্বাস জুলি এখনো সুকুমারকে ভালেবাসে। আর জুলির বিশ্বাস মিলি এখনো আমাকে। এদের সম্পর্কটা অহেতুক ঈর্ষার। একদিন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, তার আগে সরে পড়াই শ্রেয়। আতিথ্যেরও একটা অলিখিত মেয়াদ আছে। কিন্তু আমাদের কুটির এখনো বাসযোগ্য হয়নি, হলেও আমরা বিয়ের আগে সেখানে থাকতে পারিনে। বিয়ে তো সেই অগ্রহায়ণে। জুলির মা ইঙ্গবঙ্গ হলেও পাঁজি মানেন।

এখানে আমায় বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের দরজা খোলা। কিন্তু এক বাড়ীতে দু'জনের জন্যে দুটো ঘর কোথায়? তা হলে আমাদের ঠাঁই ঠাঁই হতে হয়। তাতে জুলির বিষম আপত্তি। জুলিকে আমি কলকাতা ফিরে যেতে বলি। কিন্তু আমাকে সে একলা ফেলে যাবে না। এখন থেকেই সম্পত্তির মতো দখল নিচ্ছে। বিয়ে না হতেই এই। বিয়ের পরে আমাকে বোধহয় সিন্দুকে পুরবে ও সিন্দুক পাহারা দেবে। কিন্তু একদিন বাগ্‌দান করার পর আর পেছিয়ে যাওয়া চলে না। এগিয়েই যেতে হবে, যা থাক কপালে। বাপু আমাকে দিয়েছেন গঠনের কাজ। তিন বছর অবহেলা করেছি রাজনীতির ঝড়ঝাপটার খর্পরে পড়ে। জনগণের সেবা করা হয়নি। তাদের দুর্দশাও বেড়ে গেছে। জনসেবাও এক ঈর্ষাপরায়ণ নারী। রাজনীতি তার সপত্নী। তারপর জুলির মা দিয়েছেন জুলির ভার। তাকে রাজনীতির

মত্ততা থেকে সামলাতে হবে। রাজনীতিও ক্রমশ হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। একদল হাতিয়ার শানাচ্ছে ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। আরেক দল হাতিয়ার শানাচ্ছে হিন্দুকে ভিটেছাড়া করতে। একদলের লক্ষ্য স্বাধীনতা। আরেক দলের লক্ষ্য পাকিস্তান। এ রাজনীতি জুলির জন্যে নয়। আমার জন্যে তো নয়ই।

বিয়ের পর জুলিকে নিয়ে যেতে চাই তার শ্বশুরবাড়ী। সেখানে ওরা যদি ওকে বধূরূপে বরণ করে তা হলে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে বৌভাত হবে। সবাইকে বসিয়ে দেওয়া হবে পঙ্‌ক্তিভোজনে। হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ হরিজন ভেদ মানা হবে না। যারা মানে তারা বাদ পড়বে। তাদের কিছু চালকলা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে। জুলি রান্নার কাজে পটু নয়। তবু গোটা দু'তিন পদ রাঁধবে। যদি দেখি সরষের ভিতরেই ভূত, পরিবারের ভিতরেই আপত্তি, তা হলে বৌভাতের আয়োজন করব না, গ্রামের পাঠশালার জন্যে কিছু চাঁদা ধরে দিয়ে চলে আসব। পরে যদি কখনো আগ্রহ দেখি তখন যাব। তখন হবে বিলম্বিত বৌভাত। সমাজ সংস্কার তড়িৎগতিতে হবার নয়। মহাত্মা গান্ধীও এক্ষেত্রে অসহায়। তবু তিনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য। ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহ। অপরের বিবাহে হরিজনের পৌরোহিত্য। মহারাষ্ট্রের মতো রক্ষণশীলদের দুর্গে।

জুলির ও আমার আশা যূথিকা ও তুমি আমাদের শুভকর্মে যোগ দেবে। কিন্তু এই সামান্য কারণে ছুটি নিতে যেয়ো না। তারিখটা কবে পড়বে ঠিক হয়নি। সে সময় ছুটি থাকলে এসো। গ্রামের বাড়ীতে যদি যাই তা হলে ফেরবার সময় তোমাদের ওখানে ঘুরে আসতে পারি। তোমাদের অসুবিধে না হলে দু'একদিন থেকে যেতেও পারি। দীপক আর মণিকাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।"

যূথিকা চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, "যেমন মিলি তেমনি জুলি। বিপ্লববাদীই হোক, আর রাজবন্দীই হোক, মেয়েলি ঈর্ষা যাবে কোথায়! এ তো ভারী মজার কথা। সৌম্যদাকে নিয়ে ত্রিভুজ! জুলিকে ও বাড়ী থেকে সরাতেই হবে। আর কোথাও যদি জায়গা না থাকে আমাদের এখানে আছে। গভর্নমেন্ট কি আমাদের সন্দেহ করবে? তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো? বিয়ে তো এখানেও হতে পারে। এখানেও গান্ধীবাদীদের আশ্রম আছে।"

"কিন্তু সৌম্যদা যদি তার স্বস্থান ত্যাগ করে গঠনের কাজে আরো একবার অবহেলা হবে। গঠনের কাছ হচ্ছে সংগঠনেরও কাজ। অহিংসভাবে সংগঠনের। আবার যদি সংগ্রামে নামতে হয় তবে অহিংসাত্মক সংগঠনের প্রয়োজন হবে। মন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে কংগ্রেস গঠনের কাজে মন দেয়নি, মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পরেও আপসের ভাবনাই ভেবেছে, আর নয়তো সংগ্রমের ভাবনা। যখন সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়ল, গণ সত্যাগ্রহের ডাক এল, তখন দেখা গেল সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু নেই। যে যেমনভাবে পারে লড়েছে। সংহতভাবে একটা সৈন্যদল যেমনভাবে লড়ে তেমন ভাবে নয়। এটাকে মরাল ইকুইভালেণ্ট অভ্ ওয়ার বলা শক্ত। বাপু বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে এটার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। সৌম্যদাও বোঝে রেল লাইন ভেঙে, টেলিগ্রাফের তার কেটে যা হয় তা একপ্রকার বিদ্রোহ, তা অন্যপ্রকার যুদ্ধ নয়। লোকের মন এখন যুদ্ধের নৈতিক বিকল্পের দিকে নয়, আসল যুদ্ধের দিকে ঝুঁকছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মতো প্রেস্টিজ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিদ্রোহী জনতারও নেই। ওই যে শাহ্‌নওয়াজ, সায়গল আর ধিলন ওদের সম্মান এখন সর্বভারতীয় বাদ দিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও বেশি। একদল জাতীয়তাবাদী যদি ইংরেজদের ভারতছাড়া করবার জন্যে হাতিয়ারে শান দেয় তবে আশ্চর্য হবার কী আছে? কিন্তু অবাক হচ্ছি শুনে যে আরেকদল হাতিয়ারে শান দিচ্ছে হিন্দুদের ভিটেছাড়া করে পাকিস্তান হাসিল করতে।" মানস উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

"বেশ তো, পলাশী আর পাণিপথ দুটোই পর পর হয়ে যাক। দেখা যাক কে জেতে কে হারে।" যূথিকা পরিহাস করে।

"এসব হলো দারুণ সীরিয়াস ব্যাপার। ঠাট্টা তামাশার বিষয় নয়। কত মানুষ মরবে, কত মানুষ ঘরছাড়া হবে, কত মানুষ সম্বল সম্পত্তি হারাবে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এ তো শুধু রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ।" মানস প্রমাদ গণে।

"তোমার মতো স্বপ্নদ্রষ্টাদের কপালে স্বপ্নভঙ্গ আছে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই সারা হলে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে। সেটা হবে পাণিপথের কাছাকাছি কোনোখানে। যেখানে আফগানরা মারাঠাদের হারিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেস যদি হেরে যায় দিল্লী আগ্রা হারাবে। পাঞ্জাব সিন্ধু তো হারাবেই! বাংলাদেশেও একটা বলপরীক্ষা হবে। কোথায় কবে বলতে

পারব না। এইটুকু বলতে পারি যে ইংরেজদের যারা সশস্ত্র সংগ্রামে হারাবে তারা সশস্ত্র মুসলমানদের কাছে হার মানবে না। যুদ্ধ হলে তাতে দুই পক্ষেরই বহু মানুষ মরে, ঘরছাড়া হয়, বহু মানুষ সম্বল সম্পত্তি হারায়। ইহাই নিয়ম। দেশের লোক যদি অহিংসার চেয়ে হিংসা পছন্দ করে তো তার লজিকসম্মত পরিণামের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। দু'শো বছর পরাধীনতার পরেও মুসলমান প্রধানদের মানসিক পরিবর্তন হয়নি। আবার সেই মুসলিম রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান। একটা দিনও সবুর করবেন না। ইংরেজরা যাবার আগেই তাঁদের মসনদে বসিয়ে দেবেন। আর হিন্দুরাও যে মারাঠা রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান না তা নয়। এবার অন্য নামে। এইটুকু যা পরিবর্তন হয়েছে।"

মানস খেই হাতে নিয়ে বলে, "বিস্ফোরণ তো আমাদের জীবনে একবার ঘটেছিল। বাসা না পেয়ে আমরা তখন বোস দম্পতীর অতিথি। কী একটা তুচ্ছ কারণে খাবার টেবিলে মিসেস বোসের সঙ্গে তোমার বচসা বেধে যায়। মিসেস বোসের সঙ্গে মিটমাট হলো না। পরের দিন ওদের বাড়ী থেকে বিদায়। বিদায়কালেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তুচ্ছ কারণের পেছনে ছিল একটা গুপ্ত কারণ। মিসেস বোসের সন্দেহ বোস তোমাকে পূজো করেন। বোসের অতীতটি তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ও রকম ঘটনা জুলি মিলির বেলাও ঘটতে পারে। সৌম্যদার যাবার জায়গা আছে, সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। জুলির সঙ্গে একবাড়ীতে থাকতেই হবে এমন কী কথা আছে? ওটা বিলেতের বোর্ডিং হাউস নয়। জুলি কলকাতায় ওর মায়ের কাছে ফিরে যাক, বিয়ের নোটিস দিক, শাড়ী শাঁখা আংটি কিনুক। সৌম্যদা নিজের আশ্রমে গিয়ে কুটির নির্মাণ শেষ করুক। বিয়ের তারিখ জানতে পেলে আমরা ভেবে দেখব যোগ দিতে যাব কি না। কিন্তু বর্ধন যদি দিল্লী চলে গিয়ে থাকে ওর ওখানে ওঠা হবে না। উঠতে হবে স্বপনদার ওখানে, যদি বৌদি রাজী হন। তোমার সঙ্গে ওঁর এখনো দেখা হয়নি। তা ছাড়া আমরা গেলে দীপক আর মণিকেও তো নিয়ে যেতে হবে। অতিথিসেবার ভার বেড়ে যাবে। বিলেতফেরৎ অধ্যাপিকার উপর এত বেশী ভার চাপানো কি ঠিক হবে? উদিতার কথা আলাদা। ওর বিয়েতে আমার একটু হাত ছিল। সেটা ও ভোলেনি।"

যুথিকা সেই পুরাতন বিস্ফোরণের কথা ভাবছিল। তার খেয়াল হয়নি যে

ওর মূলে ছিল মেয়েলি ঈর্ষা। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, "আমারই বোঝা উচিত ছিল যে মিসেস বোসের পক্ষে ওটা স্বাভাবিক। বোসের পুরনো ডায়েরি উনি পড়েছিলেন। তাতে বহু বান্ধবীর উল্লেখ। না, বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। কেন ওরা ও বাড়ীতে এতদিন আছে? একসঙ্গে থাকার আনন্দ তো সারাজীবন ধরে পাবে। সৌম্যদাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখ যে বিয়ের আয়োজন করার জন্যে জুলির উচিত কলকাতায় এসে মায়ের কাছে থাকা। কিংবা আমাদের কাছে। এখানেও আশ্রম আছে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন। তা হলে আমাদের আর কোথাও গিয়ে আর কারো অতিথি হতে হবে না। তুমি হবে বরের বেস্ট ম্যান, আমি হব কনের ব্রাইডস্‌মেড। কী মজা! ওরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে মধুমাস কাটাবে। যাকে ইংরেজীতে বলে হানিমুন। মুন মানে এখানে চাঁদ নয়। মাস। মধুচন্দ্র হচ্ছে ভুল অনুবাদ।"

"বাঃ। কলকাতায় মায়ের ওখানে ওয়েডিং পার্টি। সেটা হবে না?" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"যা বলেছ। আমাদের বেলা সেটা হয়নি। পনেরো বছর কেটে গেছে। কী কঠিন প্রাণ!" যূথিকার চোখে জল আসে।

"ও প্রসঙ্গ থাক।" মানস ওটা ধামাচাপা দেয়। ওর শ্বশুর শাশুড়ী এখনো ভুলতে পারেননি যে তাঁরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রানী ভবানীর কী যেন হন। ওদিকে প্রচণ্ড সাহেব। খানাপিনা সাজপোশাক চালচলন বিলকুল সাহেবী।

যূথিকা তার বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে। একান্ত আদরের ধন। ছেলেবেলা থেকে মনে মনে স্থির করে রেখেছে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রার মতো সেও স্বয়ংবরা হবে, নিজের পতি নিজে নির্বাচন করবে। বাপ মা এতে রাজী হবেন কেন? তাঁরা মেয়ের বিয়ের জন্যে যথারীতি উদ্যোগী হন। মেয়ের ষোল বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় পাত্র অন্বেষণ। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন বাড়ীতে বসে না থেকে সে কলেজে পড়ুক। দিল্লীতে তাকে মিরান্দা হাউসে দেওয়া হয়। সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে সেও হয়ে ওঠে একজন ফেমিনিস্ট। আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো বিবাহে পতিনির্বাচনের অধিকারও নারীর সহজাত অধিকার। এর জন্যেও দরকার হলে লড়তে হবে। লড়াইটা নিজের

গুরুজনের সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়বে তারা কি জীবনসঙ্গী মনোনয়নের স্বাধীনতার জন্যে লড়বে না? জীবনটা কার? তাদের না তাদের মা বাপের? মেয়ে ভুল করবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু বাপ মাও কি ভুল করেন না? তাঁদের ভুলের জন্যে কত মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে।

ধনপতি রায়চৌধুরী কড়া মেজাজের লোক। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার মেজাজও চড়া। তাঁরা মেয়ের মতামতকে এক কড়াও দাম দেন না। তাঁদের চোখে মেয়ের সেই গৌরীদান কি রোহিণীদানের বয়স। আট কি নয় বছর। ও যেন কলেজের মেয়ে নয়, পাঠশালার মেয়ে। চাকরবাকরদের মতো সেও যোহুকুম। তাঁরা তাঁদের ফরমাস মতো পাত্রের অন্বেষণে ঘটক লাগান। তার পেছনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। ফরমাস মতো পাত্র হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কুলীন। বনেদী জমিদারবংশীয়, যদিও জমিদারি বলতে এখন গুঁড়ামাত্র আছে। বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান, নিদেনপক্ষে ইঞ্জিনীয়ার। সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, ইংরেজী বলবে সাহেবী টানে। পর্দার আড়ালে থাকলে বাঙালী বলে চিনতে পারা যাবে না। লাস্ট, বাট নট লীস্ট, কার্তিকের মতো রূপবান। এক এক করে অনেকগুলি পাত্রকে খারিজ করে শেষপর্যন্ত যাঁকে পছন্দ হয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের উঠতি ব্যারিস্টার, কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী আছে, নাটোর মহকুমায় পৈত্রিক ভদ্রাসন। কিন্তু চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। তাঁরও আছে পানদোষ, জুয়ার আসক্তি, মাঝে মাঝে তিনি অন্যত্র রাত কাটান। তাঁর বৌ তা সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ী ফিরে গেছেন। আর আসবেন না। ওঁরাও বড়লোক।

যূথিকা ঘৃণার সঙ্গে এ সম্বন্ধ খারিজ করে। এমন স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটানো যেন একটা দুরারোগ্য ব্যধি নিয়ে বেঁচে থাকা। মা রাগ করেন, বাবা বকেন। অভিমানী মেয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে। তখন ওঁরা বলেন, "আচ্ছা, তুই নিজেই কাকে বিয়ে করবি স্থির কর। কিন্তু মনে রাখতে হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন, বনেদী জমিদার বংশীয়, জমিদারি লাটে উঠলেও চলে, বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান বা আর কিছু, সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, উচ্চারণ সাহেবদের মতো, পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনে বাঙালী বলে চিনতে পারা যাবে না, সব শেষে কার্তিকের মতো রূপবান।" যূথিকা জবাব দেয়, "রাজকন্যারা রাজপুত্র খুঁজে বেড়ায় না। রাজপুত্ররাই রাজকন্যার খোঁজে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়। আমি তার জন্যে

অপেক্ষা করব।" বি. এ. পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে তাজমহল দেখতে গিয়ে মানসের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দ্বিপাক্ষিক। পালিয়ে গিয়ে বান্ধবীর বাড়ীতে গোপনে বিবাহ।

ধনপতিবাবুরা তখন সিমলায়। যুথিকা তার বরকে নিয়ে তাঁদের প্রণাম করতে যায়। শৈলবালা দেবী পা সরিয়ে নিয়ে বলেন, "আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শুদ্দুরটা আমার পা ছুঁয়ে দিল।" ধনপতিবাবু সাহেবী কেতায় হ্যাণ্ডশেক করে বলেন, "মিস্টার মালিক, ইউ মে রাইজ টু বি আ কমিশনার সাম ডে। অর আ হাইকোর্ট জজ পরহ্যাপস। আই উইশ ইউ লাক। বাট ইউ আর নো ম্যাচ ফর মাই হাই-বর্ন ডটার।" মানস তো হাঁ। তাকে প্রকারান্তরে বলা হলো লো-বর্ণ। ক্রোধে তার সর্বশরীর জ্বলে যায়। সে থর থর করে কাঁপে। তার পরে তোৎলাতে তোৎলাতে দেয় মুখের মতো জবাব। "আমি ইংরেজীতে কথা বলি ইংরেজের সঙ্গেই। বাঙালীর সঙ্গে নয়। আপনি যা বলেছেন তা ফিরিয়ে নিন।" তিনি ক্ষেপে গিয়ে বলেন, "আই কল আ স্পেড আ স্পেড। অ্যান আপস্টার্ট অ্যান আপস্টার্ট।"

যূথিকার মুখ তখন রক্ত রাঙা। শিবকে এই কথা বলেছিলেন দক্ষ। সে কি সতীর মতো দেহত্যাগ করবে? মানসের দিকে বিহ্বলভাবে তাকায়। মানস আপনাকে সামলে নিয়ে বলে, "আমরা তিনশো বছর ধরে বাদশাহী তালুক ভোগ করে এসেছি। মোগল সরকারকে এক পয়সা খাজনা দিইনি। ব্রিটিশ সরকারকেও না। বংশমর্যাদায় আমরা কারো চেয়ে খাটো নই। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি জাতে উঠতে চাই বা আপনার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে অর্ধেক রাজত্ব পেতে চাই তা হলে সেটা আপনার ভুল। আমাদের বংশে কেউ কখনো পণ যৌতুক নেয়নি। আমিও নেব না।"

ধনপতিবাবু বলেন, "বাট ইউ ক্যান নট বি আ' ব্রাহ্মিন। ইয়োর সন উইল বি আ চণ্ডাল।" তারপর যূথিকার দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে বলেন, "চুজ বিটুইন ইয়োর ফাদার অ্যাণ্ড ইয়োর সো-কলড হাজব্যাণ্ড।"

যূথিকাও তেমনি তেজী মেয়ে। বলে, "চুজ বিটুইন ইয়োর ডটার অ্যাণ্ড ইয়োর সো-কলড হাই কাস্ট।"

ওরা যেমন হাত ধরাধরি করে এসেছিল তেমনি হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। মা চেঁচিয়ে বলেন, "চলে যাবার আগে গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যা।"

যূথিকা এক এক করে সব খুলে দেয়, আংটি ছাড়া। সেটা মানসের দেওয়া। একটা দৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ীর চাকরবাকর 'হাঁ' 'হাঁ' করে ছুটে আসে। কোন পক্ষ নত হয় না। ধনপতিবাবুকে বিমর্ষ দেখায়। এতটা তিনি চাননি। কিন্তু তাঁরও তো মান আছে। তিনিও নত হন না। কিন্তু মানসকে ডেকে নিয়ে শাসান, "আমি কোর্টে গিয়ে মামলা করব যে আপনি আমার নাবালিকা কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছেন। সে বিয়ে বাতিল হবার যোগ্য। আমি তার গার্জেন। বাতিলের প্রার্থনা করছি।"

মানস আশ্চর্য হয়ে বলে, "সে কী। যূথিকা তো বিয়ের সময় ডিক্লেয়ার করেছে তার বয়স বিশ বছর।"

"সেটা চাপে পড়ে। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে মেয়েদের বয়স লেখা থাকে না। আমার মেয়ে আমারই মতো জিনিয়াস। ও তেরো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে। এখন ওর বয়স সতেরো। আমি হোরোস্কোপ দেখাতে পারি।" ধনপতিবাবু বলেন।

"তা হলে আদালতেই আপনার সঙ্গে মোকাবিলা হবে।" মানস পাল্টা দেয়।

এবার যূথিকা ভেঙে পড়ে। 'বাবা, তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও ত্যাগ করো। তোমার সম্পত্তি আমি চাইনে। কিন্তু আমার বিয়েটা বাতিল কবতে যেয়ো না। একবার বিয়ে হয়েছিল শুনলে আর কেউ আমাকে বিয়ে করবে না। তোমার সেই ব্যারিস্টার সুপাত্র মিস্টার সান্যালও না। মানসের কী। সে পুরুষ মানুষ। সে হয়তো আরো ভালো বৌ পাবে। আমি কি ওকে এত সহজে কেড়ে দিতে পারি? কড়ি দিয়ে কিনিনি, কিন্তু দড়ি দিয়ে বেঁধেছি। আদালতে দাঁড়িয়ে বলব যে আমিই অগ্রণী হয়ে বিয়ের নোটিস দিয়েছি। আর আমার দেওয়া বয়সের অঙ্ক যদি মিথ্যা হয়ে থাকে আমারই তো সাজা হবে। এ বিবাহ তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আর দু'দিন বাদে যে গ্রাজুয়েট হবে তার নিজের ইচ্ছার কি কোনো মূল্য নেই?"

'আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।'

তারপর থেকে দেখা সাক্ষাৎ চিঠিপত্র বন্ধ। যেমন দেবা তেমনি দেবী। নাতি হয়েছে খবরের কাগজে দেখেও তাঁর মন নরম হয়নি। ও যদি ছুঁয়ে দেয় তা হলে তো তাঁকে দিনে দশবার স্নান করতে হবে। নাতনি হয়েছে সেটাও খবরের কাগজে দেখে থাকবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন।

ওঁরা সিমলা থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় বাড়ী কিনেছেন। ছেলেরা বিলেতে পড়াশুনা করে লায়েক হয়েছে। একজন তো মেম বিয়ে করেছে। তাতে জাত যায়নি। সে যে ছেলে। দুঃখের বিষয় ওরাও বোনের খোঁজ নেয় না। যূথিকাও গায়ে পড়ে স্বামীর জন্যে অপমান ডেকে আনতে চায় না। শিবের জন্যে সতীর মতো সে দেহত্যাগ করেনি, পার্বতীর মতো পুত্রকন্যা নিয়ে ঘর সংসার করছে। পুরনো প্রসঙ্গ উঠলে মানসকে মনে করিয়ে দেয়, "তোমাকে আমি ছাড়িনি। ছাড়ব না। বাপ মাকেও কি ছেড়েছি? না, তাঁরাই আমাকে ছেড়েছেন।"

এসব দেখে শুনে মানসের বিশ্বাস হয় না যে বিপ্লব কখনো এমন দেশে হবে যেখানে মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতেও বর্ণান্ধ। বিপ্লব যদি হয় তবে সেটা শ্রেণীযুদ্ধ নয়, বর্ণযুদ্ধ। হাই-বর্ণ বনাম লো-বর্ণ। হাই-বর্ণকে সম্পূর্ণরূপে নতশির করতে হবে, আর লো-বর্ণকে আত্মসম্মানে উচ্চশির। জন্মগত কারণে কেউ উপরে নয়, কেউ নিচে নয়। একটি বিশেষ জাতে জন্মেছে বলে কতক লোক চিরকাল উপরে, কতক লোক চিরকাল নিচে এর ওলট পালটই বিপ্লব। এটা ঘটবে যখন লোকে বুঝতে পারবে যে কেউ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায় না, কেউ পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্র হয়ে জন্মায় না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সনাতন বলে চালাবার জন্যে কর্মবাদ বা জন্মান্তরবাদকে ব্যবহার করা অনুচিত। বর্ণাশ্রমীরাই এটা করেছে, বৌদ্ধরা এটা করেনি।

আহত হয়ে মানস বলেছিল যূথিকাকে, 'জুঁই, তুমি ধীবরকন্যা সত্যবতী হলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতুম। তোমার পরিচয় তুমি।"

''তা হলে আমি ত্যাজ্য কন্যা না হয়ে তুমি ত্যাজ্যপুত্র হতে। আমি কি তাতে সুখী হতুম?" যূথিকা দরদের সঙ্গে বলে।

মানস স্বীকার করে হিন্দু সমাজের ধাপের পর ধাপ। উচ্চতর নিম্নতর অসংখ্য পইঠা। ওর বাবা একসময় শঙ্কিত হয়ে সুধিয়েছিলেন, "তুই নাকি গয়লানী বিয়ে করতে যাচ্ছিস?" না, সে চেয়েছিল চাষানী বিয়ে করতে। বলে না।

মানসের মা নেই, বাবা তাঁর বৌমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাতে কিন্তু প্রমাণ হলো না যে যূথিকা যদি গোপী হতো তিনি তেমনি উদার হতেন। মানস মনে প্রাণে ব্রাহ্ম, কিন্তু হিন্দু সমাজভুক্ত। সমাজকে সে ভিতর থেকেই সংস্কার করতে চায়। জাতের বিচার একদিনে দূর করতে পারা যাবে না,

কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপক হলে তার থেকে হুল চলে যাবে। শ্বশুর শাশুড়ির কাছে তাকে হেনস্থা হতে হবে না।

তার বিবাহ যেমন প্রতিলোম বিবাহ সৌম্যদার বিবাহও তেমনি অনুলোম বিবাহ। ওর আত্মীয়রা কি জুলিকে সাদরে গ্রহণ করবে? হয়তো মানসের মতো অবমাননা হবে বেচারির। এই পনেরো বছরে সমাজ অনেকটা বদলেছে। তবে শহর অঞ্চলেই।

সৌম্যদার বিয়েতে মানস যোগ দিতে পারে না। দায়রার মামলায় আটকে পড়েছিল। তা ছাড়া স্বপনদাকে লিখতে তার মনে দ্বিধা ছিল। টেলিগ্রাম করে ক্ষমা চায় ও অভিনন্দন জানায়। আশা করে অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

সৌম্যর পরিকল্পিত বিবাহ পদ্ধতি জুলির অনুমোদন পায় না। অনুষ্ঠান আশ্রমেই হয়, কিন্তু সংক্ষেপিত হিন্দু মতে। শালগ্রাম বাদ, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র বাদ নয়। স্ত্রী আচার বাদ, কিন্তু হোম বাদ নয়। সম্প্রদান বাদ, কিন্তু পরস্পরকে বরণ বাদ নয়। সাত পাক বাদ, কিন্তু সপ্তপদী বাদ নয়। সঙ্গীত বাদ, কিন্তু শঙ্খধ্বনি বাদ নয়। দর্শকদের সকলের মিষ্টিমুখের প্রয়োজন ছিল। জুলিই জনে জনে মিষ্টান্ন বিতরণ করে। এর পরে ওরা রেজিস্ট্রি অফিসে যায়।

জুলির মা বাড়ীতে পার্টি না দিয়ে হোটেলেই ডিনার দেন। জুলির কথায় নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা সংক্ষেপিত করেন। স্বপনদা, দীপিকাদি, বাবলীও নিমন্ত্রিত। স্বপনদা বাবলীকে বলেন, "চকোলেট, এর পর তোমার পালা।" বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "বিয়ে একটা বুর্জোয়া ব্যাপার।"

সৌম্য তার কাকার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিল তা একজন বাস্তববাদীর লেখা। "রাষ্ট্রে তোমরা যেসব পরিবর্তন ঘটাতে চাও সেসব লোকে সমর্থন করতে রাজী, কিন্তু সমাজের বেলা তারা ঘোর রক্ষণশীল। জাত ভেঙে বিয়ে করলে সমাজও ভেঙে যায়। বিধবার বিয়ে তো পাপ। তোমরা আপাতত বাইরেই থাকো, আমি এখানকার জনমত পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করি। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের দল যদি জেতে আর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তা হলে আমি একজন মন্ত্রীকেই এখানে ধরে নিয়ে আসব আর তিনিই তোমাদের অভ্যর্থনা করবেন।"

দেশের বাড়ীতে যাওয়া হয় না। শান্তিনিকেতনে দিন তিনেক থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মানসও সপরিবারে গিয়ে রবিবারটা কাটায়।

জুলি কি আর সেই জুলি? লজ্জানম্র লক্ষ্মী বৌ। ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ। উড়নচণ্ডী বিপ্লবী নায়িকা নয়। জোন অভ আর্ক নয়। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে জলজ্বলে টিপ। বদনে আনন্দের উদ্ভাস। বিয়ের জল পড়ে স্নিগ্ধ।

সৌম্যকেও আগের মতো শুষ্ক কাষ্ঠ মনে হয় না। তারও পরিবর্তন হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে রসের আস্বাদন পেয়েছে।

যূথিকা মানসের কানে কানে বলে, "জুলি এখন বিজয়িনী। সৌম্যদা বিজিত। শিব আর পার্বতী।"

॥ সাত ॥

যূথিকা ও জুলি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেডাতে যায়। সৌম্যর সঙ্গে গল্প করে মানস। বিবাহের প্রসঙ্গ যেন ফুরোতে চায় না।

"দেশ যতদিন না মুক্ত হয়েছে ততদিন আমাকে ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। এ ছাড়া আমি আর কোনো কথা ভাবিনি, মানস। কিন্তু দেখলুম বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে আমাদের জিৎ হলো না। আরো একবার লডতে হবে। কবে, কতদিন পরে কেউ বলতে পারে না। বাপু বেঁচে আছেন আরো একবার লড়বেন বলে। একশো বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার কথাও বলছেন। তার মানে পরের বারের সংগ্রামের জন্যে আরো পঁচিশ বছর সময় নিচ্ছেন। তা 'বলে আমিও কি বিবাহের জন্যে আরও পঁচিশ বছর সময় নিতে পারি? জুলির হতাশা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তার আশা ছিল গান্ধীজী যা পারলেন না নেতাজী তা পারবেন। কিন্তু ইম্ফলে তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জিৎ হয়নি। ইংরেজকে তা হলে তাড়াবে কারা? কমিউনিস্টরা? এ চিন্তা ওকে পাগল করে তোলে। ও বিপ্লব বলতে বোঝে রাষ্ট্র বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব নয়। এখন ওর সব আশা ভরসা নির্মূল। ওর মা আমাকে ওর ভার নিতে বলেন। মা না বললেও আমি ওর অবস্থা বিবেচনা করে আপনা থেকে নিতুম। এদেশে বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা যায় না। ওদেশে অবশ্য সেরকম নজীর আছে। সেটা তোমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে। ভালো করেই বুঝতে পারি যে জুলিকে বিয়ে না করলে ওর অবস্থা আরো খারাপ হবে। সোনাদিকে লিখি, তিনি বাপুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেন। কিন্তু—"

মানস সৌম্যর মুখে দুষ্টু হাসি দেখে বলে, "কিন্তু কী ?"

"কিন্তু শর্ত আছে।" সৌম্য সবটা একনিঃশ্বাসে বলেন না।

"শর্ত। কী শর্ত।" মানস কৌতূহল দমন করতে পারে না।

"তোমার মাথায় ঢুকবে না। সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকবে না। আমিও কি ভাবতে পেরেছি ?" সৌম্যর চোখে মুখে হাসি।

"আরে বলোই না। অত ধানাই পানাই কেন ?" মানস অধৈর্য হয়।

"বিবাহের শর্ত ব্রহ্মচর্য।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

মানস আর সইতে পারে না। "গান্ধীজী একটা কিল্-জয়।"

সৌম্য গান্ধীজীর পক্ষ নেয়। "আমরা গান্ধী পরিচালিত সত্যাগ্রহীরাও একটা ফৌজ। ফৌজে থাকতে হলে কতকগুলো কানুন মানতে হয়। এটাও সেইসব কানুনের একটা। যদি গঠনেব কাজ নিয়ে থাকি, সত্যাগ্রহে যোগ না দিই, তা হলে বিবাহের পর ব্রহ্মচর্যের বাধ্যবাধকতা নেই। গঠনের কাজও দেশেব কাজ। গঠন থেকেই সংগঠন গড়ে উঠবে। সংগঠন ছাড়া গণ সত্যাগ্রহ সম্ভব নয়। এবার সেটা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। অসংগঠিত জনতা যা করেছে তা গণ সত্যাগ্রহ নয়। তার ব্যর্থতা গণ সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা নয়। গান্ধীজীর ব্যর্থতা তো নয়ই। আমি আপাতত গঠনকর্মেই আত্মনিয়োগ করছি। তাই বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য পালন করছিনে। কিন্তু সত্যাগ্রহের সময় যখন আসবে তখন ?"

"আবার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে।" মানস উপহাস করে।

"তুমি কি মনে করেছ আমি পারব না ?" সৌম্য কঠোরভাবে বলে।

"এটা কি তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি ব্রহ্মচারী হলে তোমার স্ত্রীও ব্রহ্মচারিণী হতে বাধ্য হয় ? কেন ওকে তুমি বাধ্য করবে ? কী অধিকার আছে তোমার ? তুমি ওর অনুমতি চাইতে পারো, কিন্তু ও যদি অনুমতি না দেয় ? অবশ্য সেও যদি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চায় সে কথা আলাদা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জোর জবরদস্তির সম্পর্ক নয়। একজন আরেকজনের উপর ব্রহ্মচর্য বা সত্যাগ্রহ চাপিয়ে দিতে পারে না। ভুলে যেয়ো না যে নারীরও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। তাকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখলে সে কষ্ট পায়। তোমার অন্তরে প্যাশন নেই, তা আমি জানি। কিন্তু কম্প্যাসন তো আছে। কী করে তুমি একটি নারীকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখবে ? কষ্ট দেবে ?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

সৌম্য খপ করে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "কী করে তুমি জানলে আমার অন্তরে প্যাশন নেই, শুধু কম্প্যাসন আছে? আমার প্যাশন আমি সাবলিমেট করেছি। দেশের মুক্তির জন্যেই সে প্যাশন। নারীর মধুর রসের জন্যে নয়। গান্ধী, জবাহরলাল, সুভাষ এঁদের অন্তরেও প্যাশন আছে। সে প্যাশন দেশের মুক্তির জন্যে। নারীর সঙ্গে মিলনমাধুরী তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি। আমার আশঙ্কা আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

মানস তাকে আশ্বাস দেয় যে সবাই ব্রহ্মচারী না হলেও দেশ স্বাধীন হবে। আমেরিকা হয়েছে, ইটালী হয়েছে, আয়ারল্যাণ্ড হয়েছে। কোথাও ব্রহ্মচর্যের এমন মাহাত্ম্য নেই। সংগ্রামের নেতারা কেউ মহাত্মা নন। শুধু ভারতের বেলাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে সংগ্রামের নেতাদের মহাত্মা হতে হবে। আর মহাত্মা হতে হলে ব্রহ্মচারী হতে হবে। এ দেশের জনগণ ব্রাহ্মণ বলতেই অজ্ঞান, সন্ন্যাসী বলতেই মন্ত্রমুগ্ধ। নেতারাও হয় ব্রাহ্মণ, নয় সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই তাদের এত প্রেস্টিজ। তবে মুসলমান বা শিখদের মধ্যে এ কুসংস্কার নেই। তাদের মধ্যে যে কেউ বীরপুরুষ হয়নি তা নয়। বীরপুরুষরা বরং বহুভোগী। দেশকে মুক্ত করা বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের কাজ। তাঁদের নিয়েই মহাকাব্য বা নাটক রচিত হয়।"

"সে কথা ঠিক।" সৌম্য স্বীকার করে। "জুলিকেও আমি ব্রহ্মচারিণী হতে বলিনে। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মচারী হই, ও যদি ব্রহ্মচারিণী হতে না চায়, তবে সে এক মহা অশান্তির ব্যাপার হবে। বাপু কলকাতা আসবেন শুনেছি। তাঁকে একলা পেলে জিজ্ঞাসা করব এহেন সমস্যার সমাধান কী।"

"নারীকেই আত্মবলি দিতে হবে, এ ছাড়া আর কী? কস্তুরবাকে তিনি আত্মবলি দিতে প্রণোদিত করেছেন। জুলিকেও কস্তুরবা হতে বলবেন। কিন্তু ও কেন শুনবে? তুমি কি বিয়ের আগে ওকে গান্ধীজীর শর্তের কথা জানিয়েছ?" মানস সৌম্যকে বেকায়দায় ফেলে।

"না, ভাই! জানালে ও হয়তো মারতে আসত। ওর প্রথম বিবাহে ফুলশয্যা হয়নি। ও ব্রহ্মচারিণী থেকে গেছে। দ্বিতীয় বিবাহেও তাই হলে ও কি ক্ষমা করবে? দেশের নেতারা ওকে নিরাশ করেছেন। আমি ওর স্বামী হয়ে যদি ওকে নিরাশ করি ও কি মারমুখী হবে না?" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

এর পর মানস চিন্তা করে বলে, "গান্ধীজীর উচ্চাভিলায তিনি সেক্সলেস

হতে চান। তার মানে একজন বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর কি মঞ্জুশ্রী। তাঁর পাল্লায় পড়ে তুমিও আরেকজন বোধিসত্ত্ব। ক্ষিতিগর্ভ কি সামন্তভদ্র। তোমার পাল্লায় পড়ে বেচারি জুলি যে কী হবে তাই ভাবছি।" মানস রহস্য করে।

সৌম্য হেসে ওঠে। "আমার পাল্লায় পড়ে ও মা হতে চায়। একটি ছেলের ও একটি মেয়ের। এর পরে তো ওর কোনো চাহিদা থাকার কথা নয়। সেক্স ব্যাপারটা তো সন্তানার্থে। মানুষ তার উপর আরো কিছু আরোপ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য তো প্রজনন। সমাজেরও অভিপ্রায় পৌর্বাপর্য রক্ষা। যাকে বলে পিতৃঋণ শোধ। ঋণমুক্ত হবার পর আমাদের উভয়েরই কর্তব্য মিলনকামনাকে কায়িক স্তর থেকে আত্মিক স্তরে উন্নীত করা। যৌবন তো ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক বছর পরে আমার হবে বানপ্রস্থের বয়স। আর জুলির চেঞ্জ অভ্ লাইফ। এমনিতেই দাঁড়ি টানতে হবে।"

"বিরতি হয়তো একদিন আপনি আসবে। কিন্তু জোর করা বিরতির পরিণাম ভয়াবহ। যে প্রকৃতির দোহাই তুমি দিয়েছ সেই প্রকৃতিই কামনাপূরণের প্রবর্তনা দেয়, সন্তান থাকা সত্ত্বেও। স্ত্রী নারাজ হলে স্বামী অন্যত্র যায়, স্বামী নারাজ হলে স্ত্রী অশান্ত হয়। সব চেয়ে ভালো হচ্ছে দু'জনের পায়ে পা মিলিয়ে চলা। শয্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া মহা অনর্থকর। একবার বিয়ে করলে তারপর থেকে তুমি আর ফ্রী নও। তোমার ফ্রীডম আসবে জুলি যেদিন স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বলবে, আর চাইনে। কামনার কোনো বয়ঃসীমা নেই। সন্তানধারণের বয়স পার হয়ে গেলেও নারী পুরুষকে আকর্ষণও করতে পারে, তার দ্বারা আকৃষ্টও হতে পারে। তখন আর অন্তঃসত্ত্বা হবার ভয় ওর থাকে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে আরো অনেকদিন ভোগসুখ চাইতে পারে। যদি না রোগে শোকে জর্জর হয়।" মানস যতদূর জানে।

সৌম্য কী যেন ভাবছিল। বলে, "বেদ উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ন স্ত্রী, ন পুমান্। ব্রহ্ম শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। তোমরা ব্রাহ্মরা তাঁকে বানিয়েছ পুংলিঙ্গ। যিনি পুরুষও নন, নারীও নন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে হলে ন স্ত্রী ন পুমান্ হতে হবে। এটাই তো লজিক। এদিক থেকে বাপুই লজিকাল। তিনি আগে বলতেন ভগবানই সত্য। আজকাল বলেন সত্যই ভগবান। সত্য শব্দটি ব্রহ্ম শব্দটির মতো ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে

ক্লীবলিঙ্গই হতে হয়। সেটাই এখন তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক সাধনা। সত্য আর অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য তিনটিই তাঁর কাছে এক, একটিই তিন। আমার কাছে এখনো হয়নি, কবে হবে তা নির্ভর করছে দীর্ঘজীবনের উপরে। পরের বারের সংগ্রামে যদি যোগ দিই তবে জেলে যেতে হবে না, সেটা সকলে পারে। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে হবে কিংবা পেছন থেকে ছোরা খেতে হবে। সত্যাগ্রহ মানে জেলযাত্রা নয়। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়া নয়। বাপু আমাকে গঠনের কাজে নিযুক্ত রেখে বাঁচিয়ে দিতে চান, কিন্তু আমার ভিতরে একজন সৈনিক আছে, সে তোমার মতো নীরব সাক্ষী হতে নারাজ। সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সম্ভবত মার খেয়ে মরবে।"

"গড ফরবিড।" মানস বলে ওঠে। "তুমি এখন বিবাহিত গৃহস্থ, তুমি আর স্বাধীন নও। জুলির অনুমতি না নিয়ে তুমি প্রাণ দিতে পারবে না। ওকে বিধবা করার কী অধিকার আছে তোমার? ও ক'বার বিধবা হবে? যদি ছেলেমেয়ের মা হয় তবে বিধবা হয়ে আরো কষ্ট পাবে। তোমাকে বাপু গঠনের কাজে একনিষ্ঠ হতে বলেছেন। তোমাকে তাঁর নির্দেশ মানতে হবে।"

এর পর ওঠে মিলির প্রসঙ্গ। একান্ত কুণ্ঠা আর সঙ্কোচের সঙ্গে সৌম্য মানসকে বিশ্বাস করে বলে, "একচক্ষু হরিণের মতো আমি একটা দিকই দেখেছি, আরেকটা দিক দেখিনি। জুলির দিকটা দেখেছি, মিলির দিকটা দেখিনি। এখন বুঝতে পারছি একই বাড়ীতে দুই নারী থাকতে পারে না। এমন কী, একই শহরেও না। মিলির বিলেত ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছি, কিন্তু মিলি নাকি স্থির করেছে যে ওর ছেলেকে স্বদেশেই মানুষ করবে, বিদেশে নয়। ওদিকে সুকুমার লণ্ডনের শহরতলী ব্রেণ্টে সস্তায় পেয়ে বাড়ী কিনেছে, সেইখানেই সেটল করবে। ছেলেকে বিলেতের ভালো প্রাইভেট স্কুলে পড়াবে! তার পর অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে। ছেলে যখন দেশে ফিরবে তখন সে একজন কেষ্ট বিষ্টু হয়ে ফিরবে। যেমন শ্রীঅরবিন্দ। সুকুমারের মটো হচ্ছে বেস্ট এডুকেশন, নট স্বদেশী এডুকেশন। মিলির মটো ঠিক বিপরীত। ছেলে দেশের পড়া সাঙ্গ করে বিদেশে যাবে। যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মিলি তার ছেলের মঙ্গলের জন্যে দেশে থেকে যেতে চায়, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে বিলেতে বসবাস করতে নারাজ। এই নিয়ে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। সুকুমার দেশে ফিরে কী করবে? ভেরেণ্ডা ভাজবে? তবে ও তুখোড় লোক। কৃষ্ণমেননের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আর

কৃষ্ণ মেনন তো জবাহরলালের ভক্ত। লেবার পার্টিতে ওঁর যথেষ্ট প্রভাব। এখন তো লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের সম্ভাবনা নিকটবর্তী। জবাহরলাল ইচ্ছে করলে মেননকে আর মেনন ইচ্ছে করলে সুকুমারকে দেশে ফিরিয়ে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। মিলি কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। চার্চিল এখন গভর্নমেণ্টে নেই, তবু অপোজিশনে তো আছেন। ভারতসংক্রান্ত প্রশ্নে ব্রিটিশ জনমত চার্চিলের মুখের দিকে তাকিয়ে, অ্যাটলীর মুখের দিকে নয়। চার্চিলের পার্টির সঙ্গে জিন্নার পার্টির সম্পর্ক তেমনি নিবিড় যেমন লেবার পার্টির সঙ্গে নেহেরুর পার্টির। কংগ্রেস যদি লীগের সঙ্গে মিটমাট না করে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করবে না। কংগ্রেস কী করে পার্টিশনের ভিত্তিতে দেশকে স্বাধীন করবে? পাকিস্তান তো ব্রিটেনের তাঁবেদার হবে। বোমা রিভলভারের দিন আবার আসছে। স্টেন গান, গ্রেনেড ইত্যাদিও জোগাড় করতে হবে। মিলিকেও আবার আসরে নামতে হবে। সুকুমারের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নেও তার বিরোধ! ইংরেজরা আর সব বিষয়ে ভালো, কিন্তু হাড়ে হাড়ে সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্য ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ছাড়লেও মুসলিম লীগের বকলমে ভারতের মাটিতে এক পা রাখবে। তার নাম কি স্বাধীনতা? কখনো নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা। তার জন্যে সিপাইদের নিয়ে লড়তে হবে। দশ বছর দেরি হবে? হোক না দশ বছর দেরি? নেতারা ততদিন বাঁচবেন না। নাই বা বাঁচলেন? নতুন নেতার উদয় হবে।"

মানস অবাক হয়ে শোনে। জিন্না চার্চিল অ্যাকসিস আর নেহরু লেবার অ্যাকসিস দুটোই সত্য। কী করে এদের মধ্যে মিটমাট হবে ভগবান জানেন। গান্ধীজী অবশ্য চুপ করে থাকবেন না, হয় জেলে ফিরে যাবেন, নয় মরণপণ অনশন করে স্বর্গে চলে যাবেন। সৌম্য যদি গান্ধীর নিয়তির নিজের নিয়তির সঙ্গে সংযুক্ত করে তবে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জুলি কি তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে পারবে? আর ওই যে মিলি ওই বা কেন আসমান থেকে নেমে এসেছে ঠিক এই মুহূর্তে? সৌম্যকে কেন মুশকিলে ফেলেছে? দুই নারীর মাঝখানে পড়ে বেচারা কি ও শহরে তিষ্ঠতে পারবে? ওর হাতে গড়া আশ্রম ওকে ছাড়তে হবে।

যুথিকা ও জুলি দীপক ও মণিকাকে নিয়ে ফিরে আসে। জুলি উচ্ছ্বসিত

হয়ে বলে, "আহা, এমন না হলে আশ্রম! কী নেই এখানে। নাচ, গান, বাজনা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। নাচের ক্লাস চলছিল, অনুমতি নিয়ে অমিও একটু নাচলুম। ওঁরা বলেছেন আমি যদি এখানে থাকি আমাকেও নাচের ক্লাসে ভর্তি করে নেবেন। কে একজন দক্ষিণী মন্তব্য করেন, ইউ আর আ বর্ন ডান্সার। এই আশ্রম আর ওই আশ্রম! কার সঙ্গে কার তুলনা! এই, তুমি কেন ওখান থেকে এখানে চলে এস না? আলাদা একটা বাড়ী করে তোমার কাজ তুমি করবে, আমার কাজ আমি করব। নাচ, গান, ছবি আঁকা এইসব আমার কাজ। আফসোস হচ্ছে আগে কেন এখানে আসিনি, নাচ গান ছবি আঁকা শিখিনি। বিবাহিতা ছাত্রীও দেখলুম। কারো কারো বয়স আমারই মতো। এই, তুমি কেন আমাকে এখানে ভর্তি করে দাও না। উত্তরায়ণে গিয়ে রথীদা ও বৌঠানের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। ওঁরা আমাকে পেলে খুব খুশি হবেন। থিয়েটারে একটা পার্ট দেবেন। আহা, থিয়েটার! কী চমৎকার! বললেন আমাকে যা মানাবে। কার পার্ট, জানো? 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর পার্টে। হ্যাঁ, আশ্রমে যদি থাকতে হয় তো এই হচ্ছে সেই আশ্রম। মহর্ষি ও মহাকবির স্বপ্ন।"

"জুলি যা বলছে তা ভেবে দেখবার মতো। এটাও আশ্রম। এখানে এলে বা এর কাছাকাছি নতুন একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, ওর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হবে। তুমি বাপুকে চিঠি লিখে ওঁর অনুমতি নাও। জুলিকে যদি রাজনীতি ভুলিয়ে দিতে চাও এই সেই পরিবেশ।" মানসের পরামর্শ।

সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে, "জুলিকে নয়, মিলিকে। ওর ছেলের পড়াশুনার পক্ষে এই পরিবেশই আদর্শ। জুলির যদি ছেলেমেয়ে হয় ওরাও একটু বড়ো হলে এখানে আসবে। তখন জুলিও আসবে তাদের নিয়ে থাকতে। কিন্তু আমায় কি সে স্বাধীনতা আছে? ওখানে আমি হাজার জন কাটুনীকে দিয়ে সুতো কাটাই, তাদের পেছনে আমার বছরে খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। তারপর স্থানীয় তাঁতীদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিই। তাতেও খরচ হয় লাখ দেড়েক টাকা। ছুতোর, কামার, রংরেজদের পেছনেও অনেক টাকা খরচ হয়। তা ছাড়া আশ্রমের কর্মীরা আছেন। ভাণ্ডার চালাতেও খরচ হয়। এখানে যদি আসি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আবার সেই চলি চলি পা পা। কতকাল লাগবে তত বড়ো আকার দিতে। সেই সময়টা

ওখানে দিলে ওখানকার আশ্রম দ্বিগুণ বড়ো হতে পারে। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্‌ভাব রক্ষা করতে। গঠনকর্মের মাধ্যমে। আমি যে খরচটা করি তার সিংহের ভাগ পায় মুসলমানরা, তারাই স্থানীয় সংখ্যাগুরু। ব্যয়ের চেয়ে আয় অনেক কম। ফী বছর লোকসান দিতে হয়। খাদি এখনো আত্মনির্ভর হয়নি। সঙ্ঘ থেকে ভর্তুকি দেয়। এই উপলক্ষে হিন্দু মুসলম'নের যে ঐক্য গড়ে তুলেছি সেটা মুসলিম লীগ তথা হিন্দু মহাসভা উভয়েরই চক্ষুশূল। পালিয়ে এলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে কী রকম প্রোপাগাণ্ডা হচ্ছে, জানো? বাবুরা দেশের জন্যে জেল খাটছেন, তাঁরা দেশকে ভালোবাসেন। কিন্তু দেশকে ভালোবাসলে কী হবে, দেশের মানুষকে যে ভালোবাসেন না। মুসলমানকে তাঁরা ক্ষমতার অংশ দেবেন না। ইংরেজকে তাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানকেও তাড়াবেন। ইংরেজও বিদেশী, মুসলমানও বিদেশী। ইংরেজও বিধর্মী, মুসলমানও বিধর্মী। ইংরেজও বিজেতা, মুসলমানও বিজেতা। এক ঢিলে দুই পাখী মারবেন। পাকিস্তানই একমাত্র রক্ষাকবচ।"

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। বলে, "তোমাকে কাসাবিয়াঙ্কার মতো ওই জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সৌম্যদা। চারদিকে আগুন ধরে গেলেও। পলায়ন বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু সত্যাগ্রহীর কাজ নয়।"

জুলি ক্ষেপে গিয়ে বলে, "তা হলে তুমিই বা কেন ওখানে বদলী হয়ে যাও না? তুমিও তো হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চাও।"

মানস এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলে, "আমি তো চাকরি থেকে অকালে অবসর নিতে যাচ্ছি।"

"তার মানে তুমি এসকেপিস্ট। ছি ছি, মানসদা।" জুলি ধিক্কারি দেয়।

এবার যূথিকা তার স্বামীর পক্ষ নেয়। "ওর এই সিদ্ধান্তটা পাঁচবছর আগে নেওয়া হয়ে গেছে। শুধু যুদ্ধশেষের অপেক্ষা। আর আনুপাতিক পেনসনের।"

"সে কী, মানসদা, তুমি আমাদের বিষম বিপদের মুখে ফেলে নিজে নিরাপদ হতে চাও। যদিও তোমরা আমাদের শত্রুপক্ষের লোক তবুও তোমরা থাকলে আমরা নিরাপদ বোধ করি।" জুলি অন্তর থেকে বলে।

"এতকাল তো দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে ইটপাটকেল খেয়ে এসেছি,

আজ হঠাৎ ফুলের তোড়া কেন? কবে থেকে আমাদের কদর বেড়ে গেল?" মানস সুধায়।

"হিন্দু অফিসার একটি কমলে হিন্দুর রক্ষকও একটি কমে। দেখছ না পরিস্থিতি কেমন ঘোরালো হয়ে আসছে? ইংরেজকে তাড়াতে গিয়ে শুনছি মুসলমানকেও তাড়াতে যাচ্ছি। যা স্বপ্নেও ভাবিনি। মুসলমান হচ্ছে ফ্লেশ অভ্ মাই ফ্লেশ, ব্লাড অভ মাই ব্লাড। কিন্তু এখন ওদের শেখানো হয়েছে যে ওরা আলাদা একটা নেশন, ওদের জন্যে আলাদা একটা দেশ চাই, যে তাতে নারাজ হবে সেই তার শত্রু। আমরা কি নারাজ না হয়ে পারি? গোটা বাংলাদেশটাই নাকি ওদের পাওনা। না দিলে ইংরেজকে ছেড়ে আমাদেরকেই ওরা তাড়াবে। আর নয়তো সুলতানী আমল ও নবাবী আমলের মতো পদানত করে রাখবে। আমরা কি ইংরেজকে বিদায় দিতে যাচ্ছি মুসলমানের প্রজা হতে?" জুলির মোক্ষম প্রশ্ন।

"কিন্তু তোমার ওটা ভুল যে আমি একজন হিন্দু অফিসার। না, আমাকে ধর্ম দেখে চাকরিতে নেওয়া হয়নি। যোগ্যতা দেখে নেওয়া হয়েছে। ধর্ম দেখে যাদের নেওয়া হয়েছে তারা মুসলমান। তাদের তুমি মুসলিম অফিসার বলতে পারো। কিন্তু আমরা ইণ্ডিয়ান অফিসার। আমরা ইণ্ডিয়ানদের সবাইকার রক্ষক। হিন্দু মুসলমান ভেদ বিচার করব না। অপরাধ নির্বিশেষে দণ্ড দেব। মুসলিম লীগ আমাদের খুব বেকায়দায় ফেলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এখনো আমাদের বিশ্বাস করে। আমি কি তাদের জন্যে কম ভেবেছি, কম করেছি? সৌম্যদাও ওদের জন্যে কম ভাবেনি, কম করেনি। তুমিও কম ভাববে না, কম করবে না। বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন প্রীতিপূর্ণ ছিল তেমনি প্রীতিপূর্ণ থাকবে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজই পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু হিন্দুর রক্ষক।" মানস উত্তর দেয়।

"পশ্চিমবঙ্গে বসে তুমি তো ওকথা বলবেই। যেতে যদি পূর্ববঙ্গে আর দেখতে যদি কী অবস্থা তবে তোমার মত বদলে যেত। তা তো নয়, তুমি চাকরি ছেড়ে পালাবার তালে আছো।" জুলি আবার টিটকারি দেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সপ্তপদী আমি চাইনি, জুলিই চেয়েছিল। বেচারিকে এখন আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে হবে। বিপদের ভয়ে আমি কি পেছপা হতে পারি? আমি যে গান্ধীজীর সৈনিক। বিপদের সঙ্গে আত্মার জোরে লড়ব। জুলি থাকবে আমার পাশে। জুলিই আমার শক্তি।"

"আচ্ছা, সৌম্যদা," যূথিকা সুধায়, "সপ্তপদী হয়েছে বলে কি স্ত্রীকেই স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে, স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে নয়, কস্তুরবাকেই গান্ধীজীর অনুসরণ করতে হবে, গান্ধীজীকে কস্তুরবার নয়? আমাদের বিয়েতে সপ্তপদী হয়নি। তার জন্যে আমার মনে খেদ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি সপ্তপদী না হয়ে ভালোই হয়েছে। আমি জুলির চেয়ে স্বাধীন। ও বেচারিকে তোমার মতো সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে।"

"ও না হলে আমাকে শক্তি জোগাবে কে?" সৌম্য সহাস্যে পাল্টা সুধায়।

"কেন? এতদিন কে জুগিয়েছিল?" যূথিকা জেরা করে।

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "ভারতমাতা। বন্দে মাতরম্।"

"তা হলে ভারতমাতাই আবার জোগাবেন। জুলিকে তুমি শান্তিনিকেতনে থাকতে দাও। পরে ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে।" যূথিকা বাজিয়ে দেখে।

"তবে তাই হোক। আপাতত আমার আশ্রম আমাকে টানছে। আমাকে যেতেই হবে। জুলি, তুমি কালকেই নাচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ো।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

জুলির মুখ শুকিয়ে যায়। "রাগ করলে নাকি? আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি? তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে যাব।"

মানস হেসে বলে, "রাশিয়াতে একটা প্রবাদ আছে, ছুঁচ যেদিকে যায় সুতো সেইদিকে যায়। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক যেন ছুঁচ সুতোর সম্পর্ক। ছুঁচ না হলে সুতো অকেজো। সুতো না হলে ছুঁচ অকেজো। তবে ছুঁচই আগে আগে যায়। সুতো অনুসরণ করে।"

তা শুনে যূথিকা ফোড়ন কাটে। "শোন, শোন। এই ছুঁচটির পিছু পিছু এই সুতোটিকেও বাংলাদেশের কাঁথাখানা এফোঁড় ওফোঁড় করতে হয়েছে। কোথাও কি দুটো বছর থাকতে দিয়েছে? একবার বাদে। জুলি, তোমার ভাগ্যে বদলী নেই। তুমি ভাগ্যবতী।"

"সে তো আরো ভাবনার কথা। সারাজীবন ওখানেই কাটাতে হবে নাকি? যাবজ্জীবন দীপান্তর!" জুলি আঁতকে ওঠে।

"কেন ইংরেজ মিশনারিরা কি সারাজীবন ভারতে কাটান না? গান্ধীবাদী গঠনকর্মীরাও আরেক রকম মিশনারি। কোথাও একটা স্কুল, কোথাও একটা হাসপাতাল, কোথাও একটা কুষ্ঠসেবাশ্রম নিয়ে মিশনারিরা বসে যান। তোমরাও তেমনি বসে যাবে। তা হলেই তো লোকের উপর তোমাদের

নৈতিক প্রভাব পড়বে। খাদির কাজ একটা বিজনেস নয়। লোকে যদি সেটাকে টাকা পয়সার নিরিখে বিচার করে তবে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শোষণহীন সমাজ সংস্থাপন। নইলে আর্থিক লোকসান দিতে দিতে তোমরা একদিন দেউলে হবে। তখন আশ্রম গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যাবে।" মানস যেমন অনুমান করে।

"নেহাৎ ভুল বলোনি মানস।" সৌম্য স্বীকার করে। "আমরা এখনো লোকের মনের মধ্যে গভীর ভাবে শিকড় গাড়তে পারিনি। গভর্নমেণ্ট সব তছনছ করে দিয়েছে। লোকে 'হাঁ, হাঁ' করে ছুটে আসেনি। পুলিশের সামনে শুয়ে পড়েনি। যেসব কর্মী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের বাদ দিয়েও আরো কয়েকজন কর্মী ছিল গঠনকর্মে রত। তারা নিঃশব্দে সরে পড়ে। রুখে দাঁড়ায় না।"

"মানসদা," জুলি নিবেদন করে, "আমি কিন্তু গান্ধীবাদীও নই, মিশনারিও নই। মতবাদের দিক থেকে সৌম্য যেমন স্বাধীন আমিও তেমনি স্বাধীন। তবে কার্যকলাপের বেলা আমাকে সতর্ক হতে হবে, যেন গঠনকর্ম বা সত্যাগ্রহ বাধা না পায়। আপাতত আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এ রাজনীতি আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। আমি চাই বৈপ্লবিক রাজনীতি, অথচ কমিউনিস্ট পার্টির ডিকটেটরশিপ নয়। রাশিয়ায় ওরা ধনিকদের মালিকানা রাষ্ট্রসাৎ করেছে, কিন্তু শ্রমিকদের মালিকানা বা মালিকানার অংশ দেয়নি। তারা শ্রম দেয়, পারিশ্রমিক পায়, যেমন বাড়ীর চাকর। চাকরে মালিকে অনেক তফাৎ! রাষ্ট্রের চাকুর বলে পরিচয় দেওয়াটা কি খুব গৌরবের? সরকারী চাকুরে হিসাবে তুমি, মানসদা, কি খুব একটা গৌরব বোধ করো? কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও কি তোমার গৌরব বৃদ্ধি পাবে? শ্রমিকরা যেদিন জানবে যে তাদের কারখানার তারাই মালিক, প্রত্যেকেই মালিকানার অংশীদার, সেইদিনই সত্যিকার সমাজতন্ত্র। তার জন্যে যদি আমার ডাক পড়ে আমি আবার রাজনীতিতে যোগ দেব। কিন্তু স্বামীর সম্মতি নিয়ে।"

যূথিকা রঙ্গ করে। "সন্তানের সম্মতি নেবে না? না তুমি সন্তান এড়াতে চাও? না তুমি ওদেরকে বাপের ঘাড়ে চাপাতে চাও?"

"কী যে বলো, যূথীদি! আমি কি কখনো মা না হয়ে পারি? আশা করি ওরা ততদিনে বড়ো হয়ে থাকবে। কোথায় বিপ্লব! তার কোনো লক্ষণই আমার চোখে পড়ছে না। বিশ্ব পরিস্থিতি তার অনুকূল ছিল তিন

বছর আগে। যুদ্ধের মাঝখানে। আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এলোপাথাড়ি নরহত্যায় কোনো ফল হবে না। ভায়োলেন্স ফর ভায়োলেন্স' সেক আমার মটো নয়। সমষ্টি যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে গোষ্ঠী সেখানে সফল হতে পারে না। তা দিয়ে হয়তো কতক লোককে কতক সময়ের জন্যে জাগানো যায়। কিন্তু তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সৌম্য আমাকে অহিংসায় দীক্ষা দেয়নি। তবে আমি নিজেই উপলব্ধি করছি যে এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হিংসা সম্ভব নয়, যদি না আর্মিকে তার মধ্যে ধরি। অথচ আর্মি যে ক্ষমতা হাতে পেয়ে হাতছাড়া করবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।"

মানস বলে, "সৌম্যদা, জুলি তোমার মতো পজিটিভ গান্ধীবাদী না হলেও নেগেটিভ গান্ধীবাদী। হাস্যকর শোনায়, কিন্তু আমরা অনেকেই তাই। যারা দু'বেলা 'অহিংসা' 'অহিংসা' করে তারাই যে গান্ধীবাদী তা নয়। যারা দু'বেলা হিংসাকে এড়িয়ে চলে তারাও গান্ধীবাদী। আর, বোন জুলি, তোমাকেও একটা কথা বলি। চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের মালিক আর শ্রমিক একই লোক। কেউ শোষকও নয়, কেউ শোষিতও নয়। যে ক্যাপিটাল জোগায় সে শ্রমও জোগায়। এই হলো থিয়োরি। প্র্যাকটিসে কিছু অদল বদল ঘটতে পারে। যে দেশে কোটি কোটি মানুষ বেকার বা অর্ধ বেকার সে দেশে চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বিপুল হতে পারে। তবে ভারী শিল্পের বেলা এ ব্যবস্থা খাটবে না। চাই প্রচুর মূলধন, সুদক্ষ শ্রমিক, অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার করিৎকর্মা ম্যানেজার, দূরদর্শী ডাইরেক্টর। রেল, জাহাজ, প্লেন সমস্তই আমাদের দেশে বানাতে হবে। প্রকৃতিদত্ত খনিজের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক, কিন্তু মালিকানা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া যাক। শ্রমিকরাও শেয়ার হোলডার হোক। যেই শ্রমিক সেই আংশিকভাবে মালিক। গান্ধীজীকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে।"

॥ আট ॥

ওদিকে দুই বন্ধুতে তর্ক করতে করতে পৌঁছে যায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে। মানস বলে, "তীর ধনুকের যুগ কবে শেষ হয়েছে। এবার কামান বন্দুকের যুগও গেল। শুরু হলো পারমাণবিক অস্ত্রের যুগ। এখনও তোমরা অহিংসার স্বপ্ন দেখবে, সৌম্যদা? বাস্তবের দিকে তাকাবে না।"

"পরমাণু অস্ত্র নতুন। অহিংসা চিরন্তন। ইটার্নাল ভেরিটির অন্যতম। এর পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা যা করেছি তাই শেষ নয়, ভবিষ্যতে আরো কত পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। কেবল ভারতে নয়, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, জার্মানীতে, জাপানে, ইংলণ্ডে, আফ্রিকায়। মহাত্মা থাকবেন না, আরো কত সাধক জন্মাবেন। মিলিটারিস্টরা মঞ্চ জুড়ে থাকবে, এ কখনো হতে পারে না। নিজেরাই মারামারি করে নিপাত যাবে। এরা যদি বাঁচে তো অহিংসার কল্যাণেই বাঁচবে। অহিংসার ভবিষ্যৎ পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে সুদূরপ্রসারী। আমরা বার বার ব্যর্থ হব, কিন্তু সেই ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।" সৌম্য নিশ্চিতরূপে জানে।

"হ্যাঁ, কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে তোমরা মোকাবিলা করবে কেমন করে?" মানস জানতে চায়।

"দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করে। যার হাতে যে অস্ত্র আছে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মরতে যদি হয় তো নৈতিক প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হবে। টলস্টয় হলে বলতেন অপ্রতিরোধ। গান্ধী কিন্তু অপ্রতিরোধের নয়, আত্মিক প্রতিরোধের শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছেন। নৈতিক প্রতিরোধ আর আত্মিক প্রতিরোধ একই কথা। পরমাণবিক অস্ত্র যার হাতে আছে তার কি শুধু হাতই আছে? হৃদয় নেই, বিবেক নেই, আত্মা নেই? বোমা ফেলবার আগে সে দশবার ভাববে। নেহাৎ পাষাণ হয়ে থাকলে ফেলতেও পারে। তার জন্যে আমরা তৈরি। আমরা মরে গিয়ে তাকে সারাজীবন অনুতাপের আগুনে জ্বালিয়ে রেখে যাব। তার নিজের আত্মীয় স্বজনরাই তার নিন্দা করবে। তার দেশের লোক তার জন্যে লজ্জিত হবে। তার দেশের সরকার তার নামটা পর্যন্ত চাপা দেবে। সে নিজেও যে চিরদিন বাঁচবে তা নয়। সেও একদিন মরবে। তার সে মৃত্যু আমাদের মৃত্যুর মতো গৌরবের হবে না। এক ঢিলে এক লক্ষ পাখী মারার যে বাহাদুরি সেই বাহাদুরি নিয়ে সে কতক লোকের কাছে বীরপুরুষ বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রও তাকে ভিক্টোরিয়া ক্রস বা সেই জাতীয় পদক দিয়ে সম্মানিত করবে। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে ঠিক সেই পরিমাণে নেমে যাবে। রাক্ষসের সঙ্গে তার কোনো তফাৎ থাকবে না।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের হাতেও যদি পরমাণবিক অস্ত্র থাকত তোমরা কি এত সহজে ছুঁড়ে ফেলে দিতে রাজী হতে? না তোমরাও পাল্টা আঘাত

করতে? ওদের দেশের এক লক্ষ পাখী মেরে ওদের দুরন্ত করতে? থাকত যদি জাপানীদের হাতেও ও রকম একটা পরমাণবিক বোমা তা হলে হিরোশিমা ও নাগাসাকির প্রতিফল মার্কিনরাও পেতো। হয়তো প্রতিফলের আশঙ্কায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণই করত না। এইবার দেখবে দেশে দেশে পরমাণবিক বোমা তৈরির হিড়িক পড়ে যাবে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর ট্যাঙ্ক তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। স্বাধীন ভারত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লেগে যাবে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টরা সেই লাভজনক ব্যবসায়ে মূলধন খাটাবেন।" মানস অনুমান করে।

সৌম্য তার দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, "মিলিটারিজমের সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজমও এদেশে খুঁটি গাড়বে। যে মুদ্রার এপিঠ মিলিটারিজম সেই মুদ্রারই ওপিঠ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াজিলম। স্বাধীন ভারতের মতিগতি হবে স্বাধীন ইংলণ্ডের মতোই। গান্ধীজীর মিশন শুধু দেশকে স্বাধীন করা নয়, দেশকে একটা পৃথক পথ দেখানো। সেটা যুদ্ধবিরোধিতা, সুতরাং মিলিটারিস্টদের বিরোধিতা। সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টদের বিরোধিতা। কিন্তু স্বাধীনতা যতই নিকটবর্তী হয়ে আসছে মিলিটারির উপর নির্ভরতা ততই বেড়ে যাচ্ছে। আর মিলিটারিকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করার জন্যে কলকারখানার উপর নির্ভরতাও সেই পরিমাণে বেড়ে চলেছে। আমাকে একদিন আমার নিজের দেশের মিলিটারি-ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমপেক্সের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে হবে। সেদিন আমি জুলিকেও সঙ্গে পাব কি-না কে জানে। ও আমাকে ভালোবাসে বলে আমার ব্রতকেও ভালোবাসে এমন কথা বলতে পারব না। আমরা কেউ কারো মতবাদে হস্তক্ষেপ করতে চাইনে।"

ছেলেমেয়েদের তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করতে ছেড়ে দিয়ে দুই বান্ধবীতে বাক্যালাপ চলছিল অন্য এক ঘরে। শেষের কথাগুলো জুলির কানে যায় না।

"ওকে আমি একলা ছাড়তে পারিনে, যুথীদি। ওখানে গেলে ও মিলির পাল্লায় পড়বে। মিলি দেখতে আরো টকটকে হয়েছে।" জুলি বিশ্বাস করে বলে।

"কিন্তু সৌম্যদা তো তোমাকেই বেছে নিয়েছে। মিলির দিকে ও ফিরে তাকাবে কেন? তোমার কি সন্দেহ—" যুথিকা কী যেন বলতে চায়।

"আরে, না, না। ও রকম কিছু নয়।" জুলি তাড়াতাড়ি থামায়।

"সৌম্যকে মুগ্ধ করতে পারে এমন অপ্সরা ভূভারতে নেই। থাকলে অনেকদিন আগেই ওর তপোভঙ্গ হতো। কিন্তু মিলি যে ওকে ভালোবাসে এটা তো নির্জলা সত্য। আমার কাছে অপ্রিয় সত্য। মিলি আর বিলেত ফিরে যেতে চায় না। ও কী বলে, শুনবে?" জুলি গলা খাটো করে।

"কী বলে? প্রাণেশ্বর? হৃদয়বল্লভ?" যূথিকা জুলিকে ক্ষ্যাপায়।

"দূর!" জুলি ক্ষেপে যায়। "সুকুমারদা নাকি স্বপ্নে বলে ওঠে, 'জুলি! জুলি!' তাও একদিন কি দু'দিন নয়। পাঁচবছরে পঁচিশ দিন। কোন্ বৌ এতটা সহ্য করবে? মিলি আমাকে খোঁটা দেয়। আমার নাকি ওকেই বিয়ে করা উচিত ছিল। তা হলে মিলি বিয়ে করতে পারত সৌম্যদাকে। আমি নাকি ওকে বঞ্চিত করেছি। আমার এমন রাগ হয়!"

"রাগ করতে নেই। এর একটা মোক্ষম দাওয়াই আছে।" যূথিকা হাসতে হাসতে বলে, "সুকুমার আবার যখন স্বপ্নে বলে উঠবে, 'জুলি। জুলি।' তখন মিলিও স্বপ্নে বলে উঠবে, 'সৌম্য! সৌম্য!' এমন সুরে বলবে যাতে ওর স্বপ্ন ছুটে যায়। ও স্পষ্ট শুনতে পায়। বুনো ওলের ওষুধ বাঘা তেঁতুল। দেখবে ও আর স্বপ্নে মিলির নাম মুখে আনবে না।

"যাঃ! তোমার সবতাতেই ঠাট্টা! মিলিকে আমি বলতে যাব আমার বরের নাম মুখে ধরতে! স্বপ্নে মহড়া দিতে দিতে বাস্তবেও ধরবে। ও যদি আর বিলেতে ফিরে না যায় সুকুমারদা স্বপ্নে কার নাম বলে ওঠে তা আর শুনতে হবে না। সেপারেশন আপনি হয়ে যাবে। বেচারা সুকুমারদার জন্যে আমার দুঃখ হয়। ও একজনকে হারিয়েছে। আরেকজনকেও হারালে ওর বুক ফেটে যাবে। মিলির উচিত ওর কাছে ফিরে যাওয়া।"

"কান টানলে মাথা আসে। মিলি ফিরে না গেলে সুকুমারও ফিরে আসে। চেষ্টা করলে চাকরি বাকরি এদেশেও মিলবে। শুনছি ইংরেজদের এদেশ থেকে মন উঠে গেছে। মানসের এক বন্ধুকে তাঁর ইংরেজ বন্ধু নাকি বলেছেন, বিশ্বাস করুন, এদেশে আমরা আর একদণ্ডও থাকতে চাইনে, কিন্তু থাকতে বাধ্য হচ্ছি। মাইনরিটিদের প্রতি আমাদের একটা বাধ্যবাধকতা আছে। আমার মনে হয় সুকুমারও এদেশে থেকে যাবে। সেপারেশন হবে না। তোমাকেও যতরকম আবোল তাবোল বকতে হবে না।" যূথিকা একটু কড়া হয়।

"আমি কিন্তু আমার মানুষটিকে একলা ছেড়ে দেব না।" জুলি আবার বলে।

"কক্ষনো ছেড়ে দিয়ো না। চোখে চোখে রেখো। আমি যা পনেরো বছর ধরে করে এসেছি। ছুঁচ যেখানে যাবে সুতো সেখানে যাবে। আশ্রম উঠে আসবে কেন? আশ্রম যেখানে আছে সেখানে থাকবে। সৌম্যদা ওখানে গিয়ে থাকবে। তুমিও আশ্রমের সংলগ্ন কুটিরে গিয়ে থাকবে। শিকড় না গাড়লে কোনো স্থায়ী কাজ হয় না। আমাদের দেখছ তো? কোথাও শিকড় গাড়বার জো নেই। প্রত্যেকটি জায়গায় নতুন করে শুরু করতে হয়। কাজের মাঝখানে বদলীর হুকুম। এই হলো সরকারী চাকরির অভিশাপ। এতে সব চেয়ে কষ্ট ছেলেমেয়েদের। ওরা ওদের সহপাঠী আর খেলার সাথীদের কাছ থেকে বার বার বিচ্ছিন্ন হয়। ছাড়াছাড়ির বেদনা ভুলতে পারে না। আর বাগান? বাগান করেছ কি বদলী হয়েছ। ইংরেজ অফিসার মহলে একটা পরিহাস আছে, বাগান শুরু করো, আর বদলী হয়ে যাও। কী যন্ত্রণা বলো দেখি? তোমাদের এ যন্ত্রণা পোহাতে হবে না। হ্যাঁ, তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে ওদের এইখানেই মানুষ করবে। বেড়ালছানার মতো ঠাঁইবদল করবে না। এসব কথা মনে রেখো।" যূথিকা উপদেশ দেয়।

ওদিকে মানস বলছে সৌম্যকে, "তুমি যেমন নীতিগতভাবে শস্ত্রবিরোধী আমিও তেমনি শাস্ত্রবিরোধী। শাস্ত্রের দাপট সহ্য করতে না পেরে কত হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে! হতে হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দাবী করছে পাকিস্তান। বাকী আছে যারা তারাও ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। এ যুগের চাঁদ হলো 'কাস্তে'। মার্কসবাদই এ যুগের ইসলাম।"

সৌম্য হেসে বলে, "মুসলমানদেরও শাস্ত্র আছে, তারও দাপট আছে। আর কমিউনিস্টদেরও কি শাস্ত্র নেই? তারও কি দাপট নেই? মানুষ এক শাস্ত্রের খর্পর থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেক শাস্ত্রের খর্পরে পড়েছে। আমরা গান্ধীশিষ্যরা নতুন কোনো শাস্ত্র প্রচার করিনে। পুরনো শাস্ত্রেরই নতুন ব্যাখ্যা দিই। এই যে হরিজন আন্দোলন চলেছে সেটাও নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে। ওরা অস্পৃশ্য নয়, কারণ ওরা হরিজন। যেমন বৈষ্ণবজন। বৈষ্ণবজনের আবার জাত বিজাত কী? সমাজ মানুষকে নানা ভাগে বিভক্ত করে। ভগবান তা করেন না। ব্রহ্মার নামে শাস্ত্র যা চালিয়েছে তা যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়ে থাকে তো ব্রাহ্মণদেরই বানানো। ব্রাহ্মণরা মাথাও নয়, ক্ষত্রিয়রা বাহুও নয়, বৈশ্যরা উরুও নয়, শূদ্রেরা পা-ও নয়। তাতেও অস্পৃশ্যতার ব্যাখ্যা হয় না। পা থেকে

যদি কায়স্থরা হয়ে থাকে, নবশাখরা হয়ে থাকে, কই, তারা তো কেউ অস্পৃশ্য নয়? অস্পৃশ্যরা তা হলে এল কোথা থেকে? যুদ্ধে পরাজয় বা সেইরকম কোনো দুর্বিপাক থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রাও শ্বেতাঙ্গদের কাছে অস্পৃশ্য।"

"তোমরা শাস্ত্রকে বর্জন করবে না, সে সাহস তোমাদের নেই। শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা করবে না, সে সাহসও তোমাদের নেই। শাস্ত্রের বাক্য অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থ পরিবর্তন করবে, এইপর্যন্ত তোমাদের দৌড়। তোমরাও সনাতন হিন্দু, তবে সনাতন ঠিক পুরাতন নয়। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমিও চাইনে, তার সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে আমিও চাই, কিন্তু এ যা হচ্ছে তা পুরনো এমারতের এখানে ওখানে একটুআধটু মেরামত করে বাইরের চুনকাম ফেরানো। হরিজন বা বৈষ্ণবজন তো সকলেই, তুমিও, আমিও। ভগবান যদি মানি তো আমরা সবাই ভগবানের লোক। তা হলে শুধু ওই কয়েকটি জাতের মানুষকে হরিজন বলে চিহ্নিত করা কেন? বর্ণগর্বিতরা একভাবে যাদের চিহ্নিত করছে তোমরাও তাদের অন্যভাবে চিহ্নিত করছ শুধু নামটা আরো মোলায়েম শোনাচ্ছে। পেশা যেমনকে তেমন থাকবে, স্টেটাস যেমনকে তেমন থাকবে, শুধু ছোঁওয়াছুঁইর বালাই থাকবে না। চণ্ডাল ব্রাহ্মণের পা ছুঁতে পারবে।" মানস ঠেস দিয়ে বলে।

"সেবাগ্রামের আশ্রমে তো আজকাল ব্রাহ্মণীর সঙ্গে হরিজনের বিবাহও দেওয়া হচ্ছে। বিবাহের পর হরিজন ব্রাহ্মণীর গা ছুঁতেও পারবে। এটা কি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়?" সৌম্য জিজ্ঞাসা করে।

"কিন্তু ব্রাহ্মণ হরিজন ভেদ তো গেল না।" মানস উত্তর দেয়।

"যাবে। বাপুর আদর্শ কাস্টলেস সোসাইটি। জাতিভেদশূন্য সমাজ। সেই আদর্শের দিকেই তিনি ধীরে ধীরে চলেছেন। এত ধীরে যে তোমরা টের পাচ্ছ না। এটাও একপ্রকার সমাজবিপ্লব। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের অনুমোদন আছে। প্রতিলোমের নেই। তবে দুটো একটা নজির পাওয়া যায়। আমরা প্রতিলোমটাকে জলচল করে দিচ্ছি। অনুলোমেও উৎসাহ দিচ্ছি। তুমি কি মনে কর মনুসংহিতাকে প্রকাশ্যে খারিজ করলে ফল এর চেয়ে ভালো হবে? না সবাইকে ব্রাহ্ম দীক্ষা দিতে হবে?" সৌম্য চেপে ধরে।

"আরে, না, না। ব্রাহ্ম দীক্ষা আমিও নিইনি। আমরা কেউ কারো

ধর্মবিশ্বাস বদলাইনি বা ছাড়িনি। কিন্তু আমরাও জানিনে ছেলেমেয়েরা কী বলে পরিচয় দেবে। শুধুমাত্র হিন্দু, না কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ। এর চেয়ে ব্রাহ্ম অনেক সোজা। ব্রাহ্মণ হরিজন বিবাহের সন্তানদের বেলা পরিচয় দেওয়া আরো শক্ত হবে। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বোষ্টম বলে একটি জাতের প্রবর্তন হয়েছে। ধর্ম সম্প্রদায় থেকে জাত। গান্ধীজীও হয়তো তেমনি একটি জাত প্রবর্তন করে যাচ্ছেন না তো?" মানস সংশয়ান্বিত।

"না, না। নতুন একটা জাত তাঁর অম্বিষ্ট নয়। বিয়ে যারা করছে তারা কেউ কারো জাতের পরিচয় দিচ্ছে না। তাদের সন্তানরাও দেবে না। তারা হিন্দু, তারা ভারতীয়। তারা মানুষ। এ ভাবেও পবিচয় দেওয়া যায়। মুসলমান বা খ্রীস্টানদের তো তার চেয়ে বেশী কিছু বলতে হয় না। হরিজনদেরও আমরা শেখাব হরিজন বলে পরিচয় না দিতে। নয়তো একটা হীনম্মন্যতা থেকে যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পেশা বদল করা সহজ নয়। মুসলমান হয়েও, খ্রীস্টান হয়েও যারা পেশা বদল করেনি তারা চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও তাঁতীরা মোমিন নাম নিয়েছে। জেলেরা ধাওয়া বলে পরিচয় দেয়। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ খ্রীস্টান ও অব্রাহ্মণ খ্রীস্টানে দুস্তর ভেদ। সকলের এক পেশা সম্ভব নয়। আমরা চিন্তিত।" সৌম্য স্বীকার করে।

ওদিকে যুথিকা বলছে জুলিকে, "আশ্রমের জীবন যে রসকষ বর্জিত হবে এমন কী কথা আছে। কই, রবীন্দ্রনাথের আশ্রম তো তেমন নয়। পণ্ডিচেরীতে দিলীপকুমার তো গানের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তুমিও গাইবে, বাজাবে। বোলপুরে আজকাল গ্রামোফোনের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে। চল, তোমাকে একসেট নৃত্যনাট্যের রেকর্ড কিনে দিই। আমার উপহার।"

জুলিকে ইতিমধ্যে শাড়ী উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাই সে রেকর্ড নিতে কুণ্ঠা বোধ করে। যুথিকা ওর আপত্তি কানে তোলে না। ওকে বোলপুরে নিয়ে যায়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' এই ক'টার সেট মজুত ছিল। আরো কয়েকখানা খুচরো রেকর্ডও জুলির জন্যে কেনা হয়। নিজের জন্যেও খান কতক। জুলি টাকা বার করতে গেলে যুথিকা ওর হাত চেপে ধরে। হেসে বলে, "মণির বিয়ের সময় দিয়ো।"

"খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। মণির জন্যেও দু'একখানা রেকর্ড কিনতে হবে।" জুলি খুঁজে বার করে রবীন্দ্রনাথের ও কাজী নজরুলের দু'খানা রেকর্ড। তার একখানা দীপকের জন্যে, একখানা মণিকার জন্যে।

"কাজী নজরুলের রেকর্ড তুমি নিজের জন্যেও কিনতে পারতে, জুলি। তোমার আশ্রমে মুসলমানদের আকর্ষণ করতে হলে নজরুল গীতিকার মতো আর কী আছে? আব্বাসউদ্দীন? হ্যাঁ আব্বাসউদ্দীনেরও খানকয়েক রেকর্ড নিয়ে যেয়ো।" যূথিকা পরামর্শ দেয়। জুলি বেছে বেছে কেনে।

কেনাকাটা সেরে ওরা যখন ফেরে তখন মানস বলে, "কোথায় হারিয়ে গেছলে তোমরা? আমরা তো দিশেহারা।

"জুলির আশ্রমবাসকে সরস করার জন্যে রেকর্ডের সন্ধানে অভিযান। নইলে আশ্রমে ওর মন টিকবে না। সৌম্যদা কি ওকে বেঁধে রাখতে পারবে? নিজে তো শুকনো কাঠ। কঠোপনিষদ্ আওড়াবে।" যূথিকা তার ও জুলির কেনা রেকর্ডগুলো দেখায়।

"এর পরে জুলি চাইবে নাচের রেকর্ড। দেশী নাচের রেকর্ড হয় না। বিলিতী কিনতে হবে। সেকেলে ওয়াল্টজ না একেলে জ্যাজ? বিলিতী নাচ তো পার্টনার না হলে হয় না। পার্টনার হবে কে?" সৌম্য সকৌতুকে সুধায়।

"কেন? তুমি হবে না?" যূথিকা সৌম্যকে খোঁচায়।

"আমি! আমি ওর লাইফ পার্টনার হয়েছি, ডান্স পার্টনার হইনি। এ বয়সে আর মানাবে না, বোন।" সৌম্য আফসোস জানায়।

"তোমার ওই নকল দাড়িগোঁফ খুলে ফেললে দিব্যি মানাবে। তোমার বয়সও দশ বছর কমে যাবে।" যূথিকা আশ্বাস দেয়।

"সৌম্যদা, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। ঘুম থেকে জেগে একদিন আবিষ্কার করবে যে তোমার গোঁফ দাড়ি নির্মূল। জানো তো, জুলি অহিংসা মানে না। অসিধারণের তার আপত্তি নেই। কাঁচি ধারণ বা ক্ষুর ধারণ তো তার কাছে ছেলেখেলা।" মানস ভয় দেখায়।

"তুমি তো আমাকে বিলেতে দেখেছ। তখন কি আমার গোঁফ দাড়ি ছিল? যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে মিশতে হলে এ ছাড়া আর কী উপায় আছে? যেখানে জনগণ বলতে বোঝায় সাধারণত মুসলমান সেখানে তাদের জাগাতে হলে নান্য পন্থাঃ।" সৌম্যর চোখে হাসি।

জুলি এতক্ষণ চুপটি করে শুনছিল। এবার ফিক করে হেসে বলে, "আমার ছেলেবেলায় বেলুচিস্থানে অমন অনেক মুসলমান দেখেছি। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি কেবল মুসলমানই আছে? হিন্দু নেই?"

"ওটাই তো আজকের দিনের সব চেয়ে বড়ো ধাঁধা। বাংলাদেশটাকে যারা বেলুচিস্থানের সঙ্গে জুড়তে চায় তারা কি জানে না যে এখানে হিন্দুও বাস করে? তা হলে কেন বলে পাকিস্তান?" মানস আশ্চর্য হয়।

"ছাখ, সৌম্যদা", যূথিকা যোগ দেয়, "মুসলমানকে বাঙালী বানিয়েছে যে দেশ তাকেই ওরা বানাতে চাইছে দ্বিতীয় এক বেলুচিস্থান। এর পরে ওরা ভাত ছেড়ে লুচি ধরবে।"

"না, না, লুচি নয়। ওই যে বলেছে বেলুচি। ছেলেবেলায় ওখানে তোমরা কী খেতে, জুলি?" মানস জেরা করে।

"অত কি আমার মনে আছে? নান রুটি বোধ হয়। ভাত খেয়েছি কি-না মনে পড়ে না। বাবা যখন বাংলাদেশে বদলী হয়ে আসেন তখন সাহেবিয়ানা ছেড়ে বাঙালিয়ানা ধরেন। তবে ভাত খুব বেশী খেতেন না। একবেলা কয়েক চামচ। রাত্রে চাপাটি। আশ্রমে সেই অভ্যাস বজায় রাখব। সৌম্যও আমাকে আপ রুচি খানার স্বাধীনতা দিয়েছে। আমিও ওকে খানাপিনার স্বাধীনতা দিয়েছি। ওর দাড়ি গোঁফও আমার চক্ষুশূল নয়। কেনই বা হবে? রবীন্দ্রনাথেরও তো দাড়ি গোঁফ ছিল। না থাকলে কি ঋষির মতো দেখাত? আমার কাছে সৌম্য একজন ঋষি কি মুনি। মুসলমানদের কাছে যদি পীর কি ফকির হয় তবে মন্দ কী?" জুলি সগর্বে বলে।

সৌম্যই এ বিতর্ক মিটিয়ে দেয়। "পশ্চিমবঙ্গে থাকলেও আমি দাড়ি রাখতুম। কারণ দেশী ক্ষুরকে আমি ভয় করি। দাড়ি কামাতে বললে হয়তো ছাল উতরে নেবে। আর বিলিতী ক্ষুর তো আমরা বয়কট করেছি। নিরাপদ স্বদেশী ক্ষুর যেদিন বাজারে বেরোবে সেদিন আমি গোঁফ দাড়ি মুড়িয়ে মানসের মতো চিরতরুণ হব।"

যুথিকা ওটাকে গায়ে পেতে নিয়ে বলে, "ঋষিবাক্য কি সত্য না হয়ে যায়? দশবছর বাদে মানসকে দেখে লোকে ভাববে তরুণ আর আমাকে দেখে তরুণস্য বৃদ্ধা ভার্যা। আর নিরাপদ স্বদেশী ক্ষুর যদি তখনো না বেরোয় তবে সৌম্যদাকে দেখে লোকে ভাববে বৃদ্ধ আর জুলি যদি নৃত্য গীতের অনুশীলন করে তবে তাকে দেখে বলবে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।"

জুলি তার গালে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চুমো খায়। "এ মেয়েটা এত মিথ্যে বকতে পারে! দশবছর বাদেও আমি থাকব তরুণী। আমার খুকু ততদিনে মণির মতো বড়ো হয়ে থাকবে।"

মণি কোথায় ছিল, ছুটে এসে বলে, "মা, বাড়ী চল। রেকর্ড বাজিয়ে শুনব।" সারাদিন হৈ চৈ করে ক্লান্ত।

"হ্যাঁ, এইবার বিদায় নিতে ও দিতে হবে, জুলি আর সৌম্যদা। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। তবে বেলুচিস্তানে আমরা আর কোনোদিন যাচ্ছিনে। মানে পূর্ববঙ্গে। দিল্লীতে পড়াশুনা করে উর্দু যেটুকু শিখেছিলুম বাংলাদেশে বাস করে সব বিলকুল ভুলে গেছি। আবার নতুন করে শিখতে এ বুড়ো বয়সে তকলিফ হবে।" যূথিকা ভারাক্রান্ত স্বরে বলে।

গুরুদেবের খাতিরে শান্তিনিকেতনের উপরে মানস ও যূথিকার একটা মায়া ছিল। অবসর নিয়ে সেখানে এসে শিকড় গাড়বার আশায় এক টুকরো জমি কিনে রেখেছিল। সেটা এক বন্ধুপুত্রের নির্বন্ধে। সে বেচারি অকালে মারা যায়. অন্য দিক থেকেও বাধা আসে। তাই ওরা আপাতত ওমুখো হতে চায় না।

জুলি বলে, "কই, তোমাদের কোথায় কী আছে দেখাতে নিয়ে গেলে না যে? কে জানে আমরাও হয়তো একদিন বেলুচিস্তান থেকে এসে জুটব। কিনতে চাইব তোমাদের কাছাকাছি এক রত্তি জমি।"

হিরণ্যদাকে খবর দিতেই তিনি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। "আরে, আপনারা! আসছেন শুনলে আমি আপনাদের জন্যে রতন কুঠিতে ব্যবস্থা করতুম। উঠেছেন কোথায়? থাকা হবে কদ্দিন? একদিন এখানে শাকান্ন ভোজন করতে আপত্তি আছে?"

"না, হিরণ্যদা। সেটা সম্ভব হবে না। এঁরা আমাদের বন্ধু ও বান্ধবী। সৌম্য ও মঞ্জু চৌধুরী। সম্প্রতি বিয়ে করে এখানে মধুমাস কাটাতে এসেছেন। কিন্তু একমাস থাকবেন না, এঁদের নিজেদের আশ্রমে ফিরে যাবেন। সে আশ্রম চলে গান্ধীজীর ধারায়। সেটাকে গুরুদেবের আশ্রমের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় কি-না এঁরা ভেবে দেখছেন। অনেকদিন সাক্ষাৎ হয়নি, তাই আমরাও এসেছি এঁদের সঙ্গে একটা দিন কাটাতে। সৌম্যদার গান্ধীবাদী বন্ধু সুধীর নন্দীর দোতালাটা খালি পড়ে আছে। সেখানেই এঁরা উঠেছেন। আহারাদি যখন যেখানে সুবিধে। আর আমরা তো সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে খাব। দুপুরের টিফিন সঙ্গে করে এনেছিলুম। আপনাকে খবর দিলে আপনারা সাড়ম্বরে ভূরিভোজন করাতেন। তার চেয়ে বড়ো কথা আপনার অফিস কামাই হতো। রবিবার আমার ছুটি, আপনার তা নয়।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

"ছি ছি! আপনি আমাকে এত পর ভাবেন, মানসবাবু। আমার ছেলে-মেয়েরা যে আপনাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। চলুন, ভিতরে চলুন। যুথিকা দেবী, আপনিই আগে। আর আপনারা, সৌম্যবাবু ও মঞ্জু দেবী, আপনারা যে কারা তা আমার জানতে বাকী নেই। এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। ছাত্ররা টের পেলে আপনাদের রক্ষা নেই। ধরে নিয়ে গিয়ে সম্বর্ধনা দেবে। গভর্নমেণ্টকে ওরা ভয় করে না। কর্তাদেরও না। গান্ধীজী কিছুদিন পরে এখানে আসছেন, জানেন নিশ্চয়।'

"আমি তো ওটা গোপনই রেখেছিলুম। আপনি কী করে জানলেন?" সৌম্য অবাক হয়। জুলিও।

"সেবাগ্রামে সোনা থাকে না? আমি যে ওর একটি দাদা। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে।" হিরণ্যবাবু বলেন।

জমি দেখা ছেড়ে গল্পস্বল্পেই সময় কেটে যায়। হিরণ্যবাবু একটি গল্পের ঝুড়ি। যেমন গুরুদেব সম্বন্ধে তেমনি গান্ধীজী সম্বন্ধে তিনি না জানেন এমন কাহিনী নেই। সুভাষচন্দ্রের কাছে গান্ধজীর টেলিগ্রাম শান্তিনিকেতনে যখন পৌঁছয় তিনি ছিলেন সুভাষের সঙ্গে। সুভাষ কী উত্তর দেন তাও তিনি দেখেছিলেন। টেলিগ্রামেই উত্তর।

চা জলখাবার না রীতিমতো নৈশভোজ? বিরজা দেবীর স্বপাক।

"কাকিমা", নোটন জানতে চায় "আপনারা কবে বাড়ী করছেন?"

"তোমার কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করো।" যুথিকা উত্তর দেয়।

মানস বলে, "এই জেলায় আমার দেড় বছর হয়েছে। আরো দেড় বছর তো এ জেলায় আছি। এর মধ্যে মনঃস্থির করলে চলবে। ভাবছি বদলীর হুকুম পেলে আর কোথাও যাব না, পূর্ববঙ্গে তো নয়ই। অকালে অবসরের দরখাস্ত করে দেব। শুনছি আনুপাতিক পেনসন মিলবে। ইউরোপীয়ানরা যদি ক্ষতিপূরণ পায় আমরাই বা পাব না কেন? অবশ্য যদি ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। ক্ষতিপূরণ না পেলে প্রোভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় বাড়ী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। না, আমার যে অন্য কোনো সঞ্চয় নেই। গোটা কতক লাইফ ইনশিওরান্স পলিসি বাদে। সেগুলোর ম্যাচিয়োর হতে অনেক দেরি।"

"দিল্লী দূর অস্ত।" মন্তব্য করেন হিরণ্যদা।

"তার মানে কী হলো, বাবা।" নোটন ভেবে পায় না।

"কংগ্রেস কবে দিল্লী পৌঁছবে, ইংরেজ কবে দিল্লী ছেড়ে যাবে, আই. সি. এস.

অফিসা দের ভাগ্যে কবে ক্ষতিপূরণের শিকে ছিঁড়বে, তার পর বাড়ী তৈরি হবে। ইতিমধ্যে নির্মাণের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।" হিরণ্যদা দুঃখিত।

মুখফোড় বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। কিন্তু কথাটা তো সত্যি।

এমনি করে রাজনীতি এসে পড়ে। সৌম্য বলে, "গান্ধীজীর মনোভাব যতটুকু জানি তিনি শর্তাধীন স্বাধীনতা গ্রহণ করবেন না। তোমাদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া তো একটা শর্ত। এদেশের গরিব করদাতারা তোমাদের হাভীর খোরাক জোগাবে কেন? সেটা যদি জোগাতে হয় ওদেশের করদাতারাই জোগাবে। কংগ্রেস যদি গান্ধীজীর কথা শোনে দিল্লী থেকে দূরেই থাকবে। যতদিন না ইংরেজ বিনা শর্তে স্বাধীনতা দিতে উদ্যোগী হয়। উদ্যোগটা ওদেরই গরজ। ওদেরই তো দায়িত্ব। শুধু যে নির্মাণের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাই নয়, সব কিছুর খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর দরুন আপনি ঘটবে এক বিস্ফোরণ। একটা মিউটিনি কি জেনারল স্ট্রাইক।"

জুলি খেতে খেতে বলে "একটা রেভোলিউশন।"

হিরণ্যদা টিপ্পনী কাটেন, "তার পরের দিন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা।'

জুলির মুখে কথা জোগায় না। সৌম্যও মূক। মানস বলে, "ওয়ার অভ্ সাকসেসন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব।"

বিদায়কালে জুলি একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে। "হিরণ্যবাবু, বললেন না তো সেই দুটি টেলিগ্রামের বয়ান কী ছিল।"

হিরণ্যবাবু স্মরণ করে বলেন, "মহাত্মার টেলিগ্রামের মর্ম ছিল, সুভাষ, তুমি কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্যে নির্বাচনে দাঁড়িয়ো না। আর সুভাষবাবুর টেলিগ্রামের মর্ম ছিল, মহাত্মাজী, আশীর্বাদ করুন আমি যেন নির্বাচনে জয়ী হই। এসব হলো ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকের কথা।"

পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কার কী লাভ! জুলি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, সৌম্য তাকে থামিয়ে দেয়। মোটরে করে ওদের নন্দীদের বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে মানস সপরিবারে স্বস্থানে ফিরে যায়। পথে যেতে যেতে মণি সুধায়, "মাসিমা কেমন করে জ্যাঠাইমা হলেন।" আর দীপক জবাব দেয় "জ্যাঠামশায়েরই মেসোমশায় হওয়া উচিত ছিল।"

॥ নয় ॥

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। একমাস যেতে না যেতে সরকারী চিঠি আসে। বদলীর হুকুম। আবার পূর্ববঙ্গে। বালে তার পদোন্নতি হয়েছে। তিনি আর অপেক্ষা করতে পারছেন না। মানস যেন পত্রপাঠ তাঁকে রিলিভ করে।

"আবার পূর্ববঙ্গে!" যূথিকার মাথায় বাজ পড়ে! "আমার সেই জেলায়! সৌম্যদা আর জুলি যেখানে।" মুখে হাসির আমেজ।

'না, এবার ওর চেয়ে বড়ো জেলা। ওর চেয়ে বড়ো পদ। ওর চেয়ে বেশী দায়িত্ব। খুব সীনিয়র না হলে কাউকে ওখানে পাঠানো হয় না। বোধহয় লোকের অভাব, তা না হলে আমাকে পাঠানো হতো না। ইংরেজরা এখন একে একে সরে যাচ্ছে।" মানসের আন্দাজ।

"কিন্তু তুমি যে বলছিলে এখান থেকে বদলী করলে অবসরের দরখাস্ত করবে।" যূথিকা মনে করিয়ে দেয়।

' কিন্তু এখন নয়, আরো দেড় বছর কি দু'বছর বাদে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এখন শিকেয় ঝুলে রয়েছে। ইউরোপীয়ানরা না পেলে তো আমরা পেতে পারিনে। ওরা পেলে আমাদের একটা ক্লেম হয়, তবে সে ক্লেম গ্রাহ্য হবে কি না কে বলতে পারে! জিন্না সাহেব বাগড়া না দিলে এতদিনে কিন্তু দিল্লীতে বড়লাটের শাসন পরিষদের আমূল পরিবর্তন হতো। এবার তাতে একজনও ইংরেজ থাকতেন না। ডিফেন্সও হস্তান্তরিত হতো। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটারও একটা কিনারা হতো। আমি তো অসময়ে আঁধারে ঝাঁপ দিতে পারিনে। যারা দু'তিন বছর অপেক্ষা করবে তারা ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমি আগে ভাগে গেছি বলে পাব না, এমন কী তাড়া আছে আমার?" মানস খুঁজে পায় না।

"তা হলে তুমি আবার পদ্মা পার হচ্ছ?" যূথিকা খুশি নয়।

"তুমি যদি পদ্মা পার হতে না চাও তোমাকে এ পারেই রেখে যাব। এবার কিন্তু আমাকে তিন বছরের আগে বদলী করবে না। যদি না ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে যায়।" মানস অতটা নিশ্চিত নয়।

"পাগল! তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দিতে পারি? তুমি যেখানে আমি সেখানে। ছুঁচ আর সুতো।" যূথিকা ছায়ার মত অনুগতা।

ভাবনা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে। কিন্তু সরকারী চাকরির দাবী যে

তাদের দাবীর চেয়ে বড়ো। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা তাদের ছেলেমেয়েদের দার্জিলিং-এর মিশনারি স্কুলে পাঠায়। কিংবা কলকাতার হস্টেলে রেখে পড়ায়। মানস ও যুথিকা তাদের সন্তানদের কাছে রাখতে চায় যতদিন না তাদের কলেজে যাবার বয়স হয়।

গভর্নমেণ্টকে লিখে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে নেয় মানস। এরই মধ্যে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁকে অল্প কথায় বোঝায় যে মন্বন্তরের জন্য প্রধানত দায়ী কলকাতার ক্ষুধা ও ক্রয়শক্তি। তিনি বলেন আরো কেউ কেউ একথা তাঁকে জানিয়েছে। তিনি আরো খুঁটিনাটি জানতে চান। মানস যদি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করে তা হলে তিনি আরো সময় দিতে পারবেন।

কলকাতা মানসের পথে পড়ে। গান্ধীজীর একান্ত সচিব প্যারেলালের সঙ্গে কথা বলে দিন স্থির হলো, কিন্তু ক্ষণ স্থির হলো না। কলকাতায় গিয়ে টেলিফোনে জানা গেল ক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে গান্ধীজীর প্রার্তভ্রমণের সময়। বালীগঞ্জ থেকে সোদপুরে গিয়ে শীতকালের ভোর ছ'টার সময় তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে—মানে, ছুটতে ছুটতে—অর্থনীতি আলোচনা করা মানসের পক্ষে অসম্ভব হতো না, কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল যুথিকাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। তাই আবার টেলিফোন করে অন্যসময় চায়। কিন্তু রাজকুমারী অমৃত কওর বলেন, অসম্ভব। কাজেই মানসও অক্ষমতা প্রকাশ করে।

বর্ধন থাকলে মানস সপরিবারে তারই অতিথি হতো। অগত্যা স্বপনদার উপর আতিথেয়তা চাপাতে হয়। তিনি বলেন, "জায়গার টানাটানি নেই। তোমরা দু'খানা ঘর নিতে পারো। কিন্তু কলকাতায় রেশনিং হবার পর থেকে আমরা মহা মুশকিলে পড়েছি। রেশনে যেটুকু দেয় সেটুকুতে আমাদেরই কুলোয় না। বাধ্য হয়ে চোরাবাজারে কিনতে হয়। আমরা কি চোর। ন্যায্য দাম দিয়ে বরাবর কিনেছি, এখনো পারি। কিন্তু সরকার থেকে দর যেমন বেঁধে দিয়েছে পরিমাণও তেমনি বেঁধে দিয়েছে। এখন যার দরকার সে পায় না, যার দরকার নেই সে পায়। তারপর সে কালোবাজারে বেচে। কী করব। বাধ্য হয়ে কিনি।"

মানস বেশ অস্বস্তি বোধ করে। বলে, "আমরা রাতের বেলা ভাত খাইনে। দিনের বেলা খুব কম খাই। তার জন্যে তোমাকে চোরাবাজারে চাল কিনতে হবে না। আমরা রেস্টরাণ্টে গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে আসব।"

দীপিকাদি স্বপনদার উপর চটে যান। বলেন, "এটা তোমার এলাকা নয়, আমার এলাকা। আমিই এ বাড়ির গৃহিণী। আমি অতিথি অভ্যাগতের জন্য রোজ একটু একটু করে যথেষ্ট চাল জমিয়েছি। দুপুরে সবাইকে ভাত পরিবেশন করা হবে। চাইলে রাত্রেও। কালোবাজারে কিনতে হবে না। তবে বাড়ীতে পার্টি থাকলে অন্য কথা।"

"পার্টি তো দিতেই হবে। যূথিকার খাতিরে। যূথিকা এই প্রথম আমাদের বিয়ের পর এল। একটা ভোজ তো ওর পাওনা। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সৌম্যও কলকাতায় এসেছে। ওর সঙ্গে ওর বৌ ক্যারামেলও। ওদিকে ওদের বান্ধবী মধুমালতী ও তার স্বামী সুকুমার দত্তবিশ্বাসও কলকাতায় উপস্থিত। এদের সবাইকে ডাকলে চকোলেটকেও ডাকতে হয়। ওর কমরেড চান্নুই বা বাদ যায় কেন? কী বলো, রানু? টেবিলে ধরবে তো? নয়তো বুফে ডিনার।" স্বপনদার প্রস্তাব।

দীপিকাদি সম্মত। "বুফেই আরো ভালো। ওটাই আজকাল চলতি। যে যার পছন্দমতো খাবার তুলে নিয়ে যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে। ঘুরে ঘুরে খেতে [illegible]রে। বসে বসে খেতে চায় তো সেটাও চলবে, তবে বিনা টেবিলে। যুদ্ধের দৌলতে এসব পার্টি ইনফরমাল হয়েছে। পোশাকের দিক থেকেও তাই। একটার পর একটা যুদ্ধ এসে একটার পর একটা কনভেনশন ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে।'

স্বপনদা ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, "এদিকে খোরাকের রেশনিং পোশাকের রেশনিংও হয়েছে। বিলেতে আজকাল ওয়েস্টকোট কেউ পরে না। কোটই বা পরতে পায় ক'জন? এটা বুশ শার্টের যুগ। অভাবে স্বভাব নষ্ট। নইলে ইংরেজদের মতো ফর্মাল কে? পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে গিয়েও ওরা [illegible] একা ডিনার জ্যাকেট পরে খাবে। খাবে নয়, খেত।"

যূথিকা সবিনয়ে নিবেদন করে, "দেখুন, দিদি, আমার খাতিরে এত বড়ো আয়োজন করতে হবে না। আমি অপ্রতিভ হব। আপনার যেমন একটা নিজস্ব পরিচয় আছে আমার তেমন কিছু নেই। আপনি একজন বিদুষী ও অধ্যাপিকা। আমি বি. এ. পাসও করিনি। স্বামীর পরিচয়েই আমার পরিচয়। কিন্তু তিনিও তো আর চাকরি করতে চান না। শুধু লেখা নিয়ে থাকতে চান। এদেশে লেখকের সম্মান কোথায়? লেখকের স্ত্রীর তো দূরের কথা। আমি যদি নিজে একটা কিছু করতে পারতুম। আমি কি একটি

ব্যক্তি নই? আমার কি ব্যক্তিসত্তা নেই? আমিও কি যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করতে পারিনে? অফিসার শ্রেণীর মহিলারা স্বামীদের মর্যাদার ধার করা আলোকে আলোকিত। আমিও সেইরকম একজন। একজন কেরানীর স্ত্রীও আমার চেয়ে সুযোগ্য। অথচ আমার সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চেষ্টা করি, কিন্তু তলে তলে এমন ঈর্ষাদ্বেষ যে সুযোগ্যদের সহযোগিতা পাইনে! যারা আসে তারা একটা না একটা ফেভার চাইতে আসে। সব রকম বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কিছু না কিছু কাজ করতে পারা যায়, যাতে পাঁচজনের উপকার হয়, কিন্তু বদলীর জ্বালায় কাজ আধখানা হয়ে পড়ে থাকে। জজের কাজ জজের পদাধিকারী চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু জজ গৃহিণীর কাজ পরবর্তী জজগৃহিণীর দ্বারা হবার নয়। এত খারাপ লাগে হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ফেলে আসতে! আমার পিয়ানো বাজানোর শখ ছিল। বিয়ের পর ক্রমাগত বদলী হতে হতে সে শখেও জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। টিউন নষ্ট হয়ে যায়, টিউনার পাওয়া যায় না।"

"সত্যি! এর মতো দুঃখের কথা আর নেই। কত বড়ো একটা বিদ্যা যন্ত্রসঙ্গীত। আমার তো সে বিদ্যা নেই। যার আছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা, ভাই, আপনারা কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন না কেন? এখানে টিউনার পাওয়া যায়। নির্বিঘ্নে বাজাতে পারবেন।" দীপিকাদি সহানুভূতি জানান।

"কলকাতায় বদলী!" যুথিকা ভ্রূভঙ্গী করে বলে, "কলকাতা চাইলে চাটগাঁয় পাঠায়। অন্তত আমাদের অভিজ্ঞতা তাই। 'কলকাতা', 'কলকাতা' করে সবাই পাগল। আমরা কিন্তু মফঃস্বলেই ভালো থাকি। বড়ো বড়ো বাড়ী, বিশাল হাতা, চারদিকে খোলা মেলা জায়গা! বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে সুখ আছে। এখানে তো দম বন্ধ হয়ে আসে।"

দীপক আর মণিকা এল্‌ফকে নিয়ে জমে গেছে। এতদিন পরে সেও দু'জন গুণগ্রাহী পেয়ে খোশ মেজাজে রকমারি খেলা দেখাচ্ছে। মুখে করে নিয়ে আসছে একটার পর একটা জিনিস। জুতো, ছাতা, ঝাঁটা, পেয়ালা, পিরিচ, চামচ। বই, খাতা, পেনসিল, কলম। স্বপনদা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে আসেন। এল্‌ফ খাটের তলায় আশ্রয় নেয়। সেখানে একখানা পুরনো হাড় লুকনো ছিল। সেখানা চিবোয়। তাতে দীপকের তীব্র আপত্তি।

"এল্‌ফ কোন্ জাতের কুকুর, জ্যাঠাইমা?" সে দীপিকাদিকে সুধায়।

"পমেরানিয়ান। পমেরানিয়া এখন রাশিয়ার অধীনে চলে গেছে। বেচারি এল্‌ফ বোধহয় সেইজন্যে আজকাল বিমর্ষ।" দীপিকাদি বলেন।

"তা নয়।" স্বপনদা হাসেন। "ওর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, আমরা ওর জুড়ি খুঁজে পাচ্ছিনে। ও এখন আমার বই খাতা লুটপাট করে বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। দেখি, ওর বৌ যদি কোথাও মেলে।"

ব্ল্যাক আউট উঠে গেছে। কলকাতা এখন আবার আলো ঝলমল। স্বপনদার বাড়ীর জানালাগুলো থেকে কালো পর্দা সরানো হয়েছে, কিন্তু শার্শির কালো রং এখনো মুছে যায়নি। জানালা খোলা রেখে মানস রাস্তার দৃশ্য দেখছিল। স্বপনদা তার পাশে আসন নিয়ে বলেন, "তোমার সঙ্গে কতকাল কথাবার্তা হয়নি। তুমি আজকাল কী লিখছ? কই, কোথাও তো তেমন চোখে পড়ে না।"

"চিত্রকলায় যামিনী রায় যা করছেন সাহিত্যে আমিও সেইরকম কিছু করতে চেষ্টা করছি। রস আছে মাটির ভিতরে। পীপলের অন্তরে। পীপলের সঙ্গে একাত্ম না হলে রসে অনুমগন হতে পারা যাবে না। বিদগ্ধ সাহিত্য তো ঢের হয়েছে। আর কেন?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"যামিনীদার ছবি আমারও ভালো লাগে। কিন্তু তাতে বিংশ শতাব্দীকে পাইনে। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমারও তো একটা অন্তর আছে। সে অন্তরও তো নীরস নয়। আমাকে বাদ দিয়ে পীপল নয়। পীপলের তেমন ব্যাখ্যা সাহিত্যকে একদিন বন্ধ্যা করবে। যেমন করেছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। এর নাটের গুরু অবশ্য টলস্টয়। ফোক আর্ট নিশ্চয়ই ভালো আর্ট। কিন্তু বড়ো আর্ট নয়। পরে আমাদের দেশেও একটা ক্লাসিকাল সাহিত্য ছিল, সেটা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আমাদের দেশের ঘড়ির কাঁটা বহু শতাব্দী ধরে বন্ধ ছিল। ইউরোপের ঘড়ির কাঁটা বন্ধ ছিল না। তাই ওদেশের ঘড়ির সঙ্গে এদেশের ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়েছে। অনেকটা মিলেও গেছে। আমাদের কর্তব্য ওদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টি করা। লোকসাহিত্য তোমার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু নিয়ামক নয়। যামিনীদাকে এ তত্ত্ব বোঝানো যাবে না। তাঁর স্থানজ্ঞান টনটনে, কালজ্ঞান তেমন নয়। অমন করলে ঘড়ির কাঁটা আবার বন্ধ হবে।" স্বপনদা সাবধান করে দেন।

মানসের দৃষ্টি জনগণের উপরে। মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না, তাকে ক্ষুধার অন্নের সঙ্গে সঙ্গে সুধা জোগাতে হবে। নয়তো সে সুরা পান করবে। সুধা কী? যা তার হৃদয়কে স্পন্দিত করে। হৃদয়ের লক্ষ্য ভেদ করে। হৃদয়ে বিঁধে থাকে। সে ভুলতে পারে না। এই যেমন ছড়া, ব্যালাড, রূপকথা, উপকথা। কালের ছাপ তার উপর পড়ে না, তা নয়। কিন্তু সে কালজয়ী। টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা'র অনেকগুলি যেমন।

"কিন্তু পরেও তো তিনি আরো লিখেছিলেন।" স্বপনদা বলেন। "নিজের তত্ত্ব নিজে অনুসরণ করেছিলেন কি? করেননি, কারণ 'রেজারেকশন' ওভাবে লেখা যেত না। ওই ধরনের উপন্যাস রূপকথা বা উপকথা মার্গীয় নয়। ওটাও একটা বলবার মতো কাহিনী। জরুরি। না বললে নয়। যা একমাত্র টলস্টয়ই বলতে পারতেন। জনগণ আজ বুঝতে না পারে কাল বুঝবে। কোনো সৃষ্টিই রসিকের জন্যে অপেক্ষা করে না। রসিক পরে আসে, আবিষ্কার করে, উপভোগ করে। গরম গরম লুচি ভেজে পাতে দিলে পেট ভরে, কিন্তু প্রাণ ভরে না। পীপলকে নিয়ে পপুলার বই কি কম লেখা হচ্ছে? টলস্টয়কে বা রবীন্দ্রনাথকে সে কাজ করতে হবে কেন? তাঁরা লিখবেন 'গোরা'। তুমিও কি তেমনি কোনো বিরাট বিষয়, মহৎ বিষয়, খুঁজে পাচ্ছ না? ওসব চুটকি লিখে যাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করছ ভজন কীর্তনই তারা ভালো বোঝে। তুলসীদাস তার চূড়ান্ত করেছেন। চণ্ডিদাসও।"

মানস জানতে চায় স্বপনদা কী লিখছেন।

"আমি! আমি কী লিখছি!" স্বপনদা হকচকিয়ে যান। "ছাখ, মানু, আমি পপুলার লেখক নই। হতেও চাইনে। আমি নিঃসঙ্গ লেখক। নিঃসঙ্গই থাকতে চাই। যতবার চেষ্টা করি গোষ্ঠী বা গ্রুপ গঠন করতে ততবারই ব্যর্থ হই। এটা প্যারিস নয়। সেখানে 'ট্র্যানজিশন' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে আমিও ছিলুম। কিন্তু সে রকম একটা পত্রিকাও এদেশে হয় না, সে রকম একটা লেখক গোষ্ঠীও না। একক লেখককেই তার নিজস্ব থিয়োরি, তার নিজস্ব মতবাদ তার নিজস্ব ধরনে ও নিজস্ব আঙ্গিকে পরিবেশন করতে হয়। এর জন্যে চাই দারুণ মনের জোর। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস। প্রতিদিন রেওয়াজ। যেমন সঙ্গীতের। আমার কি তেমন মনের জোর আছে? আত্মবিশ্বাসও নড়বড়ে। আর প্রতিদিন রেওয়াজের সময় কোথায়?"

"কিন্তু তোমার তো বলবার মতো কাহিনী ছিল। তুমি যদি না বলে যাও

আর কে বলবে? শিল্পীর কাছে এটা একটা দায়। তুমি দায়মুক্ত হবে কী করে?" মানস চাপ দেয়।

"আমি কাফকা বা জয়েস নই। সেইখানেই আমার দুর্বলতা। নইলে আমার হাতে যে মালমশলা আছে তা দিয়ে কত কী গড়া যায়! না, আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"তুমি যদি লাভাবর্ষণ না করো কেউ বিশ্বাস করবে না যে তুমি একটি জীবিত আগ্নেয়গিরি। ভিসুভিয়াস কি এটনা। একদা তুমি লাভাবর্ষণ করেছিলে এটাই তোমার একমাত্র পরিচয়। তোমাকে সক্রিয় হতে হবে। এদেশে তুমি মনের মতো গোষ্ঠী কোনো দিনই পাবে না। ওদেশের তুলনা এদেশে অচল। ওদেশে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে একটা তত্ত্বকে ঘিরে। যেমন ইমপ্রেসনিস্ট, এক্সপ্রেসনিস্ট, সুররিয়ালিস্ট, এগ্‌জিস্টেনশিয়ালিস্ট। এদেশে তেমন কোনো পরিষ্কার পার্থক্য নেই। লেখকেরা দল বাঁধেন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে। কিংবা রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে। তা বলে তুমি নিষ্ক্রিয় হবে কেন?" মানস তর্ক করে।

"নাটক লিখতে চাই। কিন্তু স্টেজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এদেশে যদি মস্কো আর্ট থিয়াটার থাকত তা হলে আমিও কি চেকভের মতো 'চেরি অরচার্ড' লিখতে পারতুম না? সেটা আমারও একটা প্রিয় বিষয়। মাড়োয়ারিরা বাঙালী জমিদারদের আম বাগান ও গোলাপবাগ কিনে নিচ্ছে। বাগানবাড়ী কিনে নিয়ে কারখানা তৈরি করছে।" স্বপনদা আক্ষেপ করেন।

"তা হলে তো অবশ্যই লিখতে হয় 'বাগানবাড়ী' বলে একটা নাটক। না, 'চেরি অরচার্ডে'র মতো সেন্টিমেণ্টাল হলো না।" মানস ফরমাস দেয়।

স্বপনদা অনেকক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর বলেন, "এই যুদ্ধ আমার সর্বপ্রকার মোহভঙ্গ করে গেছে। মানুষ মরেছে, মানুষ আবার জন্মাবে, বাড়ীঘর ভেঙেছে, বাড়ীঘর আবার গড়ে উঠবে। কিন্তু সেই যুগটাকে তুমি পাবে কোথায় যে যুগে তুমি আমি ইউরোপে ছিলুম? এ যুগে আমি জল বিনা মীন। তুমি কী তা আমি জানিনে। বোধ হয় গান্ধীজীর উপর আশা রেখে নিশ্চিন্তে আছো। ভাবছ গান্ধীই ভারত, ভারতই গান্ধী। ইংরেজ চলে গেলে কী হবে সেটা রঙিন চশমা দিয়ে দেখছ। খোলা চোখে যখন দেখবে তখন মোহমুক্ত হবে।"

"ভারতের ঐক্য বলতে বোঝায় প্রথমত ইংরেজের দেওয়া ঐক্য, দ্বিতীয়ত

গান্ধীজীর দেওয়া ঐক্য। তৃতীয় কোনো ঐক্য নয়। ইংরেজ থাকবে না, সেটা ধরে নিতে পারি। কিন্তু গান্ধীও থাকবেন না, তিনিও সদলবলে বিদায় হবেন, এটা যদি মেনে নিই তো ভারত কি আর এই ভারত থাকবে? বলকানে পরিণত হবে।" মানসের কাছে সেটা একরকম সুনিশ্চিত।

"বলকান হয়েও কি বাংলার ঐক্য থাকবে? যে রকম লক্ষণ দেখছি জিন্না সাহেবের দুই নেশন থিয়োরির হাড়িকাঠে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হবে। জিন্নার কথা হলো তিনি হিন্দুর একাধিপত্য সহ্য করবেন না। আর গান্ধীর একাধিপত্য কি-না হিন্দুর একাধিপত্য। তিনি যদি একটু কম হিন্দু হতেন তা হলে মিটমাটের আশা ছিল। কিন্তু হিন্দুকে তিনি কম হিন্দু হতে, মুসলমানকে কম মুসলমান হতে, শিখকে কম শিখ হতে বলবেন না। অতি মাত্রায় ধর্মপ্রাণ হলে কী হয় তা জার্মানীর ইতিহাসে দেখেছ। ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট মিলে মারামারি করে দেশ ভাগ করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার বলেছিলেন যে সবাই যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে এ সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যায়। সেটাও তো ধর্মীয় সমাধান। সবাই মুসলমান হয়ে গেলেও শিয়া সুন্নীর বিরোধ থাকবে। ধর্মীয় নয়, এমন সমাধান যদি চাও আমেরিকার দিকে তাকাও। আর নয়তো রাশিয়ার দিকে। আমেরিকা ধর্মকে রাজনীতির আসরে নামায় নি। আর রাশিয়া তো গির্জা থেকেও তাড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট না হলে ভারত তার ঐক্য রাখতে পারবে না।" স্বপনদার বিশ্বাস।

"তা না হলে বাংলাই বা তার ঐক্য রাখবে কী করে? হিন্দুর প্রাধান্য মুসলমান সইতে পারে না, মুসলমানের প্রাধান্য হিন্দুর কাছে অসহনীয়। গান্ধীর প্রভাব, কংগ্রেসের প্রভাবও ক্ষীণ। সুভাষের প্রভাবই প্রবল। কমিউনিস্টরাও তলে তলে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। শুনছি তেভাগা না কী যেন একটা ইস্যুতে লড়াই করবে। তা হলেও বাঙালী বাঙালীই। হিন্দু মুসলমান কমিউনিস্ট নির্বিশেষে। কাল সকালে তোমাকে মীর সাহেবের ওখানে নিয়ে যাব।" স্বপনদা প্রস্তাব করেন।

মানস রাজী হয়ে যায়। ওঁর সঙ্গে তার পত্রালাপ ছিল।

"আসুন, আসুন। কবে এলেন?" মীর সাহেব মানসকে স্বাগত করেন।

"কালকেই। এবার বদলীর পথে।" মানস উত্তর দেয়।

"কই, লেখা তো তেমন দেখিনে।" তিনি অনুযোগ করেন।

"পুরনো ধরনে লিখতে চাইনে। নতুন ধরনে লেখার কথা ভাবছি, কিন্তু কাজে দেখাতে পারছিনে। দেশের জন্যেও চিন্তিত।" মানস জানায়।

"চিন্তার কারণ আছে বইকি! জিন্নার নাম বাঙালী মুসলমানরা কেউ কোনোদিন করত না। এখন সকলের মুখে মুখে। হিন্দু আর মুসলমান দুই ধর্ম বলে জানতুম। এখন শুনছি দুই নেশন। শিক্ষিতরাই এ তত্ত্ব প্রচার করে অশিক্ষিতদের মাথা খাচ্ছেন। ইংরেজদের কাছ থেকে এঁরা নাকি গোটা বাংলাদেশটাই এঁদের ভাগে পাবেন। তাও স্বতন্ত্রভাবে নয়। পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে। এঁদের মতে ভারত বিভাজ্য, বাংলাদেশ অবিভাজ্য। এঁরা ভুলে গেছেন যে চল্লিশ বছর আগে ইংরেজরাই বাংলাদেশকে দু'ভাগ করেছিল। একীকরণটা ইংরেজদের ইচ্ছায় হয়নি। হিন্দু মুসলমানের মিলিত ইচ্ছাতেই হয়েছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব সে সময় চালু থাকলে মিলিত ইচ্ছা থাকত না। এই আজগুবি তত্ত্বের ফলে মিলিত ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। বাঙালী বিভক্ত হবে। বাংলা বিভক্ত হবে।" মীর সাহেব অতিথিচর্যা করতে বলেন।

মানস জানতে চায় মীর সাহেব এর বিরুদ্ধে কিছু লিখছেন কিনা। একজন বিশিষ্ট ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে মুসলিম সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া কি তাঁর কর্তব্য নয়?

"লিখছি বইকি। মনে করিয়ে দিচ্ছি বঙ্গভঙ্গের সময়কার কথা। তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িকতাবাদী বহু মুসলমান নেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবী করলেও ঢাকার নবাবের মতো বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন নি। তাঁদের ইস্তাহারে বলেন দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও বাঙালীরা এক নেশন। সুতরাং বাংলাদেশ দু'ভাগ হওয়া উচিত নয়। সেদিন যদি বাঙালীরা এক নেশন না হতো তাহলে কাটা বাংলা অত সহজে জোড়া লাগত না। আর তাতে মুসলমানদেরই মেজরিটি হত না। তোমরা মেজরিটি পেয়েছ, মেজরিটির জোরে সরকার চালাতে পারছ, আপাতত না হলেও কালক্রমে সরকারী চাকরিতেও তোমাদেরই মেজরিটি হবে। মেজরিটি পেয়েও তোমরা সন্তুষ্ট নও। তোমরা চাও টোটালিটি। বাঙালী জাতির হোমল্যাণ্ড হবে মুসলিম জাতির একার হোমল্যাণ্ড। সেখানে অমুসলমান থাকবে না। যেমন মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে অমুসলমান ভোটদাতা থাকে না। গোটা প্রদেশটাই হবে সেপারেট ইলেকটোরেট। শুধু মুসলমানদের জন্যে। তোমরা

ভেবেছ হিন্দুবর্জিত বাংলাদেশে কেবল তোমরা বাঙালী মুসলমানরাই থাকবে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে কোটি কোটি উর্দুভাষী মুসলমানও এসে ভাগ বসাবে। তারাও মুসলিম জাতি বা নেশন। তোমরা তাদের ফেরাতে পারবে না। পাকিস্তান বলতে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ফেডারেশন বোঝায় তো পাঞ্জাবী পাঠান সৈন্যদলও এসে হাজির হবে। মিলিটারি পাওয়ার তো তাদেরই হাতে, তোমাদের হাতে নয়। সিভিল পাওয়ারও যে তোমাদেরই হাতে থাকবে তেমন নিশ্চয়তা কে দেবে? মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ড তো অবাঙালীদের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁরাই চালাবেন। বাংলাদেশ সরকারও তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে চলবে। যাঁরা তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সুখ দুঃখের সাথী, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে তোমরা খাল কেটে কুমীর ডেকে আনতে চাও। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ বাধবে না? তখন কে তোমাদের বাঁচাবে? বাঙালী হিন্দুরাও কি নির্বিবাদে তাদের হোমল্যাণ্ড ছাড়বে? আধখানা কেটে নেবে না?" মীর সাহেব সিগারেট বাড়িয়ে দেন।

"নো, থ্যাঙ্কস। আমি সিগারেট খাইনে।" মানস বলে, "কিন্তু আপনার কথা থেকে মনে হয় আপনার মতে বাঙালীরা একটা নেশন। তা হলে ভারতীয়রা কী? ভারত কি একটা নেশন-স্টেট না একটা নেশন সমবায়?"

"ভারত শাসন আইনে নেশনের কোনো স্বীকৃতি নেই। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যদি ডাকা হয় সেইখানেই এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অবশ্য ইণ্ডিয়ান নেশনকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছে। অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কিন্তু তা করেনি। ভারতীয় মুসলমানরা প্রথমে ভারতীয় না প্রথমে মুসলমান এ প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। জিন্নার মতো যাঁরা কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদের অনেকেই ডিগবাজি খেয়েছেন গান্ধীর উপরে রাগ করে। তিনি আগে ইংরেজদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট না করে আগে মুসলমানদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট করবেন না। জিন্না চান আগে মুসলমানদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট, পরে ইংরেজদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট। এখনো অনেকের ধারণা মুসলমানরা হিন্দু নয় বলে ভারতীয় নয়।" মীর সাহেব হাসেন।

স্বপনদার মৌনভঙ্গ হয়। তিনি সায় দেন। "এইটেই সব কথার সার কথা। ভারতীয় হিন্দুরা আগে হিন্দু কি আগে ভারতীয় এতে কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের আর কোনো হোমল্যাণ্ড নেই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা

যদি ভারতকে আপনার হোমল্যাণ্ড মনে করত তা হলে পাকিস্তানের চিন্তাই তাদের মাথায় আসত না। ভারত হোমল্যাণ্ড নয়, অতএব ভারতের যে অংশটা মুসলিমপ্রধান সেই অংশটাই হোমল্যাণ্ড। সেটা বাংলাদেশ না হয়ে যুক্ত-প্রদেশও হতে পারত। এর মধ্যে জন্মভূমির প্রতি মমতা নেই। আছে সংখ্যার জোরের উপর নির্ভরতা। হিন্দু মুসলমানে গৃহযুদ্ধ বাধলে মুসলিনপ্রধান অঞ্চলগুলিই হবে মুসলিম পক্ষের ঘাঁটি আর হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি হিন্দুপক্ষের ঘাঁটি। একপক্ষ অপর পক্ষকে ঘাঁটিচ্যুত করতে না পারলে ঘাঁটিভাগই হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জার্মানীর ইতিহাসে তিন শতাব্দী পূর্বে এই জিনিসটি ঘটে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট তিন দশক ধরে লড়াই করে এইভাবে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে। তবে মাথার উপরে থাকেন এক নির্বাচিত সম্রাট। তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যতবার সম্রাট নির্বাচন হয় ততবার ক্যাথলিক প্রার্থীই সম্রাট হন। কিন্তু কালক্রমে বলীয়ান হন প্রটেস্টাণ্ট অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির রাজন্যগণ। বন্দোবস্ত ভেঙে যায়। বিসমার্কও সমগ্র জার্মানীকে ঐক্য দিতে পারেন না। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়া ও প্রটেস্টাণ্ট প্রাসিয়া এক নেশন হলেও একাকার হয় না। একজনের জায়গায় দু'জন সম্রাট হন। একজন হাঙ্গেরিসমেত অস্ট্রিয়ার, অন্যজন প্রাসিয়াকে বাড়িয়ে নিয়ে জার্মানীর। এর পরে আসে হিটলারের পালা। তিনি হন একচ্ছত্র অধিনায়ক। এটা কিন্তু সম্ভব হতো না, যদি তিনি ক্যাথলিক বলে পরিচয় দিতেন। তিনি না ক্যাথলিক, না প্রটেস্টাণ্ট। তিনি খ্রীস্টানই নন। তিনি পেগান। কে প্রটেস্টাণ্ট, কে ক্যাথলিক এ ভেদবুদ্ধি ছেড়ে জার্মানরা সবাই না হোক বেশীর ভাগই জড়ো হয় হিটলারের পতাকাতলে। জার্মান ঐক্যের প্রাথমিক শর্ত হয় ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে ওঠা। হিটলারের স্বৈরতান্ত্রিক জোর জুলুমের আমি সমর্থন করিনে, কিন্তু ক্যাথলিক হয়েও প্রটেস্টাণ্টদের প্রিয়তম নেতা একমাত্র তিনিই হয়েছিলেন, কারণ একমাত্র তিনিই জার্মানীকে ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তুলে এক নেশন করতে পেরেছিলেন।"

মীর সাহেব সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, "সর্বনাশ। আপনি হিন্দুকে হিন্দুত্ব আর মুসলমানকে ইসলাম ভুলিয়ে দিতে চান নাকি? পারেন তো হিন্দুকে মুসলমানের সঙ্গে ও মুসলমানকে হিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করুন। কিন্তু হিন্দুকে হিন্দুত্বের থেকে ও মুসলমানকে মুসলমানত্বের থেকে বিযুক্ত করতে পারবেন না, গুপ্ত সাহেব।"

"আমি ধর্ম ত্যাগ করতে কাউকে বলব না, কিন্তু রাষ্ট্রকে বলব সেকুলার হতে। রাষ্ট্র হবে হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষের একতার আর কোনো সূত্র নেই। যদি না সে হয় চির পরাধীন।" স্বপনদা সুনিশ্চিত।

"আপনি দেখছি কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছেন। ওরা ধর্ম মানে না, ঈশ্বর বা আল্লাহ্ মানে না। ওদের রাষ্ট্র সেকুলার।" শিউরে ওঠেন মীর সাহেব।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও সেকুলার। তা বলে ওখানকার লোকজন ধর্মহীন নয়। ঈশ্বরবিশ্বাসহীন নয়। হিন্দু মুসলমানের যদি তাতেও আপত্তি থাকে একদিন কমিউনিস্টরাই সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবে। বাহুবলে, এই যা দুঃখ।" স্বপনদা শেষকথা বলেন।

॥ দশ ॥

একই গাড়ীতে এসেছিল জুলি আর মিলি, মিলির ছেলে রণ, সৌম্য আর সুকুমার। মিলিকে পেছনে ফেলে জুলি এগিয়ে যায়, তার হাত ধরে রণ আর তাদের পথ দেখিয়ে এলফ।

ওদিকে দীপক আর মণি অপেক্ষা করছিল। মণি ছুটে এসে রণকে কেড়ে নেয়। মিলি তা দেখে বলে, "চোরের উপর বাটপাড়ি।"

তখন জুলি যূথিকার কাছে নালিশ করে। "রণ যদি আমাকে বেশী পছন্দ করে সেটা কি আমার অপরাধ?"

যূথিকা রণকে ডেকে বলে, ইংরেজীতে, "কাকে তোমার বেশী পছন্দ। মাকে না মাসীকে?"

রণ একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে বলে, "মাসীকে।"

মিলি শক পাবার ভাণ করে বলে, "বাপ যাকে পছন্দ করে ছেলেও তাকে পছন্দ করে? জুলি কি জাদু জানে?"

সুকুমার তা শুনে বলে, "মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। কে না জানে? কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন? জুলি তো অনেকদিন আমাকে

কিক আউট করেছে। আমি ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে মিলির গোলে ঢুকেছি। লাথি খাবার সে যে জ্বালা তা কি আমি কখনো ভুলতে পারি? মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখি। বলে উঠি, 'জুলি। জুলি। তুমি আমাকে পদাঘাত করলে।' মিলি সবটা শুনতে পায় না, তাই আমাকে ভুল বোঝে।"

যুথিকার শিক্ষা জুলির মনে ছিল। সে মিলির দিকে চোখ টিপে বলে, "মিলিও তো মাঝে মাঝে সুখস্বপ্ন দেখে। বলে ওঠে, 'সৌম্য! সৌম্য! তুমি কবে তোমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে?' কিন্তু স্বপ্ন হলো স্বপ্ন। তা নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। আমি তো কিছু মনে করিনে।"

মিলি কপট কোপ দেখায়। "আমি স্বপ্নে কী বলি না বলি তোর তা জানার কথা নয়। বল, বল, কে তোকে বলেছে?"

"কেন? ওটা কি তোর মনের কথা নয়? অবচেতন মনে যে যা চায় সেইটেই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। যাক, তোর বিয়ে হয়ে গেছে, আমারও বিয়ে হয়েছে। এখন আর ওসব কথা নয়। রণ যা বলেছে তা শুনে তোর মনে কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, রণকে আমি জিজ্ঞাসা করছি। রণ, কাকে তুই বেশী ভালোবাসিস? মাকে না মাসীকে?' জুলি প্রশ্ন করে।

রণ উত্তর দেয়, "মাকে।" প্রশ্ন আর উত্তর ইংরেজীতে।

"সাবাস! এতেই তো প্রমাণ হয়ে গেল ওর বাপও ওর মাকে বেশী ভালোবাসে। বাপকা বেটা। বেটাকা বাপ।" যুথিকা রসিকতা করে।

স্বপনদা সুকুমারকে ধরে নিয়ে যান তাঁর স্টাডিতে। বলেন, "বহুদিন ইউরোপে যাইনি। যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারিনে। বিয়ে করলে মানুষ আর স্বাধীন থাকে না। আমার উনি ইংরেজদের উপর হাড়ে চটা। ওরা নাকি মুসলিম লীগের বকলমে ভারতের উপর অঙ্কুশ রাখতে চায়। তোমার তো লেবার পার্টির হাঁড়ির খবর জানা। তুমি কি মনে করো যাঁহা টোরি তাঁহা লেবার? যাঁহা চার্চিল তাঁহা অ্যাটলী?'

সুকুমার পাইপ টানতে টানতে বলে, "ব্রিটেনে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে, স্বপনদা। লেবার পার্টির রংটা লাল নয়, গোলাপী। তার যে প্রোগ্রাম সেটাও সেই রঙের। এখন থেকে ওয়েলফেয়ার স্টেট। তাতে একজনও নাগরিক বেকার থাকবে না। সবাই কাজ পাবে। এখন থেকে কেউ অচিকিৎসিত থাকবে না, ওষুধপত্রও বিনা খরচে বা নামমাত্র খরচে পাওয়া যাবে। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, ইনশিওরান্স প্রভৃতির উচ্চতম শৃঙ্গগুলি রাষ্ট্র

কর্তৃক অধিকৃত হবে। তাতে সামাজিক নিরাপত্তা বাড়বে। একলম্ফে এর চেয়ে বেশী এগানো যায় না। লেবার পার্টির নেতারা বাস্তববাদী। টোরি দলের দশা এখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লিবারলদের মতো। তাঁদের যুগ গেছে। তাঁরা যে আর কোনোদিন ফিরে আসবেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবে লেবার যদি দুর্বলতা দেখায় তার পক্ষপাতীরা তাকে ভোট না দিতেও পারে। গণতন্ত্রে কেউ চিরন্তন নয়।"

"কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলুম ভারত সম্পর্কে লেবার পলিসি কি একই রকম না আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ?" স্বপনদা জেরা করেন।

"খুবই আশাপ্রদ। লেবার পার্টি এতদিন বিশেষ কিছু করতে পারেনি, কারণ যুদ্ধকালে ওটা ছিল সর্বদলীয় সরকার। চার্চিলই বড়ো কর্তা। অ্যাটলী ছোট কর্তা। ক্রিপস বিফল হয়ে ফিরে গেলেন। দুর্ভাগ্য! আবার তাঁকে পাঠাবার কথা হচ্ছে। এবার যেন তাঁকে বিফল হতে না হয়। ব্রিটেনের সর্বশ্রেণীর রাজনীতিকরা উপলব্ধি করছেন যে সাম্রাজ্য রাখতে হলে তাকে কমনওয়েলথে রূপান্তরিত করতে হবে। কমনওয়েলথে ব্রিটেনেরই প্রাধান্য, কিন্তু কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটেনের হাতের পুতুল নয়। এই যুদ্ধে দেখা গেল আমেরিকার সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার নিকটতর সম্পর্ক। আমেরিকাই তাকে রক্ষা করতে পারে, ব্রিটেন নয়। কানাডার বেলা একথা আরো বেশী প্রযোজ্য। ভারতকে রক্ষা করা যে মোটেই সহজ নয় তা তো জাপানী আক্রমণের সময় প্রমাণিত হলো। ভারতীয়রাই যদি জাপানকে স্বাগত জানাত তা হলে তো ভারতরক্ষা অসম্ভব হতো। সে কাজটা তারা করেনি। কংগ্রেসের আন্দোলন অ্যান্টিব্রিটিশ হলেও প্রো-জাপানীজ ছিল না। কর্তারা তখন বিশ্বাস না করলেও পরে বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেস জাপানকে ডাকেনি, ডাকত না। সরকারের ভার পেলে জাপানকে রুখত। এর থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল যে কংগ্রেস সরকারের ভার পেলে সোভিয়েট রাশিয়াকে ডাকবে না, রুখবে। কংগ্রেস নেতারা বিশ্বাসযোগ্য। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায়। তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। কিন্তু তাই বলে যাঁরা ব্রিটেনের পুরাতন সখা বা সহযোগী তাদের তো পথে বসানো যায় না। পরিস্থিতিটা কতকটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর আয়ারল্যাণ্ডের মতো। আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের হাতে হস্তান্তর ততদূর পর্যন্ত সমীচীন যতদূরপর্যন্ত আলস্টরের প্রটেস্টাণ্টরা সম্মত। ওঁরাও একটা প্রয়োজনীয় পক্ষ। এক্ষেত্রে মুসলীম লীগ।

কংগ্রেস যদি এটা মেনে নেয় তবে ক্ষমতার হস্তান্তর অযথা বিলম্বিত হবে না। কিন্তু গান্ধীজী কি এটা মানবেন? ক্রিপস বা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না। গান্ধী তাঁদের কাছে একটি ধাঁধা। নেহরু তেমন নন। তবে সব চেয়ে মুশকিল জিন্নাকে নিয়ে। এটা তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, তবু তাঁকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। নইলে টোরি সমর্থন পাওয়া যাবে না। চার্চিল বিরূপ হবেন।"

"জিন্না কখনো কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে দেবেন না। আর গান্ধী কখনো দুই উত্তরাধিকারী স্বীকার করবেন না। বৃথা চেষ্টা।" স্বপনদা বলেন "আচ্ছা, গান্ধীকে বাদ দিয়ে কি কংগ্রেসের সঙ্গে আর জিন্নাকে বাদ দিয়ে কি মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট সম্ভব নয়?" সুকুমার আশ্চর্য হয়। "ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কেন এই দুই বৃদ্ধের দ্বারস্থ হতে হবে?"

"এই দুই বৃদ্ধকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড আর লীগ হাইকমাণ্ডকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কেন্দ্রীয় সরকার চালাবেন যাঁরা তাঁরা এঁদেরই মনোনীত সদস্য। কিন্তু একমত হয়ে চালাতে না পারলে স্বদেশী সরকার একবছর কি দু'বছর বাদে ভেঙে যাবে। তখন সেই বড়লাটই নিজের হাতে সরকারের ভার নেবেন। যেমন গভর্নররা নেন কংগ্রেসের মন্ত্রীদের প্রাদেশিক সরকার পরিত্যাগের পর। বিভিন্ন প্রদেশ গভর্নরের শাসন চলেছে ছ'বছর ধরে। তেমনি বড়লাটেরও শাসন চলবে কে জানে ক'বছর ধরে। সেটা অবশ্য স্বদেশী শাসন নয়, তবু অরাজকতার চেয়ে ভালো। বড়লাট যদি গদী ছেড়ে দেন তা হলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে তার সুযোগ নিয়ে জনতা উন্মাদ হবে। নিরীহ নাগরিকদের কে রক্ষা করবে? পুলিশের আনুগত্য কার প্রতি? আর্মির মাথা কে? জঙ্গীলাটও তো থাকবেন না। শূন্যতা পূরণের শক্তি কি একা কংগ্রেসের আছে না একা লীগের আছে? থাকতে পারে দুই পার্টি যদি একজোট হয় তবে সেই জোটের। এই কথাটাই জিন্না সাহেব বলে আসছেন পঁচিশ বছর ধরে। তাঁর মতে হিন্দু মুসলমানের একতাই হচ্ছে স্বরাজ। অর্থাৎ কংগ্রেস লীগ চুক্তিই হচ্ছে স্বরাজ। সে রকম একটা চুক্তি হয়েছিল ১৯১৬ সালে। তারই ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারের আংশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ হয়। এবার যেটা চাই সেটা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। এবার আংশিক নয়, পূর্ণ। গোড়ার দিকে ইংরেজ বড়লাট থাকবেন। পরে বড়লাট নিযুক্ত হবেন কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সুপারিশে। ক্ষমতা বলতে তাঁর বিশেষ

কিছু থাকবে না। যেমন নেই ব্রিটেনের রাজার। প্রায় সমুদয় ক্ষমতাই কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর। বলা বাহুল্য প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেস লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হবে। প্রকৃত ক্ষমতা নির্বাচিত মন্ত্রীদেরই, লাটসাহেবদের নয়। এরই নাম ভারতের স্বাধীনতা তথা ভারতের ঐক্য। পরে রাজন্যরাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে প্রজাপ্রতিনিধি পাঠাবেন। আরো পরে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। বছর পাঁচেক তো লাগবেই। কিন্তু মূল কথা হলো কংগ্রেস লীগ সমঝোতা। তার মানে হিন্দু মুসলিম একতা। সেটা ইংরেজরা উপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারে না। আমাদেরই নিচের দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে। এ কাজ গান্ধী জিন্না ভিন্ন আর কাদের নেতৃত্বে হতে পারে? ত্রিশবছর পূর্বে যে ভূমিকা ছিল টিলক ও জিন্নার তেমনি এক ভূমিকাই এখন গান্ধী ও জিন্নার। না, এঁদের বাদ দেওয়া যায় না। না গান্ধীকে, না জিন্নাকে। বিশুদ্ধ কংগ্রেস শাসন বা বিশুদ্ধ লীগ শাসন কোনোটাই ধোপে টিকবে না। হাত মেলাতেই হবে। যে কোনো সম্মানজনক শর্তে।" স্বপনদা একজন প্রোফেটের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

"কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়।" সুকুমার সংশয় প্রকাশ করে। "ইংরেজর দেওয়া অ্যাওয়ার্ড কি উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য হবে না?"

"হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু সেটা যেন বাপ-মায়ের দেওয়া বিয়ে। ভালোবাসার বিয়ে নয়। টিকে যেতেও পারে। বলা যায় না। কিন্তু না টিকলে কী হবে, জানো তো? সেপারেশন ও ডিভোর্স। পার্টনারশিপ কার্যকর না হলে পার্টিশন বা সিসেসন। সেটা অশুভ চিন্তা।" স্বপনদা জিব কাটেন। টেবিলে হাত ঠেকিয়ে বলেন, "টাচ উড।"

ওদিকে সৌম্যর সঙ্গে মানসের কথাবার্তা। মানস জানতে চায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি-না।

"হয়েছে বইকি। সেইজন্যেই তো কলকাতায় আসা।" সৌম্য জানায়।

"সেই প্রসঙ্গটা তুলেছিলে?" মানস ইঙ্গিত করে।

"কোনটা?" সৌম্য না বোঝার ভাণ করে।

"বিবাহিত ব্রহ্মচর্য।" মানস মুখ ফুটে বলে।

"পনেরো বছর প্রতীক্ষার পর আমরা বিয়ে করেছি শুনে বাপু নরম হন। জুলির মুখ দেখে ওঁর মায়া হয়। আমরা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারিনি শুনে তিনি মৃদু হাসেন। বল্লেন, তোমরা গঠনের কাজ নিয়েই থেকো। তাতেই

দেশের মুক্তি হবে। দেশ মানে তো দেশের গরীব দুঃখী।" সৌম্য বিবরণ দেয়।

"তাহলে তুমি এখন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত।" মানস প্রীত হয়।

"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহের দায় থেকেও মুক্ত। আবার যখন সত্যাগ্রহের দিন আসবে বাপু আমাকে ডাক দেবেন না। সেদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিটিং-এ তিনি যা বলেছেন সদস্যদের মুখে তা শুনে আমার মাথা হেঁট। রেললাইন ওপড়ানো, ট্রেন ডিরেল করা, টেলিগ্রাফের তার কাটা, সাঁকো ওড়ানো, স্টেশন পোড়ানো, থানা দখল, আদালত দখল, কাচারি দখল, জাতীয় সরকার গঠন করে দণ্ডদান প্রভৃতি যা নিয়ে আমাদের গর্ব তা তিনি ভায়োলেন্সের প্রয়োগ বলে না-মঞ্জুর করেন। তবে আমরা যে সেদিনকার পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি এর জন্যে পিঠ চাপড়ে দেন। তার তাৎপর্য কাপুরুষতার চেয়ে ভায়োলেন্স ভালো।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

"তোমার কি ধারণা আবার বড়ো মাপের সত্যাগ্রহের দরকার হবে? তা যদি না হয় তবে ছোট মাপের সত্যাগ্রহে তুমি নাই বা যোগ দিলে। বিয়ে করেছ। সংসারী হয়েছ। এখন স্থিতি চাই।" মানসের মতে।

"নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হলো না তাঁরা সত্যাগ্রহের জন্যে তৈরি থাকছেন। বরং তৈরি হচ্ছেন সাধারণ নির্বাচনের জন্যে। সামনের সাধারণ নির্বাচন যুগান্তকারী হবে। কারণ মুসলিম লীগ মুসলিম নির্বাচকদের কাছে পাকিস্তানের একখানি মনোহর প্রাণচিত্র তুলে ধরবে। গুজরাতী বণিক ঝীণাভাই খোজানীর পুত্র মহম্মদ আলী ঝীণা তাঁর পিতৃনামকেই করেছেন তাঁর পদবী। সেটি এমনভাবে লেখা হয় যাতে ইংরেজের মুখে জিনা আর ভারতীয়ের মুখে জিন্না। এখন মুসলমানের মুখে হয়েছে জিন্নাহ্। শুনলে মনে হবে আরবী ভাষার শব্দ। যেমন আল্লাহ্। ইসলামের খলিফাদের মতো ইহলোকের আদর্শ রাষ্ট্রে নিয়ে যাবেন সবাইকে পাকিস্তানের রাস্তা ধরে। কংগ্রেস এবার বিস্তর মুসলিম ভোট হারাবে। কংগ্রেস যে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টানের ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিনিধি এ দাবী দুর্বল হবে।" সৌম্য চিন্তিত।

"তার ফলে কি কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া ব্যাহত হবে?" মানস শুধায়।

"বোঝাপড়া মানে গিভ অ্যাণ্ড টেক। কংগ্রেস খালি দেবে, লীগ খালি নেবে, এর নাম বোঝাপড়া নয়। লীগকেও কিছু দিতে হবে। তা হলেই কংগ্রেসও কিছু দেবে। পাকিস্তানও বাপু দিতে পারেন, তার বিনিময়ে যদি পান

তিনটি বিষয় পরিচালনার জন্যে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকার।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"সেটা কোথাও ধোপে টেকেনি।" মানস মনে করে অবাস্তব।

পাশের ঘরে যূথিকা সুধায় মধুমালতীকে, "এটা কি ঠিক যে তুমি আর বিলেতে ফিরে যেতে চাও না? রণকে এ দেশের ছেলে করবে?"

"হ্যাঁ, ভাই। সেইরকমই ভাবছি। কিন্তু ওর বাবার ভিন্ন মত। ওর বাবা লণ্ডনের শহরতলীতে আমার নামে বাড়ী কিনেছে। আমার বাবাও ওর সঙ্গে একমত। আমার বাবা বলেন দেশে এখন গণ্ডগোল চলবে। দুশো বছরের সাম্রাজ্য হঠাৎ ভেঙে গেলে অরাজকতা অনিবার্য। আমরা যে বাংলাদেশে থাকতে পারব তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? মুসলিম লীগ নাকি লোক বিনিময় করবে বলে শাসাচ্ছে। আমাদের ঘর-বাড়ী নাকি দখল করবে বিহারী মুসলমান। আর আমরা নাকি ঘর-বাড়ী পাব বিহারে। কলকাতার ভাগ্য অনিশ্চিত। হয়তো দীপিকাদিদেরও যেতে হবে পাটনায়। পাটনা থেকে কোনো মুসলিম ব্যারিস্টার এসে বসবেন এখানে।" মিলি উত্তর দেয়।

দীপিকাদি পাশের সোফা থেকে শুনতে পেয়ে বলেন, "দেখব এ বাড়ী থেকে আমাকে সরায় কোন গভর্নমেণ্ট। তার আগে স্টেনগান জোগাড় করব।"

"আপনার স্টেনগান কোন্ কাজে লাগবে, দীপিকাদি, গোরা সৈন্যরা যাবার আগে যদি পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে বসিয়ে দিয়ে যায় আর তাদের হাতে কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যাবতীয় মারণাস্ত্র ধরিয়ে দিয়ে যায়? দেখবেন কলকাতা শহর সাতদিনের মধ্যেই তিনভাগ খালি হয়ে যাবে। বাঙালীতে ছেয়ে যাবে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, আর তাদের জায়গা ভরে যাবে অবাঙালী মুসলমানে। কলকাতায় থাকার ইচ্ছে যদি থাকে তবে ভালো ছেলের মতো কমনওয়েলথে যোগ দিতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের এক টুকরো রাখতে পারা যাবে। ফোর্ট উইলিয়ামে শিখ সৈন্য মোতায়েন হবে।" মধুমালতী ভরসা দেয়।

"এরই নাম স্বাধীনতা? ধ্যেত্তেরি!" দীপিকাদি মুখ ফিরিয়ে নেন।

"তা হলে ফোর্ট উইলিয়াম ক্যাপচার করার সংকল্প নাও। বিহার থেকে হিন্দু সৈন্য এসে লড়াই করে দখল নেবে। সত্যিকার স্বাধীনতার মূল্য গৃহযুদ্ধ। রাজী?" মিলিকে দেখে মনে হয় সে সিরিয়াস।

"গৃহযুদ্ধ কেন? বিপ্লব কেন নয়।" বাবলী বলে ওঠে এক কোণ থেকে। "রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। রেডিও স্টেশন, রেল স্টেশন, পোর্ট অধিকার। গভর্নমেণ্ট হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং, লাল বাজারের উপর লাল নিশান। পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্যরাও লাল নিশানের মহিমা বোঝে। ওরা আমাদের দিকেই চলে আসবে।"

মিলির নজর পড়ে জুলির উপরে। "তুই চুপ করে আছিস যে।"

"বিপ্লব যদি অহিংস হয় আমি অংশ নেব, নয় তো নয়।" জুলি উত্তর দেয়।

"সে কী রে! তুই কবে থেকে অহিংসাবাদী হলি?" মিলি বিস্মিত হয়।

"বিয়ের পর থেকে। ও আমার জন্যে ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করেছে। আমি ওর জন্যে হিংসা ত্যাগ করেছি। বাপু আমারও বাপু। কাল দর্শন করে এলুম। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন।" জুলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলি হো হো করে হেসে ওঠে। "ব্রহ্মচর্যত্যাগ একটুও কঠিন নয়। হিংসা ত্যাগ একটুও সহজ নয়। তুই ঠকে গেছিস, জুলি। বোকা মেয়ে।"

যুথিকা জুলির পক্ষ নেয়। "পনেরো বছর অপেক্ষার পর বিয়ে। ওর বিয়েটা ভেঙে গেলে কার কী লাভ? ভেঙে যাবেই ওর বর যদি সত্যাগ্রহী হয় আর ও হত্যাগ্রহী। জুলি ঠকে যাবে তখনি। আশা করি ঠকবে না।"

"না, না। বিয়ে ভেঙে যাবে না। আমি আবার ভায়োলেণ্ট হলে ও আবার ব্রহ্মচারী হবে।" জুলি সরল মনে বলে।

মিলি, যুথী, বাবলী সবাই হেসে ওঠে। দীপিকাদি গম্ভীরভাবে বলেন, "পুরুষের হাতে ওটাও একটা অস্ত্র। ফেমিনিস্টদের জেনে রাখা উচিত।"

হংসো মধ্যে বকো যথা সে ঘরে একমাত্র পুরুষ ছিল চানু। সে পুরুষদের পক্ষ নেয়। "না, দিদি, ওটা একটা অস্ত্র নয়। সবাই কি সৌম্য চৌধুরী?"

ওদিকে সৌম্য বলছিল মানসকে, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে না, ডেস্‌পারেট ডিজিজেস কল ফর ডেস্‌পারেট রেমিডিজ। আমাদের এদেশের ডেস্‌পারেট ডিজিজ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ থাকতে এর মূলোচ্ছেদ হবে না। সুতরাং ইংরেজকেই সর্বাগ্রে উচ্ছেদ করতে হবে। ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাক এটা কেউ চায় না। ওরা গদী ছেড়ে দিক এইটেই গান্ধীজী চান। শূন্যতা পূরণের জন্যে ওরা যদি মুসলিম লীগকে গদীতে বসিয়ে দেয় তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। দুশো বছরের ইংরেজ রাজত্ব যদি হাওয়া হয়ে যায় পাঁচ দশ বছরের মুসলিম লীগ রাজত্বও ধোঁয়া হয়ে যাবে। তবে মুসলিম

মাইনরিটির জন্যে কতকগুলো সেফগার্ড সত্যিই আবশ্যক। ওরা যদি মাইনরিটি স্টেটাসে সন্তুষ্ট হয় তা হলে ওদের জন্যে ও ওদের মতো মাইনরিটিদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হিন্দু মেজরিটিকে তিনি পরামর্শ দেবেন। মেজরিটির উপরেও কড়া নিয়ন্ত্রণ চাই। তা না হলে সেও অত্যাচার করবে। হিন্দুরা যে দেবতা তা নয়। মুসলমানরা যে শয়তান তাও নয়। কিন্তু সম্প্রতি মুসলমানদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ওরা মাইনরিটি স্টেটাস চায় না। চায় মেজরিটি স্টেটাস। সারা ভারতে নয়, ভারতের মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিতে ও সেগুলিকে একত্র করে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রে, যার নাম পাকিস্তান। জিন্না সাহেব দশ বছর আগেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিলেন। এখন তিনি পক্ষপাতী শুধু নন, ঘোর পক্ষপাতী। ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জিন্নার বা মুসলিম লীগের নয়। বরং ঠিক উল্টোটি। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা উদার ছিলেন তাঁরাও হয়ে উঠছেন অনুদার। এক্ষেত্রে ডেসপারেট রেমিডি হচ্ছে ইংরেজের গদীতে জিন্নাকে বসানো। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে সহযোগিতা চাইলে সহযোগিতা পাবেন। দেশের অমঙ্গল তথা হিন্দুর অমঙ্গল করলে পাবেন অহিংস অসহযোগ। যতদিন না অন্তঃপরিবর্তন হয়।"

"ডেসপারেট রেমিডি বলতে কি বোঝায় এমন এক গভর্নমেণ্ট যা ন্যাশনালও নয়, ডেমোক্রাটিকও নয়? দেশের লোক যা চায় তা কেবল বিদেশী শাসনেরই নয়, অগণতান্ত্রিক শাসনেরও অবসান। সারা ভারতের উপর মুসলিম লীগের কতৃত্ব কি হবে গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব? কাদের কাছে ওদের জবাবদিহি? সব নাগরিকের কাছে, না কেবলমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের কাছে? যারা কর দেবে তারা যদি বলে তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা ধার্য না হলে কর দেবে না তা হলে জিন্না সাহেব কেমন করে কর আদায় করবেন? কর আদায় করতে না পারলে সৈন্যদের মাইনে দেবেন কী করে? হিন্দু ও শিখ সৈন্যরা কি বিদ্রোহ করবে না? জিন্না সাহেব একথা জানেন বলেই সারা ভারত চান না, আধখানা ভারত চান। তিনি কনফেডারেশনে রাজী হলে গান্ধীজীও পাকিস্তানে রাজী হবেন, ভারতের ঐক্য বজায় থাকবে। কিন্তু গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে যা হয় তাই হবে। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ভিত্তি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি, ভোটকেন্দ্রে জাতের বিচার বা ধর্মের বিচার নেই। ভারতে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। জাতেরও বিচার আছে, ধর্মেরও বিচার আছে। ফল

হয়েছে এই যে বাংলার মুসলিম মন্ত্রীরা কেবলমাত্র তাঁদের সম্প্রদায়ের নির্বাচকদের কাছেই দায়ী। একই কথা খাটে মুসলমান বাদ দিয়ে আর সব সম্প্রদায়ের 'সাধারণ' নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের বেলায়ও। অর্থাৎ হিন্দুদের বেলায়ও। আইনসভাকে দুটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করলে মন্ত্রীমণ্ডলীকেও দুটি বিচ্ছিন্ন কক্ষে বিভক্ত করতে হয়। লিবারল কনসারভেটিভ হতে পারে, কনসারভেটিভ লিবারল হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান হতে পারে না, মুসলমান হিন্দু হতে পারে না। বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিসমিল্লায় গলদ। এমন একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারা যায় না যার উপর উভয় সম্প্রদায়ের আস্থা আছে। নয়তো একটা গোটা সম্প্রদায়ই বিরোধীপক্ষে পরিণত হয়। বাংলাদেশে তারা হিন্দু, বিহারে তারা মুসলমান। সারা ভারতে যদি কংগ্রেস মেজরিটি শাসনভার পায় তবে সারা ভারতেও বিরোধীপক্ষ হবে মুসলমান? ডেসপারেট রেমিডি হিসাবে মুসলিম লীগকে সারা ভারতের শাসনভার দিলে হিন্দু সম্প্রদায় হবে বিরোধীপক্ষ। সেই সঙ্গে শিখ, খ্রীস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও। এর নাম পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী নয়। এটা একপ্রকার ডেসপটিজম। মোদ্দা কথা ইংরেজরা মোগলদেরই মসনদে বসিয়ে দিয়ে যাবে। তা দেখে মারাঠা, রাজপুত, শিখ বিদ্রোহ করবে। ভারত খণ্ড বিখণ্ড হবে। এটা একটা সমাধানই নয়। এটা একটা এক্সপেরিমেণ্ট। মুসলিম লীগ বিপাকে পড়ে কংগ্রেসকে সাধবে তার সঙ্গে মসনদে বসতে। কিন্তু মেজরিটি হতে দেবে না, নিজেও মাইনরিটি হবে না। ওরকম জোড়াতালি দেওয়া সরকার দু'দিনেই ভেঙে যাবে। তখন কংগ্রেস যদি শাসনভার নেয় লীগ হবে বিরোধীপক্ষ। সেই সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ও। একমুঠো কংগ্রেসী মুসলিম কি মুসলিম বিদ্রোহ ঠেকাতে পারবে? কংগ্রেস সরকার কি অহিংসভাবে বিদ্রোহ দমন করতে পারবে? আবার সেই পদত্যাগ। এবার লীগ মসনদে বসবে না। ইংরেজও না। দেশ আপনা থেকে বলকান হয়ে যাবে।" মানস আশঙ্কা করে।

ওদিকে মিলি বলছিল যুথিকাকে, "ভাই, আমি যদি এদেশে থেকে যাই তো আমার বরও এসে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে বসবে। তখন শুরু হবে আবার জুলির সঙ্গে প্রেম। তাই ভাবছি আবার ওদেশে ফিরে যাব।"

জুলি তখন অন্য ঘরে বাচ্চাদের খাওয়া দেখছে। শুনতে পায় না। যুথিকা বলে, "ভাই, তোমার এ সন্দেহ অমূলক। জুলি এখন ওর বর আর ঘর নিয়ে ভাবে ভোর। ও এখন ওর বরের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিচ্ছে। হিংসা ছেড়েছে,

তবে অহিংসা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ওর অতীতের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুকে গেছে। ওর সাবেক শ্বশুর ওকে মাসোহারা পাঠাতেন, ওর বিয়ের পরেও পাঠাতে ভোলেন নি। ও ফেরৎ দিয়ে মাফ চেয়েছে। সুকুমারদার দিকে ও ফিরেও তাকায় না। তবে তোমাকে ও সন্দেহ করে। সৌম্যদাকে নিয়ে।"

"দূর! আমি ওকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি নাকি? আমিও ওর প্রতিদ্বন্দ্বী নই। কিন্তু সুকুমার যে কিছুতেই জুলিকে ভুলতে পারছে না। বছর বছর স্বপ্ন দেখছে ওকে। স্বপ্নে কথা বলছে। আমার তো সমুদ্রেপথে আসারই কথা। আকাশপথে উড়ে এলুম কেন ছেলেকে নিয়ে? ওর স্বপ্নের জ্বালায়ই তো?" মিলি কবুল করে।

ওদিকে সুকুমার বলছিল স্বপনদাকে, "এই মরা দেশে আপনার মতো জীয়ন্ত সাহিত্যিক পড়ে আছেন কী করতে? এখানে কে আপনাকে চিনবে? চলুন ওদেশে, লিখুন ইংরেজীতে, থাকুন ব্লুমসবেরীর আশেপাশে। পাব-এ আড্ডা দিন। মেম্বার হোন অ্যাথীনিয়াম ক্লাবের। আপনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এদেশ কি বাঁচবে? ইংরেজরা চলে গেলে তাদের পরেই প্লাবন। হিন্দু মুসলমানে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছে একদল টিয়াপাখী। জানে না যে বিপ্লবের প্রথম শর্তই হচ্ছে হিন্দু জনগণের টিকিচ্ছেদ আর তাদের পুরোহিত কুলের উপবীতদাহ। টিকিও থাকবে, পৈতেও থাকবে, সাম্যও হবে, এর মতো আত্মপ্রবঞ্চনা আর নেই। আর মুসলমানরা যদি পণ করে থাকে যে প্রত্যেকটি বালককে সারকামসাইজ করবেই তা হলে হিন্দুদের সঙ্গে ওদের সাম্য কোনোদিনেই হবে না। ওদের বেলা বিপ্লবের প্রথম শর্তই হচ্ছে ত্বক্ছেদন নয়, ত্বক্রক্ষণ। এটা ওরা পেয়েছে ইহুদীদের কাছ থেকে। ইহুদীরা বিপ্লবী হওয়া সত্বেও আদিম সংস্কার ছাড়বে না। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এরা এখন বেখাপ। জার্মানীতে তো বেখাপ ছিলই। জায়নিস্টরা প্যালেস্টাইনে ফিরে যাবার আয়োজন করছে। ওরা ফিরে যাবে দু'হাজার বছর পূর্বে। তুমি আমি বিংশ শতাব্দীর সন্তান, আমরা মনে করি মধ্যযুগের মুসলিম রাষ্ট্রে বা গুপ্তযুগের হিন্দু রাষ্ট্রে বা দু'হাজার বছর পূর্বের ইহুদী রাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে বসবাস করা ভালো।"

স্বপনদা ফরাসী ধরনে দুই কাঁধ তুলে বলেন, "বিবাহের পর কেউ স্বাধীন নয়। তুমিও না আমিও না। এখন আমরা বনের পাখী নই, খাঁচার পাখী।"

ওঁরা নিচে নেমে এসে দেখেন বুফে ডিনার শুরু হয়ে গেছে।

"এই যে চকোলেট! কখন এলে? এই যে কমরেড চান্নু! মস্কোর কী হালচাল? এস, ইণ্ট্রোডিউস করিয়ে দিই। সুকুমার দত্তবিশ্বাস। লণ্ডনের সোশিয়ালিস্ট। কমরেড অপরাজিতা সেন, ওরফে বাবলী, ওরফে চকোলেট। কমরেড প্রণব লাহিড়ী, ওরফে চান্নু। মস্কোর কমিউনিস্ট। সম্প্রতি এঁরা অর্ধেক ইউরোপ, অর্ধেক জার্মানী, আর অর্ধেক বার্লিন জয় করেছেন।" স্বপনদা একটা প্লেট হাতে করে ঘুরে ঘুরে আলাপ করেন।

"বড়ো আনন্দিত আমি দেখে আপনাদের।" সুকুমার ইংরেজী থেকে তর্জমা করে বলে, "আমার হৃৎপিণ্ডটাও লাল। আমি সতেরো আঠারো বছর হলো ব্রিটেনবাসী। ইদানীং বি. বি. সি. তে চাকরি করি। লাল ন্যাকড়াকে জন বুল ডরায়। তবে আমার পার্টির সম্প্রতি জয় হয়েছে। আমি ওদেরই মতো গোলাপী।"

স্বপনদা ওকে সাবধান করে দেন। "এদের সঙ্গে ইয়ার্কি কোরো না, সুকুমার। ইংরেজরা যদি চলে যায় আর হিন্দু মুসলমানে গৃহযুদ্ধ বেধে যায় তবে এরাই ফোর্ট উইলিয়াম ক্যাপচার করবে। লালবাজার তো লাল হয়েই রয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংও লাল। ওদিকে রেড রোডও লাল রঙের নাম বহন করছে। এক এক করে সব কিছু লাল হয়ে যাবে। গভর্নমেণ্ট হাউস, রেডিও স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, শেয়ালদা স্টেশন, এয়ারপোর্ট, রিভার পোর্ট। সবশেষে দিল্লীর লাল কেল্লা। সর্বত্র উড়বে লাল ঝাণ্ডা।"

"কক্ষনো না।" প্রতিবাদ করে জুলি। "লালকেল্লা নেতাজীর লক্ষ্য। আমরাই সেখানে ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়াব। তবে ফোর্ট উইলিয়াম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। সেখানে হয়তো মুসলিম লীগের সবুজ নিশান উড়বে। আমাদের মুসলিম ভাইদের সঙ্গে তো আর আমরা মারামারি করতে পারিনে। লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ।"

দীপিকাদি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "ফোর্ট উইলিয়াম আমরাই জিতে নেব।"

মিলি হাততালি দিয়ে বলে, "আমরাই। আমরাই। আমি দেশেই থেকে যাব। রণও থাকবে। সুকুমার, তুমিই বিলেতে ফিরে যাও।"

যুথিকা রঙ্গ করে, "গো ব্যাক, সাইমন।"

সুকুমার কোণঠাসা হয়ে বলে, "আমি নেহরু বলে একটি ঘোড়ার উপর বাজী রেখেছি। বাজী জিতলে এই দেশেই চাকরি নিয়ে বসে যাব।"

॥ এগারো ॥

ডিনারের পর বিলিতী কেতা মেনে মহিলারা অন্য ঘরে যান। পুরুষরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। স্বপনদা রিফ্রিজেরাটর থেকে একটি বোতল বার করে, বলেন, "বোর্দো। আমার সমবয়সী। বিশ বছর আগে ফ্রান্সে কেনা। আরো তিনটে ছিল, খরচ হয়ে গেছে, এটিই এখন সবে ধন নীলমণি। এরও তো প্রায় শেষ দশা। বিশিষ্ট অতিথি না হলে খুলিনে। সুকুমার আজকের দিনের চীফ গেস্ট।"

তা শুনে সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে পানপাত্র হাতে টোস্ট প্রস্তাব করে। "টু দ্য হেলথ অভ দ্য লাস্ট রোমান্টিক অভ বেঙ্গলী লিটেরেচার, স্বপনমোহন গুপ্ত।"

স্বপনদা তখনো তাঁর পরিবেশন সারা করেন নি। "সৌম্য তো মহাত্মা হতে চলেছে। মানসও আমাদের মতো দুরাত্মা নয়। এই দুর্লভ পানীয় আমি অপাত্রে অপচয় করব না। কমরেড চানু, তুমি তো ভডকা ছাড়া আর কিছু ঠোঁট দিয়ে ছোঁবে না। তোমার জন্যে এখন ভডকা পাই কোথায়? তোমাদের তিনজনকে কফিই দিচ্ছি। কারো আপত্তি আছে?"

সৌম্য আর মানস আপত্তি করে না। চানু স্বপনদার দিকে এমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় যে তাঁর মায়া হয়। তাঁর মনে পড়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি। সার ফিলিপ সিডনীর মতো তিনি নিজের গ্লাসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।"

চানু সঙ্কোচের সঙ্গে তুলে নিয়ে মুখে দেয়। এদিক ওদিক তাকায়। বাবলী দেখছে না তো?

স্বপনদা নিজের জন্যে আরেক গ্লাস ঢেলে চানুর দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার পার্টি তোমাকে নির্ঘাত পার্জ করবে। যদি টের পায় যে তুমি প্রোলিটারিয়ানদের প্রিয় পানীয় ভডকা ছেড়ে বুর্জোয়াদের মতো ক্ল্যারেট ধরেছ। পাবেই, চকোলেট তোমার মুখের গন্ধ থেকে টের পাবে।"

বেচারা চানু বাবলীর ভয়ে তেষ্টা ভুলে যায়। স্বপনদার দয়া হয়। তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন, "প্রাণ ভরে পান করো। ওটুকুতে নেশা হবে না। বাবলী ভালো করেই জানে যে অনেকেই ডুবে ডুবে জল খায়।"

এর পর তাঁর খেয়াল হয় যে টোস্টের উত্তরে কিছু বলতে হয়। "সুকুমার আমাকে যে কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছে আমি তার যোগ্য নই। এই তো মানস রয়েছে। এ কি কম রোমাণ্টিক? চাসুদের দলেও রোমাণ্টিক কবি আছেন। তবে তাঁরা বর্ণচোরা রোমাণ্টিক। আগেকার দিনে প্রেমে পড়ার বয়স হবার আগেই বিয়ে হয়ে যেত। রোমান্সের অবকাশ ছিল না। এখন তো মেয়েরাও ছেলেদের কলেজে যাচ্ছে। কো-এডুকেশনও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। রোমাণ্টিক প্রেমের এই শেষ নয়, শুরু। কার কী মতবাদ সেটা তুচ্ছ। কার কী অনুভূতি সেইটেই আসল। মেয়েরা এখনো নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। যখন পারবে তখন দেখবে রোমাণ্টিকতায় সাহিত্য প্লাবিত হবে। যেমন হয়েছিল ইউরোপে গত শতাব্দীর প্রথম পর্বে। ইউরোপের বিচারে আমিই হয়তো লাস্ট, কিন্তু এদেশের বিচারে তা নই। ধন্যবাদ, সুকুমার। আমিও তোমার স্বাস্থ্য পান করি।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে মানস সুধায় সুকুমারকে, "এত নেতা থাকতে নেহরুর উপর বাজী রেখেছ কেন?"

"কংগ্রেস যেটাকে স্বাধীনতা বলছে সেটা ক্ষমতার হস্তান্তর ছাড়া আর কী? হস্তান্তর যারা করবে তারাই স্থির করবে কার হাতে হস্তান্তর করা যায়। নেহরু হচ্ছেন হ্যারো আর কেমব্রিজে শিক্ষিত। ইংরেজদের কাছে তাঁদেরই একজন। সোশিয়ালিস্টদের কাছেও তেমনি একই পালকের পাখী। বিলেতফের্তা অবশ্য আরো আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই শুধুমাত্র ব্যারিস্টার। এই যেমন গান্ধী, জিন্না, বল্লভভাই, ভুলাভাই, লিয়াকৎ আলী। তাঁদের কারো হাতে ভারতের ভার দিলে ব্রিটেনের সঙ্গে কালচারাল ইউনিটি থাকবে না। জানো তো, আমি ফেবিয়ান সোসাইটির বহুদিনের সভ্য। লেবার গভর্নমেণ্টের কয়েক- নও তাই। আমি ন্যাশনাল লেবার ক্লাবেরও বহুদিনের মেম্বর। ক্লাবে গিয়ে প্রথম কাজ বার থেকে এক পেয়ালা মদ কেনা, কেউ সঙ্গে থাকলে তাকেও কিনে দেওয়া। তারপর লাউঞ্জে বসে মদ হাতে আড্ডা দেওয়া। লেবার পার্টির কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে আলাপ হয়। লেবার গভর্নমেণ্টের রাজা উজীরদের সঙ্গেও পরিচিত হই। ভিতরের খবর জানতে পারি। আসছে, আসছে, অবিলম্বে আরো এক কিস্তি রিফর্মস আসছে। এবার সেণ্টারে। পুরোপুরি ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়েই সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট হবে। পরে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটবে। প্রত্যেক গভর্নমেণ্টের একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেণ্ট থাকেন। ভারতের

বেলা প্রেসিডেন্টের কথা ভাবা যায় না। তা যদি হয় ব্রিটেনের রাজা ভারতেরও রাজা হতে পারেন না। ইংরেজরা সবাই রাজভক্ত। মায় শ্রমিক শ্রেণী। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করার মতো মহাপাপ তাদের দ্বারা হবে না। কিন্তু রাজাকে নামে মাত্র রাজা করতে তাদের বাধে না। কার্যত প্রধানমন্ত্রীই সর্বেসর্বা। তেমন লোক ভারতে নেহরু ভিন্ন আর কে? তবে এর পেছনে একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। মুসলিম লীগকেও সঙ্গে নিতে হবে। তা নইলে টোরি অপোজিশন বাগড়া দেবে। চার্চিল থাকতে মুসলমানদের ডুবিয়ে দেওয়া চলবে না। ওঁর কাছে মুসলমান মানেই লীগপন্থী মুসলমান। কাজেই বেশ কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। কেউ বলতে পারছেন না শেষপর্যন্ত কী হবে। ক্রিপস কী যেন মুসাবিদা করছেন। তাঁর পেট থেকে কিছু বার করা অসম্ভব। তিনি মদ স্পর্শ করেন না। নিরামিষাশী।" সুকুমার একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

স্বপনদা দুই কাঁধ উঁচু করে বলেন, "এ জগতে সব কিছুই অনিশ্চিত, কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত। জিন্নাকে নিয়ে কেউ গভর্নমেণ্ট চালাতে পারবেন না। জিন্নাকে বাদ দিয়েও কেউ গভর্নমেণ্ট চালাতে পারবেন না। জিন্না হচ্ছেন সেই দিল্লীকা লাড্ডু যাকে খেলেও পশ্তাতে হয়, না খেলেও পশ্তাতে হয়। নেহরু যদি গভর্নমেণ্ট গঠনের দায়িত্ব নেন তাঁকেও পশ্তাতে হবে।"

মানস তর্ক করে, "কেন? ইংরেজরা কি পলিসি পরিবর্তন করতে পারে না? সরকার মনোনীত সদস্যদের গোষ্ঠী যদি নিরপেক্ষ থাকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসেরই তো মেজরিটি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি প্রথা অনুসারে যে দলের মেজরিটি সেই দলের দলপতিকেই তো গভর্নমেণ্ট গঠন করতে বলা হয়। আপাতত ভুলাভাই দেশাই করতে পারেন, পরে উপনির্বাচনে জিতে জবাহরলাল করবেন।"

"তা হলে তো জিন্না কোনো দিনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাঁর দল কোনো কালেই মেজরিটি হবে না। সেই জন্যেই তো তিনি পাকিস্তান দাবী করছেন। পাকিস্তান হলে সেখানেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। মুসলিম লীগ হবে মেজরিটি পার্টি। মুসলমান সম্প্রদায় হবে মেজরিটি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়কে নেশন বলা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু তারও নজীর আছে। ইহুদীরাও সেই কথা বলে ইহুদীস্থান দাবী করছে। ইংরেজরা এখন দোমনা। না পারে আরবদের চটাতে, না ইহুদীদের। এক্ষেত্রেও তাই। না পারে হিন্দুদের চটাতে, না মুসলমানদের।" সুকুমার ইংরেজদের পক্ষ নেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সেইজন্যেই বাপু বলেন, তোমরা হয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাও, নয় মুসলিম লীগের হাতে। আর নয় তো কারো হাতে ক্ষমতা না দিয়ে অমনি ভারত ছেড়ে যাও। দিনকতক অরাজকতার পর যে পারে সে গভর্নমেণ্ট গঠন করবে। প্রাদেশিক স্তরে গভর্নমেণ্ট গঠনে কোথাও কংগ্রেস, কোথাও লীগ, কোথাও অন্যান্য দল এগিয়ে আসবে। কেউ বাধা দেবে না। গোলমাল যা হবে তা কেন্দ্রীয় স্তরেই। সেটাও মিটে যাবে, কংগ্রেস যদি জিন্নাকেই প্রধানমন্ত্রীর পদ দেয়। নেহরুকে সবুর করতে হবে।"

"তা হলে আমার বাজী রাখা নিষ্ফল।" সুকুমার হতাশার ভাণ করে।

"ব্রিটিশ কর্তারা জিন্না সাহেবের হাতে একটা ভীটো ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বড়লাটের উপরেও ভীটো প্রয়োগ করে সিমলা বৈঠক বানচাল করলেন। এরপরে সেক্রেটারি অভ স্টেটের উপরেও তাই করবেন। ক্রিপস কেন মিছি-মিছি আসছেন? জিন্নার হাতে ভীটো যতদিন থাকবে গান্ধীজী ততদিন সবুর করবেন। বয়স বাড়তে বাড়তে যদি একশো বছর হয় তা হলেও তিনি ধৈর্য ধরবেন। এমন দিন আসবে যেদিন ব্রিটিশ কর্তারাই অধৈর্য হবেন। সে কথা ভেবে বাপু আর নতুন কোনো আন্দোলনের কথা বলছেন না। তা হলেও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। যদি ডাক আসে তবে সাড়া দিতে হবে। গঠনের কাজই সেই প্রস্তুতি। তবে কংগ্রেস আপাতত নির্বাচনে নামবে ও সফল হলে প্রাদেশিক স্তরে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে।" সৌম্য যতদূর জানে।

মানস তাকে সতর্ক করে দেয়। "জিন্না সাহেব বলেছেন কংগ্রেস যদি আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে ও তাঁর দলকে বখরা না দেয় তবে তিনি তুলকালাম কাণ্ড করবেন। এদিকে আমাদের এখানকার কংগ্রেস নেতারাও প্রত্যাশা করছেন যে এখানকার প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলের তাঁরাও শরিক হবেন। নয়তো তাঁরাও সহ্য করে যাবেন না। কারো কারো মাথায় প্রদেশ ভাগের চিন্তাও ঘুরছে। বাপু কি এসব জানেন না? তাঁর একশো বছর বয়স মানে তো আরো পঁচিশ বছর। কে ততদিন ধৈর্য ধরবে? বাংলা আর পাঞ্জাব তো বিপ্লবীদের লীলাক্ষেত্র।"

"ট্র্যাজেডী ঘনিয়ে আসছে।" স্বপনদা বেদনার স্বরে বলেন, "কর্ম থেকে কর্মফল এটাই তো সাধারণ নিয়ম। কজ্ থেকে এফেক্ট। কিন্তু ইতিহাস পড়লে মনে হয় এফেক্ট আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কজ্ তার দিকে

অনিবার্যভাবে এগোয়। যেমন চুম্বকের টানে লোহা। যুদ্ধ বলো, বিপ্লব বলো, এক একটা চুম্বক। ঘটনার লোহা অপ্রতিরোধ্য গতিতে তার দিকে এগিয়ে যায়। দেশ গৃহযুদ্ধের অভিমুখে চলেছে, আমি নীরব দর্শক।"

"আমি নীরব দর্শক হতে নারাজ।" মানস দৃপ্তকণ্ঠে বলে।

"আমিও কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারি? আমি সত্যাগ্রহী। প্রতিরোধই আমার কর্তব্য। সত্যাগ্রহীর অভিধানে অপ্রতিরোধ্য বলে কোনো শব্দ নেই। মানব ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কতক মানুষ প্রতিরোধ করে আসছে। সহিংসভাবেই বেশী, অহিংসভাবে কম। আজকের দিনে তাদের কর্তব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। গৃহযুদ্ধও তো যুদ্ধ। তার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ চাই। দেশ যে গৃহযুদ্ধের অভিমুখেই অগ্রসর হচ্ছে এর কি কোনো সন্দেহ আছে? মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি। কতরকম আজব তত্ত্বই না শুনছি। মুসলিম লীগ নেতারা বলছেন হিন্দু আর মুসলমান দুই নেশন। যেমন ইংরেজ আর আইরিশ। হিন্দু মহাসভার নেতারা বলছেন হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, আর মুসলমানরা এলিয়েন। যেমন ইংরেজরা এলিয়েন। তফাতের মধ্যে এই যে মুসলমানরা রেসিডেন্ট এলিয়েন। এসব কথা শুনলে কার না গা জ্বালা করে? কে না মারমুখো হয়? হিন্দুস্থানে মুসলমানরা যদি এলিয়েন হয়ে থাকে তবে সেই এলিয়েনদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র স্থাপন করলেই মামলা মেটে। নয়তো মামলায় লড়ো। হামলায় পড়ো। ইংরেজরাই বিচারক হয়ে একটা রোয়েদাদ দিয়ে নিষ্পত্তি করুক। আমরা একটা রোয়েদাদ দেখেছি। আরেকটা দেখতে চাইনে। জানি যে ইংরেজরা অপক্ষপাত নয়। কংগ্রেস তাদের শত্রু, লীগ তাদের মিত্র। শত্রুর চেয়ে মিত্রের দিকেই ওরা ঝুঁকবে। সেটাই স্বাভাবিক। শেষকালে দেখা যাবে হিন্দুর হাতে মুসলমানের কান আর মুসলমানের কানে হিন্দুর কান ধরিয়ে দিয়ে ওরা ক্ষমতার হস্তান্তর করেছে। ক্ষমতা পেয়ে আমাদের প্রথম কাজই হবে কৌরবে পাণ্ডবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কেউ কি অমন একটা কৃত্রিম সীমান্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? বাংলা আর বিহারের মধ্যে কোথায় প্রাকৃতিক সীমান্ত? পাঞ্জাব আর যুক্তপ্রদেশের মধ্যেই বা কোথায়? রোয়েদাদ মেনে নেওয়ার চেয়ে গৃহযুদ্ধই শ্রেয়, কিন্তু সেটাই বা অবশ্যম্ভাবী হবে কেন? একপক্ষ যদি বলে, আমরা যুদ্ধ করব না, তার বদলে সত্যাগ্রহ করব, তোমরা যদি একতরফা যুদ্ধ করতে চাও তো করো, তা হলে তেমন একতরফা যুদ্ধ আপনি থেমে যাবে।

মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে এই কয়েক বছরে হিংসার প্রেস্টিজ, সামরিক শক্তির প্রেস্টিজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। জঙ্গী মনোভাব সর্বত্র। লোকের ধারণা অহিংসা হচ্ছে দুর্বলের অস্ত্র। সবলের অস্ত্র হিংসা। হিন্দুদের মধ্যেও একটা জঙ্গী মনোভাব ব্যাপক। শিখদের মধ্যে তো কথাই নেই। আর মুসলমানদের তো জঙ্গী ঐতিহ্য। আমরা কোন্ পক্ষকেই বা বলব যুদ্ধের বদলে সত্যাগ্রহ করতে? নৈতিক প্রতিরোধ করতে? দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে আমরাই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের মার খেয়ে প্রাণ হারাব।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"এই পাগলের সঙ্গে ক্যারামেলের বিয়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। এখন আর সংশোধনের উপায় নেই। মেয়েটা আবার বিধবা হবে ভাবতেও কষ্ট হয়।" স্বপনদা উত্তেজিত হয়ে বলেন।

"ঘটনার গতি ভালোর দিকেও যেতে পারে। সব চেয়ে খারাপটা আমরা ধরে নেব কেন? ইংরেজরা সকলেই কি লীগের দুই নেশন তত্ত্বের সমর্থক ও পার্টিশনের পক্ষপাতী? লেবার পার্টি সেটা পরিহার করতেই চেষ্টা করছে ও করবে। গৃহযুদ্ধও ইংরেজরা কেউ চায় না।" সুকুমার বিশ্বাস করে।

"দ্যাখ, সুকুমার, ইংরেজরা কী চায় না চায় সেটা তাদের বিদায় মুহূর্তে অবান্তর। ভারতীয়রা কী চায় না চায় সেইটেই বড়ো কথা। ভারতীয়দের অধিকাংশ চায় অবিভক্ত ভারত। কিন্তু আরেক অংশ পণ করেছে কিছুতেই হিন্দুদের আধিপত্য বা প্রাধান্য স্বীকার করবে না। দেশকে দু'ভাগ করে একটা ভাগের উপর মুসলিম আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে। তার জন্যে যদি দরকার হয় গৃহযুদ্ধে নামবে। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা চাই। তৃতীয় পক্ষ যতই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেন কোনো পক্ষের দাবী পুরোপুরি মঞ্জুর করবে না, করতে পারে না। এটা এথিকাল প্রশ্ন নয় যে একপক্ষে ন্যায়, অপর পক্ষে অন্যায়। এটা পলিটিকাল প্রশ্ন। অনুরূপ প্রশ্নে জার্মানী একদা দু'ভাগ হয়েছে। জার্মানী আর অস্ট্রিয়া। নেদারল্যাণ্ডস একদা দু'ভাগ হয়েছে। হলাণ্ড আর বেলজিয়াম। আয়ারল্যাণ্ডও এই শতাব্দীতেই দু'ভাগ হলো। আইরিশ ফ্রী স্টেট আর উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট তো একই ত্রাণকর্তার উপাসক। তাদের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য? হিন্দু আর মুসলমান তাদের তুলনায় অনেক বেশী পৃথক। এই পার্থক্যের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু ভারত

দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবেই। ইংরেজ থাকতেও যা, না থাকতেও তাই। এটাই আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। ইংরেজরা যদি না আসত এইরকমই হতো। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্। আমরা এ নিয়ে কান্নাকাটি করতে পারি, কিন্তু মারামারি করতে গেলে ব্যর্থ হব। বৃথা রক্তক্ষয়। তেমনি একতরফা সত্যাগ্রহ আর আত্মবলিও বৃথা। শহীদ হতে হলে এই ইস্যুতে নয়। অন্য কোনো ইস্যুতে। যার একদিকে ন্যায়, অপর দিকে অন্যায়। তার সময় হয়তো পরে আসবে।" স্বপনদা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন।

"কী যে বলো, স্বপনদা!" মানস স্থির থাকতে পারে না। "তুমি কি ডিফীটিস্ট? মুসলিম লীগের কাছে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে? ওরা কি সব মুসলমানের প্রতিনিধি? তার প্রমাণ কী? সামনের সাধারণ নির্বাচনে জিততে পারবে? পাঠানরা ওদের দিকে নয়, পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট মুসলমানরা ওদের দিকে নয়, বাংলার কৃষক প্রজা মুসলমানরা ওদের দিকে নয়। অথচ ইংরেজরা ধরে নিচ্ছে যে সব মুসলমান ওদের দিকে। এটা ইংরেজদের অন্ধতা। ইচ্ছাকৃত অন্ধতা। নেলসনের মতো কানা চোখে টেলিস্কোপ লাগানো। রোয়েদাদ কখনো নয়। দরকার হলে লড়তে হবে। হিংসা অহিংসা উভয়েরই আশ্রয় নিতে হবে। ফাইট ইট আউট।"

"আমিও বলি রোয়েদাদ কখনো নয়। কিন্তু আমি এটাও বলি, হিংসা কখনো নয়। লড়তে যদি হয় তবে সেটা অহিংস পদ্ধতিতে। অবশ্য এই মুহূর্তে আমরা কেউ তার জন্যে প্রস্তুত নই। ইংরেজদের সঙ্গেও না। লীগপন্থী মুসলমানদের সঙ্গেও না। আমরা মিটমাটের জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করব। যতদিন পারি গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখব। বেধে গেলে মাঝখানে দাঁড়াব। ফলাফল আমাদের হাতে নয়। ভগবানের হাতে।" সৌম্য চোখ বুজে ধ্যান করে।

"তার আগে তোমাদের ক্ষমতার মায়া কাটাতে হবে। ইংরেজদের সর্বান্তঃকরণে বলতে হবে যে তোমরা ক্ষমতা চাও না। ওরা যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাক। নয়তো শূন্যতা সৃষ্টি করে যাক। তার পর যার ইচ্ছে সে ক্ষমতা দখল করুক। কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়। যেটা সম্ভবপর সেটা হচ্ছে এক একটা প্রদেশের ভার এক একটা দলকে দিয়ে যাওয়া। তখন গড়ে উঠবে কংগ্রেসের একটা ফেডারেশন, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য মুসলিম দলের একটা ফেডারেশন, রাজন্যদের একটা ফেডারেশন। পরে হয়তো সকলের সম্মতি নিয়ে কনফেডারেশন গড়ে উঠবে। কিন্তু কোথাও সে ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি, হয়ে

থাকলে হয়েছে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। এদেশে তার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। যতদূর দৃষ্টি যায় ইংরেজ চলে গেলে ঐক্যও চলে যাবে। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে, এফেক্‌ট তেমনি কজ্‌কে টানে। সব নদী যেমন সমুদ্রের পানে ধায় সব কারণ তেমনি বিচ্ছেদের পানে। গান্ধীজী যদি বিচ্ছেদকে মিলনে রূপান্তরিত করতে পারেন তা হলেই ইংরেজ চলে গেলেও ঐক্য বজায় থাকবে। সে আশা আমি রাখিনে। তবে এখনো বিশ্বাস করি যে ভারত ভেঙে গেলেও বাংলা ভেঙে যাবে না। ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ইজ আ লস্ট কজ্, বাট বেঙ্গলী ইউনিটি ইজ নট। কিন্তু কে জানে, সেটাও হয়তো লস্ট কজ্। ট্র্যাজেডীর উপর ট্র্যাজেডী।" স্বপনদার কণ্ঠে বিষাদ।

"তুমি আর একটি ক্যাসাণ্ড্রা।" মানস জ্বলে ওঠে। "কেবল ট্র্যাজেডীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেই জানো। তুমি ডিটারমিনিস্ট, ডিফীটিস্ট, পেসিমিস্ট। তোমাকে হিউমানিস্ট বলে মনে হয় না। হিউমানিস্ট হলে তুমি বলতে ভারতের ঐক্য বহু শতকের বিবর্তনের ফল। বিবর্তনের চাকা মধ্যযুগের দিকে ঘুরতে পারে না। মুসলিম লীগ বাগড়া দিতে পারে, টোরি পার্টি ধাধা দিতে পারে, কিন্তু বিবর্তনের সূত্রে যে ঐক্য এসেছে সেটা ইংরেজ বিদায়ের পরেও আপনার পথ আপনি করে নেবে। গৃহযুদ্ধ অসম্ভব নয়, কিন্তু গৃহযুদ্ধে লিঙ্কনেরই জয় হয়, জেফারসন ডেভিসের নয়। এদেশেও নেহরুর জয় হবে, জিন্নার নয়। বাপুর নাম করছিনে, তিনি তো যুদ্ধবিরোধী। লড়তে হবে নেহরুকেই। কিন্তু হবেই বা কেন গৃহযুদ্ধ? ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী যদি নেহরুকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, বাপু যেমন করেছেন। নইলে যেটা হবে সেটা ওয়ার অভ্ সাকসেসন। কংগ্রেস গোড়ায় বিফল হলেও আখেরে সফল হবে।" মানসের ভবিষ্যদ্বাণী।

"না, ভাই, আমরা যারা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের বিরোধী তারা কখনো গৃহযুদ্ধ বা উত্তরাধিকারের যুদ্ধ সমর্থন করতে পারিনে। তবে অহিংস সংগ্রাম আমরা করতে পারি, যদি উপায়ান্তর না থাকে। কিন্তু সেটা বিদেশী শাসকদের সঙ্গেই, স্বদেশবাসী মুসলমান ভাইদের সঙ্গে নয়। জিন্না সাহেব আমাদেরই এক ভাই, তাঁর অনুগামীরাও আমাদের কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি ভাই। অর্জুনের মতো আমাদেরও দোটানা। সংগ্রাম করব, না করব না? অহিংস সংগ্রামও ক্রমে হিংসার বদলে প্রতিহিংসায় পথভ্রষ্ট হতে পারে। অনায়াসেই পরিণত

হতে পারে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হবেই, আর সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হলে মিলন হবে কী করে? বিচ্ছেদই তো তার অনিবার্য পরিণাম। আমরাই ডেকে আনব পার্টিশন। ভারতেরও, বাংলারও। একযাত্রায় পৃথক ফল হয় না। ঐক্য যাবেই, ঐক্য গেলে স্বাধীনতাও আসবে না। ঐক্য আর স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইংরেজরাই থেকে যাবে। যেতে চাইলেও চারদিক থেকে রব উঠবে, 'তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী।' না, অরাজকতার সামনে দাঁড়াবার মতো শক্তি আমাদের নেই। জাপানী আক্রমণের মুখে যেটা মন্দের ভালো ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মুখে সেটা মন্দ।" সৌম্য সুনিশ্চিত।

ওদিক দীপিকাদির কফির আসরে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মিলি বলছিল জুলিকে, "এই একটা বদ্ অভ্যাস ওদেশে গিয়ে আমি পেয়েছি, কিন্তু আর সবই সদ্ অভ্যাস। অমন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন আমাদের এদেশে কোথায়? আমরা না জানি ঠিক সময়ে খেতে, না ঝি চাকরকে বিরাম দিতে, না বাইরে গিয়ে বাজার করতে, না নিজেরাই বয়ে আনতে। অথচ মুখে বিপ্লবের বুলি। কাজের সময় কাজ, আড্ডার সময় আড্ডা। কাজে ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে ওরা জানে না। কাজের সময় মুখ বুজে কাজ করে যায়, বড়ো জোর একটু আবহাওয়া নিয়ে মন্তব্য করে। আর আমরা? গল্প করতে পারলে আর কিছু চাইনে। যাক, ওসব বলে তোকে বোর করছি না তো? তুই নিজেও তো ওদেশে ছিলি। তোকে নতুন কথা আর শোনাব কী? হ্যাঁ, একটা কথা সত্যি শোনাবার মতো। যুদ্ধকালে ইংরেজদের যে সঙ্ঘবদ্ধতা, যে ডিসিপ্লিন, যে আদেশ বা নির্দেশ মেনে চলা, যে কর্তব্যজ্ঞান তার তুলনা আমাদের দেশে কোথায়? আমরা সবাই রাজা, কেউ কারো অধীনে কাজ করব না। দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নীতিগত কারণে নয়। সেটা একটা মুখোশ। কারণটা ব্যক্তিগত। ইংরেজরা যে আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বা বেশী সাহসী তা আমি মানব না। কিন্তু তারা জানে কেমন করে বিপদ কালে মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে কর্তব্য পালন করতে হয়। ওদের অগ্নিপরীক্ষার প্রহরে আমি ওদের দেখেছি। যাকে বলে ইংলণ্ডের ফাইনেস্ট আওয়ার। যখন নাৎসীরা আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে লণ্ডন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। একজনও ভয় পায়নি, পালায়নি। নাৎসীদের মার খেয়ে অটল থেকেছে বা অকাতরে মরেছে। নাৎসীরা ভেবেছিল ফ্রান্সের

মতো ইংলণ্ডকেও কাবু করবে। জানত না চার্চিল কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর সেই সঙ্গে কৌশলী। মামার দেশ আমেরিকাকে নামিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধে, তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও। যা কেউ কখনো পারত না সোভিয়েট রাশিয়াকেও করেছেন ক্যাপিটালিস্ট ইংলণ্ডের মিতা। ইংরেজরা যে জিতে গেল তার অর্ধেক কারণ তো তাদের ডিপ্লোমেসী। বাকীটা তাদের মনোবল। যাকে বলে মরাল। ছ'বছর ধরে আমি সব দেখেশুনে যা শিখেছি তা হাজার পুঁথি পড়ে শেখা যেত না। না রে, ডিগ্রী আমি পাইনি। ছেলের মা হয়ে পড়াশুনায় মন দেব কী করে? রণই আমার ডিগ্রী।"

জুলি পরিহাস করে বলে, "তোর আর আশা নেই, মিলি। ঝাঁসীর রাণী হওয়া তোর ভাগ্যে নেই। রাণীর তো সন্তান ছিল না। হ্যাঁ, ছিল। তার নাম ঝাঁসী। ফাইনেস্ট আওয়ার ভারতেরও আসবে। বিদ্রোহী সিপাহীরা তোর দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

মিলি পাল্টা দেয়। "তোরও আশা নেই, জুলি। জোন অভ আর্ক হওয়া তোর অদৃষ্টে নেই। তার বদলে হবি কস্তুরবা গান্ধী। সিপাহী বিদ্রোহের দিন তোর কোনো ভূমিকা থাকবে না। ইংরেজরা তোকে ভুলেও ধরবে না, পোড়ানো দূরে থাক। তবে জনতা তোকে দেবী বলে ভক্তি করবে।"

দীপিকাদি ওদের মাঝখানে না বসলে ওরা হয়তো হাতাহাতি করত। তিনি রণকে আদর করতে করতে বলেন, "ততদিনে রণ বড়ো হয়ে থাকবে। ও-ই সিপাহীদের পরিচালনা করবে। সিপাহী বিদ্রোহের ঢের দেরি আছে, মিলি আর জুলি। তার আগে হিন্দু মুসলমানের একজোট হওয়া চাই। তার লক্ষণ কই?

"সত্যি বলেছেন, বৌদি। এ সমস্যা তো ইংলণ্ডে ছিল না। থাকলে ওরাও একজোট হতো কি-না সন্দেহ। নেতাজী সুভাষ জাপানের যুদ্ধবন্দীদের একজোট করতে পেরেছিলেন, সেটা কিন্তু ভারতের বাইরে। দেশে ফিরে এসে তারা আবার বিভক্ত হয়ে গেছে। কতক চলে গেছে মুসলিম শিবিরে। লড়লে তারা লড়বে ইংরেজের সঙ্গে নয়, হিন্দুর সঙ্গে। ভারতের আজাদীর জন্যে নয়, পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে। লক্ষণ শুভ নয়।" মিলি আফসোস করে।

"আমি, ভাই, সিপাহী বিদ্রোহের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়েছি। ওরা মার্সিনারি। যার নিমক খায় তার বিরুদ্ধে লড়বে না, লড়লে ওই চর্বি টর্বি

একটা কোনো অরাজনৈতিক ইস্যুতে লড়বে। আমি নির্ভর করি জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত বিদ্রোহের উপরে। তবে তার জন্যেও চাই দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি। হাতিয়ার হাতে নয়, শুধু হাতে। এমন কোনো ইস্যুতে লড়তে হবে যেটা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে জীবন মরণের ব্যাপার। সেটা ঠিক এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। বাপু আমাদের নেতৃত্ব করে এসেছেন, তিনিই নেতৃত্ব করবেন। তাঁকে তো আমরা আরো পঁচিশ বছর পাচ্ছি। তিনি একশো বছর বয়স অবধি বাঁচবেন। ইতিমধ্যে তাঁর মনের মতো একটা ইস্যু পাওয়া যাবে নিশ্চয়। আমরা অপেক্ষা করব। ক্ষমতার জন্যে যাঁরা লোলুপ তাঁরাই আপসের কথা ভাবছেন। আর আপসের সম্ভাবনা দেখা দিলেই জিন্না তার সুযোগ নেবার জন্যে মুখিয়ে আছেন। কংগ্রেস কিছু পেলে তো লীগও কিছু খাবে। হিন্দুস্থান বলে একটা রাষ্ট্র হলে তো পাকিস্তান বলে একটা রাষ্ট্রও হবে। কিন্তু হিন্দুস্থান হতে দেব না আমরা। পার্টিশন হতে দেবই না। আমরা জাতীয়তাবাদী।" জুলি উদ্দীপ্ত স্বরে বলে।

"ঘটনা তোদের জন্যে অপেক্ষা করবে না, জুলি। অ্যাটলী চার্চিল নন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী। কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে, তাই নিয়ে কথাবার্তা চালাতে চান। তা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে চার্চিল শেষমুহূর্তে জিন্নার মুখ চেয়ে কাঁচিয়ে দিতে পারেন। তখন আমাদের লড়াই না করে উপায় থাকবে না। আর সে লড়াই তোদের বাপুর খাতিরে অহিংস হবে না। কিন্তু আমার বোধহয় ঝাঁসীর রাণী হওয়া চলবে না। রণ কবে বড়ো হবে, ততদিন কি লড়াই বন্ধ থাকবে?" মিলি গালে হাত দিয়ে বসে।

"এবার রোজা লুকসেমবুর্গ কী বলেন শোনা যাক।" দীপিকাদি বাবলীর দিকে তাকান। বাবলীর কোলে এল্ফ ছিল। তার দিকেও।

এল্ফের মুখে একখানা ক্র্যাকার ধরিয়ে দিয়ে বাবলী বলে, "ও কী, বৌদি, আপনিও পরিহাস শুরু করলেন? কার সঙ্গে কার তুলনা! আমি কি রোজা লুকসেমবুর্গের মতো অসাধারণ মনস্বিনী নারী! তবে আজকের ভারতে আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে। আমরাও জনগণের মধ্যে সক্রিয়। দেশ যতদিন না সত্যিকার বিপ্লবের জন্যে তৈরি হয়েছে, বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্যে নয়, ততদিন আমরা মার্ক টাইম করব। তার মানে ছোটখাটো সংগ্রামের পায়চারি। এই যেমন তেভাগা আন্দোলন। আমাকে যে-কোনোদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। গ্রেপ্তার যদি না করে তবে আমার ঠিকানা

অনির্দিষ্ট। এটা ঠিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় বলে অনেক কটু কথা শুনতে হবে। মিলি আর জুলি আমাকে দেশদ্রোহীও বলতে পারে। কিন্তু আপনি যেন বিশ্বাস করেন যে আমাদের লক্ষ্য সত্যিকার বিপ্লব।"

॥ বারো ॥

পরের দিন বিদায় নেবার সময় মানস বলে স্বপনদাকে, "তোমার বাড়ীতে তোমাকেই আমি কাল যা তা বলে অপমান করেছি। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ক্ষমা যদি করো তো নিজ গুণেই করবে।"

"দূর পাগলা! তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে মান অপমানের প্রশ্নই ওঠে না। তুমি এমন কী বলেছ যে আমার মানহানি হবে? তোমার বৌদি তো বলেন আমি একজন প্রচ্ছন্ন মুসলমান। হা হা হা! হাসব না কাঁদব! আরে বাবা, যাদের সঙ্গে দুশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসিনি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসেনি? তেমনি, যাদের সঙ্গে সাতশো বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি তাদের কি কেবল ঘৃণাই করেছি, ভালোবাসিনি? তারাও কি কেবল ঘৃণাই করেছে, ভালোবাসেনি? তুমি আমি রাজনীতির লোক নই, আমরা সাহিত্যিক। অর্ধসত্য নিয়ে আমাদের কারবার নয়। আমরা পূর্ণসত্যের পূজারী। পূর্ণ সত্যটা এই যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র শাসিক শাসিতের নয়। কিংবা শুধুমাত্র শোষক শোষিতের নয়। ওরা এদেশ থেকে মহাপ্রস্থান করলেও একই পৃথিবীতেই বাস করবে। ওদের সঙ্গে মিত্র সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ঘৃণার চেয়ে বলবান হবে প্রেম। প্রেমই ওদের আপন করবে। আপন করবে আমাদেরও। আমি যদি সুদীর্ঘ অতীতের চেয়ে সুদীর্ঘতর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করি তবে আমি একজন প্রচ্ছন্ন ইংরেজ হইনে, হই একজন প্রকৃত ভারতীয়। একই কথা খাটে মুসলমানদের বেলাও। ওরাও ভাবগতিক দেখে মহাপ্রস্থানের তালে আছে। কিন্তু আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ায় নয়। ভারতেরই একটা ভাগ কেটে নিয়ে সেই ভাগটাকে আস্ত একটা রাষ্ট্রের আকার দিয়ে সেই আজব স্থানে। যার আনকোরা নাম পাকিস্তান। আদমের পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়ার সৃষ্টি।

খ্রীস্টানরা যাকে বলে ইভ। আমাদের পাঁজরের একখানা হাড় কেটে নিলে আমাদের কষ্ট হবে বইকি। আদমেরও হয়েছিল। কিন্তু পরে তার থেকেই তো আসে মধুর রস। এবারেও তাই হবে। ওরাও আমাদের আপন হবে, আমরাও ওদের আপন। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। তবে একটু আধটু ফ্লার্ট করবে বইকি পরনারী বা পরপুরুষের সঙ্গে। এক যেখানে দুই হয়েছে সেখানেই এই রঙ্গ। আর এইজন্যেই তো স্বাধীনতা। আমরা কেন ধরে নেব যে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের চিরশত্রু হবে? না, হিন্দুস্থান নামটা আমি পছন্দ করিনে। ইণ্ডিয়া কী দোষ করল? ভারতের কী দোষ? বিনা দোষে ওদের তালাক দিতে নেই।"

মানস আশ্চর্য হয়। "বাংলাদেশ তা হলে পাকিস্তানে যাচ্ছে! তুমিও যাচ্ছ সেই সুবাদে! ভারতের হয়ে কথা বলার এক্তার তো তোমার নয়।"

"না, না, বাংলাদেশ পাকিস্তানে না যেতেও পারে। সে একাই একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারে। এই অপশনটা তাকে দিতে হবে। আমরা বাঙালীরা হচ্ছি ভারতবর্ষের ফরাসী। ফ্রান্স যেমন অবিভাজ্য বাংলাদেশও তেমনি। বিপ্লব আমাদের রক্তে। হিন্দু মুসলমানের লড়াই আমাদের বিপ্লব ভুলিয়ে দেবে। কলকাতা আমাদের প্যারিস্। এখানেও যদি ওখানকার মতো ধর্মের জন্যে সেণ্ট বার্থলোমিউজ্ ডে ম্যাসাকার হয় তবে সব মাটি। বাংলাদেশও ভাগ হয়ে যাবে।" স্বপনদা অন্য দু'এক কথার পরে বলেন "Au revoir!" পুনর্দর্শনায় চ।

ট্রেনের কামরায় মানসরা চারজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। গুছিয়ে বসে যূথিকা সুধায় মানসকে, "তোমাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন? পূব বাংলায় ফিরতে তুমি চাওনি, তবু যেতে হচ্ছে। এইজন্যেই কি?"

"না, জুঁই। তা নয়। পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূব বাংলাই আমি পছন্দ করি। কিন্তু এই ছ'বছরে একটা ব্রেক হয়ে গেছে। জোড় মেলাতে সময় লাগবে। সেসব পরের কথা। যা নিয়ে আমি চিন্তিত তা স্বপনদার সঙ্গেও আমার ব্রেক ঠিক নয়, তবে পায়ে পা মিলছে না।"

"তাই নাকি? ব্যাপার কী?" যূথিকা বিচলিত হয়।

"স্বপনদা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন! যা হবার তা হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর আমি যদি মনে করি সেটা ভুল পদক্ষেপ আমার তো কর্তব্য সেটা নিবারণ করা। তা না করলে পরের পদক্ষেপগুলোও

ভুল পদক্ষেপ হবে। তখন নিবারণ করা আরো কঠিন হবে। স্বপনদার কী? ঐতিহাসিক নিয়তি বা গ্রীক ট্র্যাজেডী বলেই তিনি সব সহ্য করবেন। আর আমি ইমপোটেণ্ট হয়ে ছটফট করব। আমাদের দুই বন্ধুর সম্পর্কে চিড় ধরেছে, জুঁই।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী? খুলে বলছ না কেন?" যূথিকা কৌতূহলী হয়।

"আহা, ধৈর্য ধরো। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে ইংরেজরা চলে গেলে ভারত কি আস্ত থাকবে, না ভাগ হয়ে যাবে? স্বপনদা ধরে নিয়েছেন যে দেশটা ভাগ হয়ে যাবে, সেটাই নাকি ভারতের নিয়তি। কিন্তু বাংলাদেশের বেলা আরো একটা অপশন আছে। বাংলাদেশ হতে পারে তৃতীয় এক স্বাধীন রাষ্ট্র। কারণ আমরাই এদেশের ফরাসী, ফ্রান্সের মতো বাংলাদেশও অবিভাজ্য। আর বিপ্লব নাকি আমাদের রক্তে। তবে তিনি আশঙ্কা করেন যে কলকাতায় যদি প্যারিসের মতো সেণ্ট বার্থলোমিউজ ডে ম্যাসাকার পুনরভিনীত হয় তা হলে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবে।" মানস শঙ্কিত স্বরে বলে।

"বটে? কিন্তু ওই যে কী ডে বললে ওটাতে কী হয়েছিল? আমার ইতিহাসের জ্ঞান তোমার মতো ব্যাপক নয়।" যূথিকা জিজ্ঞাসু।

"ফরাসীদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত দিবস। তারিখটা ১৫৭২ সালের ২৪শে আগস্ট। রাজমাতার প্ররোচনায় রাজার আদেশে সেই রাত্রে যে নিধন পর্ব শুরু হয় তা দিনের পর দিন কয়েকদিন ধরে চলে ও প্যারিসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। শত শত প্রটেস্টাণ্ট নিহত হয়।" মানস বর্ণনা করে।

যূথিকা শিউরে ওঠে। "ও প্রসঙ্গ থাক। বাচ্চারা এখনো ঘুমোয়নি। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবে।" সে অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

"শোন, কাল কেমন মজা হলো। আমরা পাঁচজনে বসে একটা নতুন আবিষ্কার করলুম। খেলাটার নাম কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন জেল-ফেরতা—বাবলী আর মিলি আর জুলি। বৌদি আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের তিনজন বিলেতফেরতা—বৌদি আর জুলি আর মিলি। বাবলী আর আমি কোণঠাসা। পাঁচজনের চারজন বিবাহিতা—বৌদি আর মিলি আর জুলি আর আমি। বাবলী কোণঠাসা। পাঁচজনের দু'জন মা হয়েছে—মিলি আর আমি। আমরাই কোণঠাসা। পাঁচজনের একজন দু'বার মা হয়েছে—আমি। আমিই কোণঠাসা। অনার্স ভাগ করে নিই বাবলী আর

আমি। এ তোমার দেশভাগ প্রদেশ ভাগের চেয়ে ভালো খেলা।"
যুথিকা হাসে।

দীপক আর মণি ঘুমিয়ে পড়েছে অনুমান করে যুথিকাই আবার কথাবার্তার খেই হাতে নেয়। "তোমরা ভারতবর্ষের ফরাসীও নও, ইংরেজও নও, তোমরা ভারতবর্ষের পোল।"

উপরের বার্থ থেকে দীপক বলে ওঠে, "নর্থ পোল না সাউথ পোল?"

"না, বাবা। পোল মানে এখানে পোলাণ্ডের লোক। যেমন মাদাম কুরী। যেমন শোপ্যাঁ।" যুথিকা তার পিয়ানোয় শোপ্যাঁ বাজিয়ে শুনিয়েছে।

"মাদাম কুরী তো রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন। আমিও ভাবছি সেই রকম একটা কিছু আবিষ্কার করব।" দীপক ইতিমধ্যেই ভাবুক হয়েছে।

"আগে তো বড়ো হও, তার পরে ওকথা ভাববে।" যুথিকা আশ্বাস দেয়।

"ততদিনে সবাই সব কিছু আবিষ্কার করে থাকবে। আমার জন্যে কিছু বাকী থাকলে তো?" দীপক শুষ্ক কণ্ঠে বলে।

মানস তা শুনে গুরুদেবের কবিতা আওড়ায়, "ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, কিছু নাই তোর ভাবনা। নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই ফাগুন তখনো যাবে না।"

দীপক ঠাণ্ডা হলে যুথিকা আবার খেই ধরে, "তোমাদের মধ্যে রবীন্দ্র অরবিন্দ, জগদীশ, অবনীন্দ্র হয়েছেন। পোলদের চেয়ে তোমরা কিসে কম? কিন্তু তাদের মতোই তোমরা আত্মকলহে জর্জর, তেমনি বিপ্লবপ্রেমিক। তাই তেমনি ভাগ্যহত। ওরা তেভাগা হয়ে যায়, ওদের দেশ ভাগ করে নেয় রাশিয়া, প্রাসিয়া আর অস্ট্রিয়া। আর তোমরা তো পলাশীতে যে রেকর্ড দেখালে সেটা বিশ্ব রেকর্ড। একমুঠো ইংরেজের হাতে হেরে গিয়ে তিন তিনটে প্রদেশ হারালে। সেটাও একরকম তেভাগা। পোলরা প্রায় দেড়শো বছর পরাধীন হয়ে কাটিয়ে দিল। তোমরাও তো দেড়শো বছর কাটালে, আর কদ্দিন কাটাবে কে জানে! স্বাধীন হলেও যে অবিভক্ত হবে তাও নয়। কেউ কেউ এখন থেকেই লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করো ভারতের রাজধানী আর কলকাতায় ফিরবে না। যতদিন তোমরা ভারতের রাজধানীর লোক ছিলে ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রেও তোমাদের নেতৃত্ব ছিল। সে নেতৃত্ব তোমরা বরাবরের মতো হারিয়েছ। একজন দেশবন্ধু কি একজন নেতাজী সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারেন না।"

মানস ঠেস দিয়ে বলে, "তুমি তো প্রায় আজন্ম দিল্লীওয়ালী। তোমার নিজের তো আমাদের মতো অবনতি বা অধোগতি হয়নি।"

' ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আমি আসতে চাইনি, তুমি যখন কথাটা তুলেছ তখন শোন। দিল্লীতে বদলীর বছর এগারো বারো পর্যন্ত বড়লাটের দিল্লীর বা সিমলার বাড়ীতে যখনি বড়গোছের পার্টি হয়েছে আমার বাবাকেই তার তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে। আর আমাকেও তিনি সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। সেই সূত্রে বহু সাহেব মেম ও বিশিষ্ট ভারতীয় অতিথির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বার বার দেখাসাক্ষাতের ফলে আলাপও হয়েছে। বার বার আলাপের ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। এখনো যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য মিস্টার জিনা।"

উপর থেকে দীপক বলে ওঠে, "জিন্না।"

"না, বাবা। জিনা। সাহেবী উচ্চারণ। তুমি এখনো জেগে। যাও, ঘুমবাবুর দেশে যাও। ওখানে খুব মজা।"

মানস উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। আরো শুনতে চায়। যূথিকা শোনায়। "জিনার মধ্যে যে আত্মসম্মানবোধ দেখেছি তা আর কারো মধ্যে নয়। সাহেবদের সঙ্গে তিনি সমানে সাহেব। কারো চেয়ে খাটো নন। বড়লাটের সঙ্গে তিনিও বড়লাট। নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, চির উন্নত মম শির। শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির। দেখে আনন্দ হয় যে সরকারী বা আধা-সরকারী মহলে এমন একজন ইণ্ডিয়ান আছেন যাঁকে লাট বেলাটরাও সমীহ করেন। গোখলেকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার বয়স পাঁচ ছয়। আবছা মনে পড়ে। সাহেব নন, দুর্ধর্ষ স্বদেশী। জিনার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সাহেব হয়েও দুর্ধর্ষ। তাঁর চেয়ে আমার আরো ভালো লাগত মিসেস জিনাকে। তিনি কিন্তু মেমসাহেব ছিলেন না, ছিলেন আক্রমণশীল ভারতীয়। বড়লাটকে দিয়ে নমস্কার করিয়ে নেন। বলেছি সে কাহিনী। যে কথা বলিনি তা শোন। আমাকে দেখে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন, ইওর ডটার? বাবা বলেন, ইয়েস, মি লেডী। মাই ওনলি ডটার। যাঁদের স্বামীরা লর্ড বা নাইট নন তেমন কোনো মহিলাকেই বাবা মি লেডী বলতেন না। মিসেস জিনাই একমাত্র ব্যতিক্রম। বাবার বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে মিস্টার জিনা শীগগিরই নাইট হতে যাচ্ছেন। ঠিক জানিনে, তবে জিনাকে বার বার অতি উচ্চ পদ বা সম্মান অফার করা

হয়েছিল। তিনি গ্রাহ্য করেননি। সেটা কিন্তু তিনি অসহযোগী বলে নয়। তাঁর নীতি ছিল আমি আপনারে ছাড়া কারেও করি না কুর্নিশ। সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধির হাত থেকে কিছু নিলে তো নত হতে হয়। যাক, মিসেস জিনার কথাই হোক। সেদিন তিনি আমাকে দেখে বলেন, আমারও যদি এইরকম একটি মেয়ে হতো। ঈশ্বর বোধ হয় আড়ি পেতে শোনেন। তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন।"

উপর থেকে আওয়াজ আসে, "তোমার মতো একটি মেয়ে হয়?"

"দুষ্টু ছেলে! এখনো তুমি ঘুমবাবুর দেশে যাওনি।" মিষ্টি করে ধমক দেন তার মা। তার পর বলেন, "আহা বেচারি রতনপ্রিয়া! অকালে মারা যান। জিনার পারিবারিক জীবনে আর কী বাকী রইল? ওই কন্যাই তাঁর নয়নের মণি। তাঁর জন্যে আমি বেদনা বোধ করি। কিন্তু বুঝতে পারিনে হাসব না কাঁদব যখন শুনি যে তাঁর কন্যা তাঁকে না জানিয়ে বিয়ে করে চলে গেছে বিলেত। বর সার নেস্ ওয়াডিয়ার ছেলে নেভিল। নেভিল কিন্তু ডেভিল নয়। সে তাঁর ধনকুবের পিতার উত্তরাধিকারী হলে কী হবে, মুসলমান নয়, পার্শী খ্রীস্টান। বলা বাহুল্য, জিনার মাও ছিলেন পার্শী। রক্তেরও তো একটা টান আছে। আর বিয়ের বয়স হয়ে থাকলে মেয়ের কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই? জিনাকে বোঝায় কে? আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ। অবিকল আমার বাবার মতো। ভুলে গেলেন যে নিজেও তিনি রতনপ্রিয়াকে সার জাহাঙ্গীর পেতিতের অমতে বিয়ে করে নজীর রেখেছিলেন। সেইদিনই আমি প্রথম উপলব্ধি করি যে জিনা আর সেই সেকুলার ইণ্ডিয়ান বা প্রায় ইউরোপীয়ান নন, নেতা হতে গিয়ে তিনিও হয়ে উঠেছেন গোঁড়া মুসলমান। সেই জিনা কখনো দেশভাগের কথা কল্পনাও করতেন না। এই জিনা শাইলকের মতো ছুরি আস্ফালন করছেন। এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবেন। যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ, তাঁর দাবী তিনি আদায় করে নেবেনই।" যুথিকা সুনিশ্চিত।

মানস আত্মগত ভাবে বলে, "তা হলে বাপু আর প্রাণে বাঁচবেন না। অনশনে দেহত্যাগ করবেন। তাতে যদি লীগপন্থীদের অন্তঃপরিবর্তন হয়।"

"বর্ণান্ধ ইংরেজ আর ধর্মান্ধ মুসলমান একই ধাতুতে গড়া। সে ধাতু ইস্পাত। তাদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো মহাত্মারও সাধ্য নয়। গতবারের অনশনে তো লক্ষ করলে। লর্ড লিনলিথগোর বা মিস্টার জিনার কি বিন্দুমাত্র

সহানুভূতি প্রকাশ গেলো। তাঁরা সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নির্মম। জিনা তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছেন, বার বার জেলে গিয়ে অপচয় করেননি। কংগ্রেস নেতারা যেমন করেছেন। এঁরা শান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত। তিনি একদম তাজা। বড়লাট যদি তাঁর দিকে ঝোঁকেন তা হলে কি আর রক্ষে আছে? একমাত্র ভরসা অ্যাটলী। কিন্তু তাঁর বিপরীত দিকে চার্চিলও তো বিদ্যমান। ব্যাপারটা এমনভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে যে হাত দিয়ে জট খুলতে পারা যাবে না। কাঁচি দিয়ে কাটতেই হবে; তার মানে পার্টিশন। তা বলে শুধুমাত্র ভারতের নয়। লীগপন্থীদের সমঝিয়ে দিতে হবে যে পাঞ্জাবের তথা বাংলারও। তাতে যদি তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হয়। তবে ইংরেজকে তাড়াতেই হবে। যত নষ্টের গোড়া ওদেরই ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি। তার থেকেই এসেছে জিনার ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট।'' যূথিকা নিদ্রার উদ্যোগ করে।

"তা হলে জিন্নাকেই দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিয়ে বড়লাট বিদায় হোন। এই একমাত্র সমাধান। আমরা ঝুঁকি নেব।'' ইতি মানস।

"মরি মরি কী চমৎকার সমাধান! মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ শাসনের পর ফের মুসলিম শাসন, ভারতের ভাগ্যে যেন আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু শিখ বলে এখনো একটা সম্প্রদায় রয়েছে। শিখেরা যখন ক্ষেপে গিয়ে যুদ্ধ টুদ্ধ বাধিয়ে দেবে তখনি হবে সমস্ত তর্কের অবসান।" ইতি যূথিকা।

সকালবেলা স্টীমারযাত্রা। দীপককে তার নতুন জ্যাঠাইমা একজোড়া বাইনোকুলার কিনে দিয়েছেন, তাই চোখে লাগিয়ে সে নদীর দু'ধারের গ্রামে গঞ্জে কত কী আবিষ্কার করছে। আর মণিকাকে তিনি কিনে দিয়েছেন একটা মিহি নীল শাড়ী। তাই পরে সে ফুর ফুর করে পরীর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে তাদের মা তাদের দু'জনের উপর দুই চোখ রেখেছেন।

ওদিকে মানস জমে গেছে সহযাত্রী এক মুসলিম অফিসারের সঙ্গে। তিনি নানা স্থানে টুর করে বেড়াচ্ছেন। মানসের চেয়ে সিনিয়র, কিন্তু অন্য সার্ভিসের। তাঁর কাছে মানস শুনছে, "মফঃস্বলে আজকাল ইউরোপীয় অফিসার আপনি বিশেষ দেখতে পাবেন না। একধার থেকে বদলী হয়ে চলে যাচ্ছেন কলকাতায়। যাঁদের জায়গায় যাচ্ছেন তাঁরা যাচ্ছেন দিল্লী। নিত্য

নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের খাতিরে। এর পেছনে কী যে রহস্য তা আপনার হয়তো জানা আছে, আমার অজানা। একজন ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছে গোপনে একটা ক্লু পেয়েছি। সাহেবরা আশঙ্কা করছেন যে সিপাহী বিদ্রোহের মতো একটা কিছু ধেঁায়াচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছিনে, ওঁরা পাচ্ছেন। যেখানে যত ইংরেজ আছে এক রাত্রেই সব ক'টাকে নিকেশ করবে। সবই তো আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কে কাকে রক্ষে করবে? তাই সাবধানের মার নেই। দিল্লী, কলকাতা, বম্বের মতো বড়ো বড়ো শহরে ওরা র‍্যালি করছে। হয় প্লেন ধরবে, নয় জাহাজ ধরবে। যারা পালাবার সুযোগ পাবে না তারা দলবদ্ধ হয়ে লড়বে। তার আগে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে, দেশবাসীদের আশায় আশায় রাখবে।"

মানস বিস্মিত হয়। "না, আমি তেমন কোন ক্লু পাইনি। তবে আমিও খবর পেয়েছি যে ইংরেজরা পেনসন ও ক্ষতিপূরণের হিসেব কষছে। এর থেকে অনুমান হয় কেন্দ্রে একটা রদবদল হতে যাচ্ছে, নতুন সরকার পুরনো সরকারের দায়দায়িত্ব হাতে তুলে নেবেন। ক্ষমতার হস্তান্তর মানে দায়িত্বের হস্তান্তর, দায়ের হস্তান্তর। তাই যদি হয় তবে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ কেন? আর তার আশঙ্কায় বড়ো বড়ো শহরে র‍্যালি করা কেন? যারা আপনি যাচ্ছে তাদের তাড়াতে গেলে তারাও তো ঘুরে দাঁড়াতে পারে, আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মসম্মানের জন্যে। বিদ্রোহীরা কি মনে করে ইংরেজরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গায়ের জোরে লাল কেল্লা বা মসনদ দখল করা অতি সহজ।"

"ঠিকই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক যে বহু লোকের হাতে বন্দুক, রিভলভার, স্টেনগান ইত্যাদি কী জানি কেমন করে এসেছে। বহু লোক যুদ্ধবিগ্রহের তালিমও পেয়েছে। তাদের ধারণা জন্মেছে তারা না জানি কত বলবান। আগামী জুলাই কি আগস্টে ঘটতে পারে একটা রাইজিং। যেমন আয়ারল্যাণ্ডের ঈস্টার রাইজিং। সে রকম একটা সম্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে সরকার এখন নানা জায়গায় নতুন নতুন জেলখানা তৈরি করে রাখছেন। কিংবা পুরনো জেলখানার নতুন ওয়ার্ড। বিদ্রোহের আঁচ পেলেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফাটকে পুরবেন।" ভদ্রলোক ফিস্ ফিস্ করে বলেন।

"তার মানে ইংরেজরা ডানকার্কের মতো দৌড় দেবে না। আক্রমণের সম্মুখীন হবে। কিন্তু মানে মানে ক্ষমতার হস্তান্তর যদি হয়ে যায় তার কোনো

দরকার হবে না, খান সাহেব। তবে আমি ভাবছি ক্ষমতার হস্তান্তরে পাকিস্তানের দাবী নিয়ে মুসলিম লীগ বাদ সাধবে না তো? জানিনে আপনি লীগপন্থী কি-না। হয়ে থাকলে মাফ করবেন।" মানস জিভ কাটে।

"আজকাল মুসলিম অফিসারদের মধ্যে লীগপন্থী নন ক জন? এখন কি কংগ্রেসের বা কৃষক প্রজাপন্থীদের তেমন প্রভাব আছে? মহাত্মা গান্ধীর উপরেও তেমন ভক্তি নেই। এখন কায়দে আজমের উপরে অগাধ বিশ্বাস। আর পাকিস্তান তো মুসলমানদের কাছে খেলাফতের পরিবর্ত। এতে তাদের ধর্মীয় ইমোশন পরিতৃপ্ত হয়। এটা যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। কংগ্রেসের পক্ষে যুক্তিতর্কের কমতি নেই, কিন্তু ধর্মীয় ইমোশন কোথায়? কেন আমরা ভারতরাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মাইনরিটি হব, যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রে চিরস্থায়ী মেজরিটি হতে পারি? ভারতমাতা বলতে আপনারা যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হন আমরা তেমন হইনে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে যেটা আবেগের পর্যায়ে পড়ে না, গণনার পর্যায়ে পড়ে। ইংরেজরা সরে গেলে যত উচ্চতর পদ খালি হবে সব আপনাদের ভাগ্যেই জুটবে, কেননা আপনারা সিনিয়র। আমরা চাই আমাদের ভাগেও পড়ুক। যদিও আমরা জুনিয়র। পাকিস্তান হলে আমরা চোখ বুজে তিনভাগের এক ভাগ পাই। মিলিটারিতে আরো বেশী। এককথায় বলতে পারি, স্বাধীনতা বলতে আপনারা বোঝেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি আর আমরা বুঝি হিন্দু মেজরিটির গ্রাস থেকে মুক্তি। এর জন্যে আলাদা একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ইংরেজরা যাবার সময় ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে যেতে পারে। চাই শুধু কংগ্রেসের সম্মতি।" খান সাহেব নিবেদন করেন।

মানস দুঃখিত হয়ে বলে, "আপনারা যদি ভারতীয় হতে না পারেন আমরাও পাকিস্তানী হতে পারব না। কংগ্রেস কী করে সম্মতি দেবে?"

খান সাহেব মুখ ফিরিয়ে একটু হাসেন। তারপর বলেন, "কংগ্রেস কী করবে তার নজীর আমরা দেখেছি। সেই নজীর থেকে বলতে পারি কংগ্রেসের নীতি হচ্ছে 'না গ্রহণ ও না বর্জন'। কার্যত গ্রহণ। পার্টিশন সে গ্রহণও করবে না, বর্জনও করবে না। কার্যত গ্রহণ করবে। তামাম বাংলাদেশ হবে পাকিস্তানের সামিল। আপনার যদি পাকিস্তানে থাকতে আপত্তি থাকে আপনি হিন্দুস্থানে বদলী হয়ে যাবেন। আপনার এমন কী হানি হবে?"

মানস বিশ্বাস করে না যে কংগ্রেস অমন কিছু করবে। কিন্তু ইংরেজদের

হাত থেকে ক্ষমতা নেবার সময় যে দরাদরিটা হবে সেটা যে পার্টিশনের ভিত্তিতে হবে না তা কি সে জোর করে বলতে পারে? আর পার্টিশনের ভিত্তিতে যদি হয় তবে প্রদেশও ভাগ হয়ে যেতে পারে।

"হিন্দু মুসলমান যদি দুই নেশন হয়ে থাকে তা হলে বাংলাদেশও দুই নেশনের মধ্যে ভাগ হয়ে যেতে পারে, খান সাহেব। তামাম বাংলাদেশ কি শুধুমাত্র মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড? হিন্দুদেরও নয়? বাঙালী হিন্দুদের হোমল্যাণ্ড তা হলে কোন্‌খানে? আমার মতো কয়েকজন অফিসার অন্য প্রদেশে বদলী হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বাঙালী হিন্দুরা ঝাড়ে মূলে বদলী হতে পারে না। তেমন ব্যাপার যদি ঘটে তবে সমানসংখ্যক মুসলমানও উত্তর ভারত থেকে ঝাড়ে মূলে বদলী হয়ে আসবে। তাতে বাঙালী মুসলমানের আখেরে লাভ হবে না ক্ষতি হবে?" মানস ভদ্রলোককে ভাবনায় ফেলে।

তিনি হাওয়া হয়ে যান।

যূথিকা এসে সুধায়, "ওই অচেনা অজানা মানুষটির সঙ্গে কী এত কথাবার্তা হচ্ছিল? তোমার যা স্বভাব। সবাইকে বিশ্বাস করে পেটের কথা বলবে। আমার তো সন্দেহ উনি গোয়েন্দা বিভাগের কেউকেটা।"

মানস অপ্রতিভ হয়ে বলে, "হতেও পারেন। কিন্তু আমিও এমন কিছু ফাঁস করিনি যা খুবই গোপনীয়।"

এর পরে স্টীমার থেকে ট্রেন। ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন থেকে মোটর। মোটর থেকে জজ কুঠি। বার্লো খালি করে দিয়ে গেছেন। একদিন বিশ্রামের পর জজ কোর্টে গিয়ে মানস চার্জ নেয় ও কাজকর্মের মধ্যে ডুবে যায়।

রাত্রে শুতে যাবার সময় একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। যূথিকাকে শোনায়। "ওই লোকটির দেওয়া খবর যদি নির্ভরযোগ্য হয় তবে এই বছর জুলাই কি আগস্ট মাসে একটা রাইজিং প্রত্যাশা করা যায়। আয়ারল্যাণ্ডের যেমন ইস্টার রাইজিং।"

"ওমা! তাই নাকি?" যূথিকা চমকে ওঠে।

"তখন থেকেই আমি ভাবছি এর পেছনে কে থাকতে পারে? তুমি অনুমান করতে পারো?" মানস চোখ টেপে।

"কে? সুভাষচন্দ্র?" যূথিকা আন্দাজে বলে।

"সুভাষচন্দ্র এখন কোথায় কে জানে? ধরা পড়লে ওয়ার ক্রিমিনালস ট্রায়াল। আমার সন্দেহ আরেকজনকে।" মানস রহস্যটাকে ঘোরালো করে।

"বলো না গো, কে?" যূথিকার সবুর সয় না।

"জুলির বান্ধবী মিলি। মধুমালতী মুস্তাফী। ও যে বিলেত থেকে এসেছে সেটা এই উদ্দেশ্য নিয়ে।" মানস সন্দেহ করে।

"মধুমালতী দত্তবিশ্বাস।" যূথিকা সংশোধন করে। "কিন্তু তোমার সন্দেহটা অহেতুক। মিলি মা হয়েছে। অমন অ্যাডভেঞ্চার করবে না।"

এর মাসখানেক বাদে বোম্বাইতে রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীতে মিউটিনি। মানস খবরটা শুনে যূথিকাকে বলে, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ। মিলির গন্ধ পাঁউ।"

যূথিকা বলে, "তুমি ভুল ঠাউরেছ। মিলি নয়, অশোকা।"

"মিলি খুব সম্ভব অশোকার দলেই ভিড়েছে। তুমি কলকাতায় বৌদিকে চিঠি লিখে মিলির খোঁজ নাও।" মানস পরামর্শ দেয়।

বৌদি উত্তর দেন, "মিলির দাদা বোম্বাইতে থাকেন। মহারাষ্ট্রকন্যা বিয়ে করেছেন। একটি বাচ্চাও হয়েছে। মিলি দেখা করতে গেছে।"

মানস বলে, "আমি ঠিকই অনুমান করেছিলুম সে এখন বোম্বাইতে। বাকীটা তর্কসাপেক্ষ।"

কিছুদিন পরে সুকুমারের চিঠি। সে তার বৌ আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাচ্ছে। এবার জাহাজে। ইতিমধ্যে একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। মিলি কী জানি কেমন করে মিউটিনির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আটক করে। সুকুমার তখন দিল্লীতে। বোম্বাই থেকে মিলির দাদার ট্রাঙ্ক কল পেয়ে বোম্বাই ছুটে যায় ও সরাসরি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মিলি যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ছিল ও নানা ভাবে সাহায্য করেছিল। লাট সাহেব তাকে ছেড়ে দেন ও ডেকে পাঠান। বলেন, "অবোধ বালিকা, এই নেভী আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব না, তোমাদের হাতেই দিয়ে যাব। তখন তোমরা একে শাসন করবে কী করে, যদি এই রেটিংদের অবাধ্য হতে শেখাও? আর্মি বা নেভী বা পুলিশ ট্রেড ইউনিয়ন নয়। এরা যদি অবাধ্য হয় তবে সর্বনাশ।"

"ঠিকই তো।" মানস বলে, "সিপাইদের যারা বিদ্রোহী হতে শেখায় তারা পরে আর তাদের শাসন করতে পারে না। সেই বিদ্রোহীরাই পরে হয় শাসক। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ অমনি করেই কায়েম হয়। ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ কি কারো কাম্য? যাক, মিলি ফিরে গিয়ে ভালোই করেছে।"

"ভালো ওর সংসারের দিক থেকেও। স্বামী এক দেশে, স্ত্রী আরেক

দেশে, ছেলে যে কার কাছে তাও অনিশ্চিত। ওরা ছাড়াছাড়ির অভিমুখেই যাচ্ছিল। হ্যাঁ, ফাঁড়া কেটে গেছে।" যুথিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"আমি অতটা জানতুম না।" মানস বলে।

"তুমি কতটাই বা জানো? মিলি বেশীদিন এদেশে থাকলে ওর নিজের ঘর তো ভেঙে যেতই, জুলির ঘরও ভেঙে দিত। সৌম্যদাকে ও ভুলতে পারেনি। ওর দৃঢ় ধারণা সৌম্যদা ওরই হতো, যদি না জুলি আর সুকুমার হঠাৎ কোন্‌খান থেকে এসে হাজির হতো। মানুষের ভাগ্য অমনি করেই উলটো পালটা হয়ে যায়। কিন্তু একবার অদল বদল হয়ে গেলে পরে আর জোড় মেলানো যায় না। সৌম্যদার সঙ্গে মিলির ও সুকুমারের সঙ্গে জুলির আর কোনোদিনই মিলন হবার নয়। জুলির দুর্বুদ্ধি হবে না, মিলির সুবুদ্ধি হলেই বাঁচি। বেশ বোঝা যায় মেয়েটা অবোধ নয়, অসুখী।" যুথিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

"মিলিও ভালো, জুলিও ভালো, বাবলীও ভালো, দীপিকাও ভালো, কিন্তু সবার চাইতে ভালো যে আমার ঘরের আলো—জুঁই।" মানস ওকে বার বার চমু খায়।

॥ তেরো ॥

এই স্টেশনে মানসের একমাত্র চেনা অভিসার রমণীরঞ্জন নাগ। ন'বছর আগে অন্যত্র যিনি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন এখন তিনি এখানকার অ্যাডিশনাল এস. পি.। এ কেমন কথা?

এর উত্তরে তিনি বলেন, "বাঙালীকে বাঙালী না মারিলে কে মারিবে? নাম করব না, আপনারই সার্ভিসের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার নামে কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট দেন, নাগ ইজ আ গুড দারোগা, বাট আ উইক পুলিশম্যান। শুনুন কথা! আমি রোজ স্যাণ্ডো করি, আমার ওজন একশো আশি পাউণ্ড। আমি কিনা উইক পুলিশম্যান!" এই বলে মাসল ফোলান।

অন্তরঙ্গ মহলে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশকে বলা হয় 'দ্য পুলিশম্যান'। সেই পদে নিযুক্ত হয়ে কেউ যদি কোনো একটি পরিস্থিতিতে দুর্বলতা দেখান

তবে তাঁকে 'উইক' বলে অভিহিত করা ঐ শব্দটার অপপ্রয়োগ নয়। মানস তার সিনিয়রের পক্ষ নিতে পারত, কিন্তু নেয় না। বলে, "আমাদের এই জেলা ক্রাইমের দিক থেকে সর্বপ্রধান দুই জেলার অন্যতম। এখানে একজন ভালো তদন্তকারী অফিসারের দরকার। তিনি হিন্দু হলে আরো ভালো, কারণ হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু। সুতরাং নার্ভাস।"

"নার্ভাস যদি বলেন ইউরোপীয়ানরা এখন আরো নার্ভাস। বার্লো আপনার পূর্ববর্তী।, তিনি কলকাতা বদলী হয়ে গেছেন। হ্যামিলটন আমার বস্, তিনিও শুনছি দিল্লী যাচ্ছেন। ইউরোপীয়ান বলতে একজনও থাকবেন না। অথচ ওঁদের পক্ষে এটা ছিল একটা প্রাইজ স্টেশন। কালে কালে কী না হয়! আপনার কি মনে আছে? আপনি যখন ডি. এম. ছিলেন আর আমি এস. পি. তখন আপনাকে আমি একবার গোপনীয় র‍্যালিং পয়েন্ট প্ল্যান দেখিয়েছিলুম! সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে সে রকম একটা প্ল্যান প্রত্যেক জেলাতেই রয়েছে। মিউটিনির ওয়্যারলেস মেসেজ পাওয়ামাত্র জেলার যেখানে যত ইউরোপীয়ান ও উচ্চপদস্থ ইণ্ডিয়ান আছেন তাঁদের সবাইকে রাতারাতি খবর দিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট একটি স্থানে জড়ো করতে হবে। সেখানেই তাঁরা পুলিশের হেফাজতে থাকবেন। পুলিশ তাঁদের রক্ষা করবে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু। সেখানেও যদি তাঁদের বাঁচানো অসম্ভব হয় তবে তাঁদের মিলিটারি প্রোটেকশন দিয়ে বৃহত্তর র‍্যালিং পয়েন্টে পাঠাতে হবে। অবশ্য সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে মিউটিনির সম্ভাবনা আঁচতে পেরে আগে ভাগেই মহিলা ও শিশুদের বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া। আর নিজেরাও কলকাতা বা দিল্লীতে বদলী হয়ে সেখানেই দরকারের সময় র‍্যালি করা। কিন্তু আমি ভাবছি এসব তো হলো ইউরোপীয়ানদের বেলা আপৎকালীন ব্যবস্থা, আমাদের মতো উচ্চপদস্থ ইণ্ডিয়ানদের বেলা কী হবে?" নাগ উদ্বেগের সঙ্গে সুধান।

"কেন, আপনি কি আশঙ্কা করছেন আরেকটা মিউটিনি আসন্ন? কই, কাগজে তো কোথাও তার আভাস নেই।" মানস যতদূর জানে।

'প্যানিকের ভয়ে ওরা জানলেও জানাবে না। দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। আমরা একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে আছি। বামপন্থীরা এর সুযোগ নিয়ে মিউটিনি বাধাবার ফিকিরে আছে। আর লীগপন্থী মুসলমানরা দাঙ্গা বাধাবার।" নাগ উত্তর দেন।

দেশের অবস্থা যে অগ্নিগর্ভ এটা আরো একজনের মুখেও মানস শোনে। তিনি নিয়মিত ক্লাবে আসেন, টেনিসের পার্টনার হন। দেবাদিদেব গুহ। কেমব্রিজের র‍্যাংলার। না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, না বাংলাদেশের সরকার কেউ তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পদ দেননি। তাই তিনি অভিমান করে বাড়ীতে বসে আছেন। কবে ডাক আসবে সেই আশায়। বয়স বাড়তে বাড়তে পঞ্চাশের কাছাকাছি। অবলম্বন পৈত্রিক জমিদারি। বিয়ে করেছিলেন, স্ত্রী মারা গেছেন, সন্তানাদি নেই। ঝাড়া হাত পা। থাকেন ইঙ্গবঙ্গ স্টাইলে। খেলার জন্যে ক্লাবে আসেন। টেনিসের অভ্যাস রেখেছেন। উত্তম স্বাস্থ্য। তাঁর শখ হচ্ছে যত রাজ্যের বই কাগজ কেনা ও পড়া। বিদ্যার জাহাজ। কখনো কোনো রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে কলেজের অধ্যাপকরাও তাঁর দ্বারস্থ হন। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরাও বাদ যান না। কী ইউরোপীয়ান, কী ইণ্ডিয়ান। পরিসংখ্যান তাঁর নখদর্পণে। অত আধুনিক লাইব্রেরী এখানে আর কারো নেই।

মানস নতুন বইয়ের সন্ধানে তাঁর লাইব্রেরীতে যায়। তিনি খুশি হয়ে বই দেখান। বলেন, "আপনি সর্বদাই স্বাগত। মনে করুন এটা আপনারই লাইব্রেরী।"

বলা বাহুল্য তিনিও আসেন মানসের কুঠিতে। যুথিকার সঙ্গে আলাপ হয়। পিয়ানো শুনতে চান। বাজালে শোনেন।

"ইউরোপ থেকে চলে এসেছি কবে! তবু তো ইংরেজ ছিল, তাই ওখানকার জীবনধারার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। ওরাও তো শুনছি যাবার মুখে। দেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। ভারতে সবশুদ্ধ নব্বই হাজার ইউরোপীয় আছে। শতকরা একজনও নয়। সময় থাকতে যদি না পালায় তো আগুনে পুড়ে মরবে। তবে ওরা যেমন তুখোড় পলিটিসিয়ান ভারতীয়দের লেলিয়ে দেবে ভারতীয়দের গায়ে আর নিজেরা সালিশী করবে। বাধাবেও ওরা, মেটাবেও ওরা। আর লড়ে মরবে হিন্দু মুসলমান শিখ।" গুহ অনুমান করেন।

"গান্ধীজী থাকতে লড়াইই বা বাধবে কেন, বাধলে তিনিই বা থামাতে পারবেন না কেন? সালিশী যদি করতে হয় পার্শীরা করবে। কিন্তু ইংরেজ কেন? ওরা কবে থেকে নিরপেক্ষ হলো?" যুথিকা ভেবে পায় না।

"মুসলমানদের কথা হলো ওরা এদেশের রাজা ছিল, রাজত্ব হারিয়ে না হয় ইংরেজের প্রজা হয়েছে। তা বলে কি ইংরেজ চলে গেলে হিন্দুর প্রজা

হবে ? তাদের রাজ্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পুরো না দিলে তার অর্ধেক দিতে হবে, কিন্তু গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে হিন্দু মেজরিটিকে সমগ্র ভারত দেওয়া চলবে না। গণতন্ত্র ব্যাপারটা মুসলমানরা তো নয়ই হিন্দুরাও যে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তা নয়, বহু হিন্দু ডিকটেটরশিপ পছন্দ করে। কংগ্রেসকে দেখছেন তো ? কংগ্রেস হাই কমাণ্ডই কংগ্রেস। আর কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বলতে বোঝায় তিন প্রধান নেতা। যাঁদের গুরু গান্ধীজী। ওদিকে মুসলিম লীগও একটা হাই কমাণ্ড খাড়া করেছে, তার একজনমাত্র মেম্বর। তিনিই সর্বেসর্বা। জিন্না সাহেব একদা কংগ্রেস লীগ উভয়ের মধ্যে মেল বন্ধন করেছিলেন। এখন সে আশা ত্যাগ করেছেন। মেলবন্ধন লক্ষ্য নয় বলেই তিনি ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট মন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর একমাত্র ভরসা প্রস্থানকালে ইংরেজ সরকার রাজ্যভাগ করে একভাগ তাঁর হাতে দিয়ে যাবেন। না দিলে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়েরই বিরুদ্ধে। ইংরেজ কী করবে আপনিই বলুন, মিসেস মল্লিক : আমি তো দেখছি এর একমাত্র প্রতিকার ইংরেজকে যেতে না দেওয়া। ওরা থাকুক আরো দশ বিশ বছর। ইতিমধ্যে আমাদেরও গণতন্ত্র শিক্ষা হোক। দু'বছর মন্ত্রিত্ব করে ছ'বছর বনবাস গণতন্ত্র শিক্ষার সম্যক উপায় নয়। মল্লিক সাহেব কী বলেন ?" গুহ মানসের দিকে তাকান।

"শুধু গণতন্ত্র নয়, জাতীয়তাবাদকেও আরো মজবুত করা চাই। আমাদের জাতীয়তাবাদ পুরোপুরি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, এর অনেকখানি হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। মুসলমান বন্ধুরা তো বলবেনই, তোমাদের জাতীয়তাবাদ যখন অনেকখানি হিন্দু তখন ভারতের অনেকখানিই তোমরা নাও, বাকী স্থান আমাদের দাও। সেই বাকী স্থান হোক পাকিস্তান। আমাদের সেই স্থানে আমরা মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করব। ইংরেজের মুখাপেক্ষা হতে হবে না। কেনই বা ইংরেজকে ধরে রাখতে চাওয়া ? স্বাধীনতা দশ বছর বাদে নয়, বিশ বছর বাদে নয়, এক বছরের মধ্যেই হবে। আমি তাঁদের মুখের মতো জবাব দিতে পারিনে। এটা তো সত্য যে 'বন্দে মাতরম'ই আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল সুর। আর মুসলমানরা কেউ ভুলেও সে সুর গুন গুন করে না। ন্যাশনালিজম আইডিয়াটাই ইসলামের সঙ্গে বেখাপ। তবে ইদানীং একটা পরিবর্তনের হাওয়া পালে লেগেছে। ওরাও ন্যাশনালিস্ট হবে, যদি মুসলিম ন্যাশনালিস্ট বা পাকিস্তানী ন্যাশনালিস্ট বলে

পরিচয় দিতে পারে। না, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নয়, মুসলিম ন্যাশনালিস্ট। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমরা ভারত ভাগ করতে চায় না, মুসলিম ন্যাশনালিস্টরা ও ছাড়া আর কিছু চায় না। লোকের ধারণা সব মুসলমান একমত। সেটা একটা ভুল ধারণা। জিন্না সাহেব হয়তো অধিকাংশ মুসলমানের প্রবক্তা। কিন্তু সব মুসলমানের প্রতিনিধি নন।" মানস রায় দেয়।

"কিন্তু জিন্না সাহেব যদি শয়তান হয়ে থাকেন তবে শয়তানকেও তার পাওনা দিতে হবে। গোটা কয়েক প্রদেশ তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই বিজ্ঞতা। সেখানেই মুসলিম ন্যাশনালিজমের তথা পাকিস্তানী ন্যাশনালিজমের পত্তন হোক। সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের চর্চা। জিন্নার মতো অমন একজন প্রতিভাশালী পুরুষের প্রতিভার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, সবাই মিলে তাঁকে কোণঠাসা করেছে। কোণটাসা হলে একটা বেড়ালও আঁচড়ায় কামড়ায়, চোখের মণি উপড়ে নেয়। জিন্নার প্রত্যেকটি প্রস্তাবে আপত্তি না করলে কি নয়? ন্যাশনালিস্ট মুসলিম থেকে উনি মুসলিম ন্যাশনালিস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছেন এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। গোড়ায় তিনি ডেমোক্রাটই ছিলেন, ইদানীং মেজরিটির উপর মাইনরিটির ভীটো প্রয়োগই তাঁর পলিসি। তাতে ব্যর্থ হলে পাকিস্তান অর্জন। এখন ইংরেজরা কী করে দেখা যাক।" গুহ যুথিকার দিকে তাকান।

"ওরা এই আগ্নেয়গিরি আগলে রেখে কার কী উপকার করবে, মিস্টার গুহ? আরো দশ বিশ বছর কি লাভাবর্ষণ ক্ষান্ত থাকবে? ওরা ডিভাইড না করেই কুইট করুক। সিভিল ওয়ার বাধবে না, আশা করি। মুসলিম লীগকে তার পাওনা সংখ্যার অনুপাতে দেওয়া হবে। উচ্চতর পদও ওরা পালা করে পাবে। আর যদি দেশ ভাগ অনিবার্য হয় তবে প্রদেশ ভাগও সেই সঙ্গে হবে। হিন্দুরাই বা কেন ফের মুসলমানদের প্রজা হবে? 'বন্দে মাতরম্' ওদের কণ্ঠে শোনা যায় না। 'আল্লা হো আকবর'ও হিন্দুদের কণ্ঠে মানায় না। কিন্তু আগে ইংরেজ যাক। তার পরে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি ভাগ করে নেব। পাকিস্তান ইংরেজের হাত থেকে নয়, ভাইয়ের হাত থেকেই ওরা পাবে।" যুথিকা ফয়সালা করে।

মানস বলে, "আমি কিন্তু দেশভাগ প্রদেশভাগ কোনোটাই সমর্থন করিনে। ভাগাভাগি ওই চাকরিবাকরির উপর দিয়েই যাক। নইলে আবার লোক জাগের প্রশ্ন উঠবে। সব হিন্দু এক গোয়ালে, সব মুসলমান এক খোঁয়াড়ে। ঐতিহাসিক বিবর্তনটাই উল্টে যাবে। অমার্জনীয়!"

যূথিকা চুপ করে থাকে। গুহ বলেন, "আচ্ছা, আপনাদের আমি পরিসংখ্যান শোনাই। তার পরে বিবেচনা করবেন। সারা বাংলা আর আসাম জুড়লে মুসলমানদের সংখ্যানুপাত শতকরা একান্ন ছাড়িয়ে উনসত্তর শতাংশ। আর অমুসলমানদের সংখ্যানুপাত শতকরা আটচল্লিশ ছাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ শতাংশ। তা হলে মুসলমান অমুসলমানকে দাবিয়ে রাখে কী করে? একটা ভোটে জিতে কেউ কখনো নিজের সিদ্ধান্ত অপরের উপর চাপিয়ে দিতে পারে? লড়তে হয় তখনি লড়া যাবে। তার আগে কেন? নিক না ওরা গোটা বাংলা আর গোটা আসাম। সেটা আমাদেরও নেওয়া। এমন সময় আসবে যখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের লোক পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের উপর আধিপত্য করবে। পশ্চিমাদের মোট সংখ্যা হিন্দু মুসলমান শিখ মিলিয়ে তিন কোটি ষাট লক্ষের চেয়ে কিছু বেশী। আর পূরবিয়াদের সংখ্যা হিন্দু মুসলমান ট্রাইবাল মিলিয়ে সাত কোটির চেয়ে একটু বেশী। একদিকে দুই তৃতীয়াংশ, আরেক দিকে এক তৃতীয়াংশ। আমরা যা বলব তাই হবে। কলকাতা হবে সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী।"

মানস হেসে ওঠে। "মাফ করবেন, মিস্টার গুহ, আপনার এই স্বপ্ন কোনোদিন সার্থক হবার নয়। মুসলিম নেশনের জন্যে যাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্র উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা কোনোদিনই বাঙালী হিন্দু মুসলমানকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে জিততে দেবেন না। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি এমন এক ফরমূলা উদ্ভাবন করবে যাতে সত্যিকার ক্ষমতা থেকে যায় পশ্চিমা মুসলমানদের হাতে। বাংলাভাষাকে তাঁরা আমল দেবেন না, বাংলার রাজধানী কলকাতাকেও ক্ষমতার কেন্দ্র করবেন না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় আটঘাট এমনভাবে বাঁধবেন যে ওয়েটেজ, ভীটো, প্যারিটি ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পশ্চিমাদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে। কিছুতেই কিছু না হলে মাইট ইজ রাইট তো তাঁদের দিকেই। কারণ পাঞ্জাবী মুসলমানদের হাতেই মিলিটারি পাওয়ার। ব্যালটের চেয়ে বুলেটের জোর বেশী। তার সঙ্গে মোল্লাদের যোগসাজস। জিন্না সাহেব ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে এসেছেন বলেই সিভিল পাওয়ারের মর্যাদা বুঝেছেন, পাকিস্তান হাসিল করে মুসলিম ঐতিহ্যের ভিতরে ফিরে গেলে মোল্লা আর মিলিটারিতে মিলে তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। পাকিস্তান এসেছে ইসলামের ইতিহাস থেকে। ব্রিটেনের বা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস থেকে নয়। যে ইতিহাসে জিন্না সাহেবের জন্ম। আপনার ও আমার জন্ম। পাকিস্তানে

আমরা দম বন্ধ হয়ে মারা যাব, মিস্টার গুহ। যারা বাঁচবে তারা কচ্ছপের মতো খোলার ভিতর হাত পা গুটিয়ে নিয়ে বাঁচবে।"

"তা হলেও আমি গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতী নই, মিস্টার মল্লিক। এ প্রদেশে যাদের মেজরিটি তারা যদি পাকিস্তানে থাকতে চায় তো আমিও তাদের সঙ্গে থাকব। তাদের অদৃষ্টে যা ঘটবে আমার অদৃষ্টেও তাই ঘটবে। তারাই তো আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার আয় তো তাদের পরিশ্রম থেকেই আসে। তারা তো আমাকে ছাড়েনি, আমিও তাদের ছাড়ব না। আপনার কী? আপনি আজ এখানে আছেন, কাল বদলী হয়ে চলে যাবেন। আমি এ বয়সে বেদুইন হতে নারাজ।" গুহ মাথা নাড়েন।

যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে, "সে কী! পাকিস্তান যদি হয় আপনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে বাস করবেন?"

"মিসেস মল্লিক, রাজা বদল ইতিহাসে কতবার হয়েছে। তা বলে কি প্রজারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছে? তবে এবারকার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। তুর্ক আর মোগল আমলে ছোটলোকরা দলে দলে মুসলমান হয়ে যায়। ইদানীং মুসলমানরা দলে দলে পাকিস্তানী হয়ে যাচ্ছে। ওটা মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার মোহে না হিন্দুদের জায়গাজমি বেদখল করার লোভে তা বলা শক্ত। আজ যারা দলে দলে পাকিস্তানী হচ্ছে পরে তারা দলে দলে কমিউনিস্ট হবে। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করবে। আমাকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয় সেটা আমি কাফের বলে না আমি জমিদার বলে তা কী করে জানব? হিন্দু মুসলমানের বিবাদ কি ধর্মীয় বিবাদ না রাজনৈতিক বিবাদ না অর্থনৈতিক বিবাদ না সামাজিক বিবাদ? হয়তো সব ক'টা বিশেষণই ঠিক। দেশের লোক ভিতরে ভিতরে পরস্পরের কাছে পর হয়ে যাচ্ছে। এই যে এস্ট্রেঞ্জমেণ্ট এটা আপনারা সরকারী মহলে আঁচ করে থাকবেন। আমরা বাইরেও অনুভব করছি। ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া তখ্‌তে কংগ্রেস বসবে এটা ভারতের মুসলমান মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না। তেমনি ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া মসনদে মুসলিম লীগ বসবে বাংলার হিন্দু এটা মেনে নিতে পারছে না। এই হলো এস্ট্রেঞ্জমেণ্টের হেতু।" গুহ অনুমান করেন।

জজ কুঠির মালী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, মা, ওই যে ওরা বলছে পাকিস্তান হবে সেটা কী?"

যুথিকা উত্তর দিয়েছিল, "পাকিস্তান হলে মুসলমানদের আপনার বলতে একটা রাজ্য হবে।"

"সে রাজ্যে আপনারা থাকবেন না?" মালী প্রশ্ন করেছিল।

"কেমন করে থাকব, বলো? আমরা যে হিন্দু।" যুথিকার উত্তর।

"না, মা, এটা ভালো নয়।" মালী দুঃখিত হয়।

এর কিছুদিন পরে মালী এসে নালিশ করে, "মা, মোল্লারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে আমি যদি পাকিস্তানকে ভোট না দিই তবে আমি মারা গেলে আমাকে কেউ কাঁধ দেবে না। তা হলে কী হবে, মা? আমার দাফন হবে না?"

সাংঘাতিক নালিশ। কিন্তু যুথিকা নিরুপায়। মানসও তাই।

মালী ভোট দিয়ে এল ঠিকই। কাকে সেকথা মানস বা যুথিকা জানতেও চায়নি, সেও জানায়নি। ভোটের ফলাফল যখন জানা গেল তখন দেখা গেল লীগ প্রার্থীরা অন্য সব মুসলিম প্রার্থীদের পরাস্ত করে বাংলার আইন সভার ১২৩টি মুসলিম আসনের ১১৫টি জয় করেছেন। কংগ্রেসের আসন-সংখ্যা ৬২টি।

মুসলিম লীগই তফসীলভুক্ত জাতি ও অন্যান্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করবে বোধ হয়।

এর পরে একদিন কামালউদ্দীন আহমদ বলে এক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করতে আসেন। "আমাকে চিনতে পারছেন? কলকাতায় মীর সাহেবের ওখানে আলাপ। লিবারল হিউম্যানিস্ট গ্রুপ। মনে পড়ে?"

"বুঝেছি। কৃষক প্রজা দলের মুখপাত্র। তাদের এক পত্রিকার সম্পাদক। তা আপনি এখানে কেন? পার্টির কাজে এসেছেন?" মানস জানতে চায়।

"আমি এই জেলারই লোক। কলকাতায় কর্মোপলক্ষে থাকা। কাগজটা উঠে গেছে। এখন আমার পেশা ওকালতী। কিন্তু আজ আমি উকীল হিসাবে আসিনি। মীর সাহেব চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছেন। আলাপ করতে এসেছি।" কামালউদ্দীন বলেন।

একথা সেকথার পর নির্বাচনের প্রসঙ্গ ওঠে। "কাজী নজরুল লিখেছেন, কামাল, তুনে কামাল কিয়া, ভাই। আপনি কি কামাল করেছেন?" মানস সুধায়।

"এ বড়ো নিষ্ঠুর রসিকতা! আমার জামানত বাজেয়াপ্ত হতে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, আমি যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি এর মানে আমি সাচ্চা মুসসমান নই, আমাকে বয়কট করা হবে, আমি উকীলহিসাবেও মুসলমানদের মামলা চালাতে পারব না। আমাকে বাধ্য হয়ে হিন্দুর উপর নির্ভর করতে হবে। তখন শুনতে হবে আমি একজন প্রচ্ছন্ন হিন্দু। কামাল তো নয়, কমল।" তিনি উত্তর দেন।

মানস দুঃখিত হয়। "কিন্তু কৃষক প্রজা পার্টির অমন ভরাডুবি হলো কেন? ছিল কংগ্রেসের পরে সব চেয়ে যড়ো দল, এখন সব চেয়ে ছোট। মাত্র পাঁচটি আসন।"

"এর জন্যে দায়ী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড ও সেকেণ্ড। প্রথম জন কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড জারি করে বাংলার কংগ্রেসের দফা রফা করেছেন। কংগ্রেস কোনো কালেই বাংলাদেশের আইনসভায় মেজরিটি পাবে না, সুতরাং এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। দ্বিতীয় জন কৃষক প্রজাদলের প্রসাদে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করে আসেন। ভেবেছিলেন দেশভাগ হলে বাংলাদেশের জন্যে আলাদা একটা পাকিস্তান হবে, তিনিই সেখানকার প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাঁর কোনো উপরওয়ালা থাকবে না। লাহোরের সেই প্রস্তাবের উপর খোদকারি করে জিন্না সাহেব যা খাড়া করেছেন তা একাধিক নয়, একটিমাত্র পাকিস্তান। বাংলাদেশ তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ছাড়া আর কিছু নয়। হক সাহেব পাকিস্তানের উচ্চতম ক্ষমতার অধিকারী হবেন না। জিন্না সাহেব তাঁর উপরওয়ালা হবেন। হক সাহেবের জিন্নাবিরোধী ভাব দেখে মুসলিম লীগ তাঁকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু কৃষক প্রজা দলের চরিত্র আর অসাম্প্রদায়িক থাকে না। হিন্দুরা তাদের মুসলিম সাথীদের অবিশ্বাস করে। ক্রমশই মুসলিম জনমত পাকিস্তানের অভিমুখে যায়। কৃষক প্রজা দল পাকিস্তান চায় না শুনে মুসলমান কৃষক প্রজারাও দলের উপর আস্থা হারায়। তাদের ধারণা পাকিস্তান হচ্ছে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। মুসলমান হিসাবে স্বার্থরক্ষা। দলপতির সঙ্গে দলের বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি এবারেও আসন লাভ করেছেন বটে, কিন্তু দলের টিকিটে নয়। লেবার পার্টির র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের মতো নিঃসঙ্গ। বোধহয় ভাবছেন মুসলিম লীগ তাঁকে নেতা করে নেবে। কিন্তু নেতা এখন সুহরাবর্দী। প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই। হক সাহেবকে

অরণ্যবাস করতে হবে। যে নিজের দলকেই ডোবায় কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।" কামালউদ্দীন তিক্তস্বরে বলেন।

"একজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এত বড়ো বিপর্যয় তো ব্রিটেনেও হয়নি, কামাল সাহেব। নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।" মানস সন্দেহ করে।

"পাকিস্তানের হুজুগ। লীগপন্থীদের ছল বল কৌশল। ইস্পাহানীর টাকা। দুর্ভিক্ষের মরসুমে তো কম রোজগার করেনি। কিন্তু সকলের উপর জিন্না সাহেবের হাতযশ। এক ঢিলে তিনি দুই পাখী নয়, পাঁচ পাঁচটা পাখী মেরেছেন। প্রথমে মেরেছেন মুসলিম লীগ ব্যতীত মুসলমানদের বা মুসলমানযুক্ত যতগুলো দল আছে সব ক'টা দল। কৃষক প্রজা, ইউনিয়নিস্ট, কংগ্রেস মুসলিম, ন্যাশনালিস্ট মুসলিম, আহরার ইত্যাদি। তার পরে মেরেছেন জমিদার ও ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণীর শ্রেণীশত্রুদের। কমিউনিস্টরা পর্যন্ত এখন মারের ভয়ে পাকিস্তানের কলমা পাঠ করছে। পাকিস্তানে কোনো দিনই ওরা মাথা তুলতে পারবে না। বিপ্লবের পাখীটিকে খতম করে দিয়েছেন জিন্না। তার পরের ঘায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম জখম। ইণ্ডিয়ান নেশনের পা দুটো কেটে নিয়ে পাকিস্তান বানানো হবে। ইণ্ডিয়ান নেশন দাঁড়াবে কিসের উপরে? এর পরের ঘায়ে ডেমোক্রাসী খতম। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষ থাকে, বিরোধী পক্ষই পরে নির্বাচনে জিতলে সরকার পক্ষ হয়। পাকিস্তানে বিরোধী পক্ষ বলে কেউ থাকবে না। কৃষক প্রজা, ইউনিয়নিস্ট প্রভৃতি তো হারাম। কংগ্রেস দল তো হিন্দু নেশনের সামিল, সুতরাং এলিয়েন। চারটে চিড়িয়ার পরে আরো একটা থাকে। বাংলা দেশে মুসলিম নেশনের নিশান উড়িয়ে অবাঙালী মুসলমানরা আসবেন বাংলাদেশ জয় করতে। তাঁরাই হবেন সিভিল ও মিলিটারি অফিসার। ধনিকও তাঁরাই, উচ্চতন পর্যায়ের রাষ্ট্রপতি, দলপতি ও সেনাপতিও তাঁরাই। আরবী, ফারসী, উর্দূ শিখে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হতে না পারলে বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ থাকবে না। কিন্তু তাঁরা তো তখন আর বাঙালী মুসলমান নন, তাঁরা পাকিস্তানী ন্যাশনাল।"

মানস স্বীকার করে কায়দে আজমের বাহাদুরি আছে। কিন্তু মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীতে অন্যান্য মুসলিম দলগুলিকে হারিয়ে দিলেই তো ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার অন্যান্য দলগুলিকেও হারিয়ে দেওয়া হয় না। সেখানে

যদি পাকিস্তান প্রস্তাব তোলা হয় অধিকাংশ ভোটে পরাজিত হবে। শেষপর্যন্ত দেখা যাবে নির্বাচনই ভবিষ্যৎ জয় নিয়ামক নয়।

"তা হলে কি গৃহযুদ্ধ?" কামাল সাহেব জিজ্ঞাসু।

"তা খাড়া আর কী? পাঁচ পাঁচটা চিড়িয়ার সঙ্গে লড়তে হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ, আসামের হিন্দু ও ট্রাইবাল, বাংলাদেশের তথাকথিত বর্ণ হিন্দু, সর্ব ভারতের কংগ্রেস। গৃহযুদ্ধে এদের সবাইকে হারিয়ে দিলে শুধু পাকিস্তান কেন, তামাম হিন্দুস্থান কায়দে আজমের পদানত হবে। মোগল আমল আবার ফিরে আসবে। আমরা হিন্দুমাত্রেই আবার জিজিয়া কর দেব। যাদের উপর কর বসানো হবে তাদের প্রতিনিধিদের মতামত শুনতে হবে না। আইন সভা তুলে দিলেও চলবে। জিন্না সাহেবকে আমরা ডেমোক্রাট বলেই জানতুম। তিনি কোথায় নেমে গেছেন দেখে দুঃখ হয়। তিনি যখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা ছিলেন তখন তাঁর দলে হিন্দুও ছিলেন, পার্শীও ছিলেন। দলটি ছোট, কিন্তু তার হাতে ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার। সে কখনো সরকারকে জিতিয়ে দেয়, কখনো কংগ্রেসকে। সেই দল ভেঙে দিয়ে তিনি হয়েছেন মুসলিম লীগের নেতা। এখন তাঁর হাতে ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার নেই। যা নেই তাকে ফিরিয়ে আনতে চান প্যারিটির ছদ্মবেশে। কংগ্রেস কেন রাজী হবে? তাঁর শেষ ভরসা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নতুন এক রোয়েদাদ। এবার তার রূপ হবে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। কিন্তু কংগ্রেস যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে আইন অনুসারে দেশভাগ হবার নয়। হলে হবে বেআইনী ভাবে। তলোয়ারের জোরে। শুনছি পাঞ্জাবে তার তোড়জোড় চলছে। মুসলিম মেয়েদেরও হাতিয়ারের তালিম দেওয়া হচ্ছে। শিখরাও কম যায় না। বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল। অবস্থা যে অগ্নিগর্ভ তা আঁচ করতে পারছি। বাংলাদেশের মুসলমানরা লড়াই করে পাকিস্তান নিতে চায় তো দশ আনা পেতে পারে, ষোল আনা নয়। আসামে পেতে পারে ছয় আনা। তাতে কি তাদের মন ভরবে? বাংলা ভাগ, আসাম ভাগ কে চায়?" মানস তো চায় না।

"না, না, বাংলা ভাগ নয় আসাম ভাগ নয়। ভাবতেই পারা যায় না। মুসলিম লীগ যদি তাতে রাজী হয় পরের বার নির্বাচনে হেরে যাবে। অবশ্য নির্বাচন যদি আবার হয়। অকারণে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষেপে

গেলে তারা যে কতদূর যেতে পারে তা তো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার' লুণ্ঠনের সময়ই প্রমাণ হয়েছে। না, বাংলাদেশকে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেব না। হিন্দু মুসলমান একমত হয়ে যেটা করবে সেটাই হবে। কংগ্রেস লীগ একমত হবে কি-না সন্দেহ। কিন্তু তারাই তো সব নয়। সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চায়।" কামাল এবার ওঠেন।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মুসলিম লীগ নেতা খান্ বাহাদুর মনিরুজ্‌জামান মানসকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পাশে বসিয়ে বলেন, "চোখ বুলিয়ে দেখুন আজকের অতিথিদের অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে আমার ভেদবুদ্ধি নেই। আমার বন্ধুদেরও অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান। কিন্তু রাজনীতি করতে গেলে ভেদজ্ঞান করতে হয়। নইলে ভোট মেলে না। এবার তো আমাকে মন্ত্রী করা হবে। সেটা নির্ভর করবে মুসলিম ভোটের উপরেই। কী করি, বলুন। এখানকার হিন্দুরাও তো চান যে আমি মন্ত্রী হয়ে জেলার কিছু উপকার করি। আমাকে দিয়ে যেটুকু সম্ভব সেটুকু নিশ্চয়ই করব। তাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই লাভ। পাকিস্তানের স্লোগান দিয়ে ভোটে জিতেছি বটে, কিন্তু পাকিস্তান আমার অন্তরের কথা নয়। ওটা একটা বার্গেনিং কাউন্টার। ওর বিনিময়ে কংগ্রেস নেতারা কী দেবেন দেখা যাক। যদি সারবান কিছু হয় তবে পাকিস্তান মুলতুবি রাখা হবে। দশ বছর শিকেয় তোলা থাকলেও কেউ তাড়া দেবেন না। পাকিস্তান চাই বলেছি। কবে চাই তা তো বলিনি। ধরুন, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের যদি সব ক'টি প্রদেশে কোয়ালিশন হয়ে যায়—একটি বাদে—তা হলে কেনই বা লীগ পাকিস্তানের জন্যে চাপ দেবে?"

"একটি বাদে? কোন্‌টি বাদে?" মানস কৌতূহলী হয়।

"উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। কংগ্রেস মুসলিমদের সঙ্গে লীগ মুসলিমরা এক টেবিলে বসবে না। কংগ্রেস মুসলিমদের সরে যেতেই হবে। হ্যাঁ, অন্যান্য প্রদেশেও। আর কেন্দ্রে যদি কোয়ালিশন হয় তবে কেন্দ্রেও। কায়দে আজমের আরো কয়েকটা শর্ত আছে, কিন্তু আমরা তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করব। কংগ্রেসের উপর বেশী চাপ দিলে কোয়ালিশনই হবে না, কোয়ালিশন না হলে পার্টিশনই আমাদের মতে একমাত্র বিকল্প। কিন্তু এই মুহূর্তে পার্টিশনের জন্যে আমরা ব্যগ্র নই। তার চেয়ে ব্রিটিশ শাসিত কেন্দ্রই

ভালো। ইংরেজরা চলে যাক এটা আমাদের অন্তরের কামনা নয়।" খান বাহাদুর কবুল করেন।

মানস হেসে বলে, "কিন্তু ওরা তো আপনি চলে যাচ্ছে। বার্লো চলে গেছেন, হ্যামিলটন বদলীর হুকুম পেয়েছেন। আপনি কোথায় আছেন, খান্ বাহাদুর? একদিন লাট সাহেবও চলে যাবেন, তারপর চলে যাবেন জঙ্গীলাট আর বড়লাট। হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি একটা হবেই। আপনারা সেইরকম একটা স্কীম তৈরি করে কংগ্রেস নেতাদের দিন। জিন্না সাহেবকে বড়লাট পদ দিতে কংগ্রেস রাজী হতে পারে। গান্ধীজী ওপদ নেবেন না। কোনো পদই নেবেন না। জঙ্গী লাট পদটা একজন শিখ নেতাকে দিতে হবে। তিনি হবেন ডিফেন্স মেম্বর। প্রধান মন্ত্রী বলে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে নেহরুর খাতিরে। মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কিন্তু ক্যাবিনেট থেকে বাদ দিলে চলবে না।"

খান বাহাদুর দুই কানে আঙুল দেন।

॥ চৌদ্দ ॥

সেদিন খান বাহাদুর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আখতারউজ্জামানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাপের অবকাশ হয়নি। আলাপের জন্যে একটা দিন ফেলা হয়েছিল। সেই অনুসারে তিনি সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে এসে বিলিয়ার্ড খেলায় যোগ দেন। বিলেতফের্তা ব্যারিস্টার। কলকাতায় প্র্যাকটিস করেন কিন্তু নিবাস এই শহরেই। সেইসূত্রে ক্লাবের মেম্বর।

খেলার পর ড্রিঙ্কস হাতে নিয়ে নিভৃত কক্ষে আলাপ। মানসের হাতে সফ্‌ট ড্রিঙ্ক। তাঁর হাতে ছোটা পেগ।

"চাচাজান প্রস্তাব করেছিলেন আমি যেন তাঁর কন্যারত্নকে উদ্ধার করি আর তাঁর প্র্যাকটিসের উত্তরাধিকারী হই। তিনি এখন থেকে মুসলিম লীগের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। কায়দে আজম তাঁকে বিশেষ করে চেয়েছেন। কিন্তু আমি কি সহজে ধরাছোঁয়া দিই? বিলেত থেকে ফিরে আমি কলকাতায় বসেছি। এখনো এক বছর হয়নি। হ্যাঁ, যুদ্ধের সময়

আটকা পড়েছিলুম। আমি ক্যালকাটা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর মেম্বর। আমার জাতই আলাদা। আমি কি বার এসোসিয়েশনের মেম্বরের মেয়েকে সাদী করতে পারি? হলোই বা পরভীন আমার সোদর চাচাতো বোন।" তিনি মশগুল হয়ে বলেন।

"সোদর চাচাতো বোন!" মানস ভুল ধরে।

"আহা! এদিককার লোক সেইরকমই বলে। আদালতে শুনে থাকবেন। বলতে চায় আপন চাচাতো বোন। মুসলিম সমাজে অতি উত্তম সম্বন্ধ। কিন্তু ওই যে বলেছি আমার জাতই আলাদা। আমি বিলেতফের্তা ব্যারিস্টার। আমাকে তো আমার ব্যারিস্টার সমাজে সমানভাবে মেলামেশা করতে হবে। পরভীন আমার আদরের বোন। কিন্তু ওকে আমি মদ ধরাতে পারব না। ক্লাবে নিয়ে এসে টেনিস খেলাতে পারব না। মফঃস্বলের মুসলিম সমাজ আমাদের বয়কট করবে। কলকাতার জীবন অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চাচাজানকে বলেছি আমি পাঁচ হাজারী মনসবদার না হয়ে সাদী করব না। লাগে লাগবে পাঁচ বছর।" তিনি জমিয়ে বসেন।

"চাচাজান ততদিন সবুর করবেন কেন?" মানস মন্তব্য করে।

"জানতুম। তিনি লোকাল বারের এক দু' হাজারী উকীলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বয়সটা একটু বেশী। আগেও তাঁর একবার বিয়ে হয়েছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। পরভীনের যেমন ভাগ্য। কাঁদছে। বিয়ের পর মেয়েরা অমন একটু আধটু কাঁদবেই। পরে সব সয়ে যাবে। চাচাজান যদি মন্ত্রী হন তাঁর দামাদ উকীল সরকার হবেন। তার পরে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। বৌকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন। ওদিকে আমার নিজস্ব একটা লাইব্রেরীই নেই। মিস্টার শরৎ বোস দয়া করে তাঁর লাইব্রেরীতে বসে পড়তে দিয়েছেন। ওয়ান অভ্ দ্য বেস্ট। নিজেও তিনি অগাধ পণ্ডিত। তাঁর রোরিং প্র্যাকটিস। পলিটিকসের জন্যে সময় কখন? নইলে নেহরুর সঙ্গে টককর দিতেন।" আখতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন।

"দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কী ভাবছেন?" মানস সুধায়।

"বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান তাঁর মতে এক মায়ের সন্তান। আক্ষরিক অর্থে। ধর্মটাই পৃথক, আর সব এক। কাজেই বাংলাদেশ দু'ভাগ করা চলবে না। হিন্দুরা যদি পাকিস্তানে থাকতে না চায় আর মুসলমানদের যদি অখণ্ড ভারতে আপত্তি থাকে তবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বঙ্গ কেন নয়? কিন্তু কেউ তেমন

সাড়া দিচ্ছেন না। আমিই বোধ হয় তাঁর একমাত্র সাগরেদ। তবে তিনি এবার সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে যাচ্ছেন, দিল্লীই হবে তাঁর কর্মক্ষেত্র। কংগ্রেস থেকে তাঁকে পার্লামেণ্টারি লীডার করার প্রস্তাবও এসেছে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন দেশ যাতে অখণ্ড থেকে যায়। তার জন্যে অবশ্য মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা চাই। তার মানে জিন্না সাহেবের সঙ্গে। তিনিই তো মুসলিম লীগ। আর সবাই তাঁর ডিটো।" ব্যারিস্টার বলেন।

"আপনি কি আশাবাদী ?" মানস প্রশ্ন করে।

"সেদিন লক্ষ করলেন না মওলানা সাহেবের নাম উল্লেখ করায় চাচাজান কেমন কানে আঙুল দিলেন ? আজাদ থাকতে জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। গান্ধীজীর সঙ্গে কথা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। তা হলে কি নেহরুর সঙ্গে ? তিনিও তেমনি নাছোড়বান্দা। আসফ আলীকে, কিদ্‌ওয়াইকে, ডাক্তার খান্ সাহেবকে তিনি বর্জন করবেন না। এঁরা থাকতে কোয়ালিশন হয় কী করে ? তবে বাংলাদেশে তেমন কোনো ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নেতা নেই যাঁকে বর্জন করার কথা উঠতে পারে। নওশের আলী তো নির্বাচনে হেরে গেছেন। কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সহজেই হতে পারে, আজাদ আর জিন্না যদি অনুমতি দেন। সেটা আবার নির্ভর করছে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লী আর ইনটারিম গভর্নমেণ্ট গঠনের উপরে। আপনার পক্ষে আশার একটা কারণ আছে।" আখতার বলেন।

"কী কারণ ?" মানস জানতে চায়।

"ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে মেজরিটির শাসনতান্ত্রিক প্রগতিতে মাইনরিটি ভীটো দিতে পারবে না। ভীটো দেবার ক্ষমতা কারো হাতে নেই। নৌসেনাদের বিদ্রোহের পিঠ পিঠ এই ঘোষণার মর্ম ব্রিটেন আর দায়িত্ব বইতে চায় না। ঘাড় থেকে যত শীগগির পারে বোঝা নামাতে চায়। কিন্তু মিস্টার জিন্নার তো ভীটো ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যদি কংগ্রেস মুসলিম যান লীগ মুসলিম সেখানে যাবেন না। কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে যদি কংগ্রেস মুসলিম যান লীগ মুসলিম সেখানেও যাবেন না। তার মানে একটা পা যদি অচল হয় আরেকটা পা চলতে পারে না। অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। অগত্যা জিন্নাকে তাঁর দাম দিতে হবে। সে দাম পাকিস্তানও হতে পারে, তার বিকল্পও হতে পারে। যেখানে কংগ্রেস লীগ সদস্যদের সমান ওজন।" আখতার ইঙ্গিত করেন।

"কাউন্সেল অভ্ ডেস্পেয়ার। আরো দুটো একটা বিদ্রোহ না হলে কারো হুঁশ হবে না। আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ।" মানস হাল ছেড়ে দেয়।

"কংগ্রেস লীগ সদস্যদের সমান ওজন হলে কি অন্যায় হবে?" আখতার বিস্মিত।

"হবে না? পৃথিবীতে এমন কোন গণতন্ত্র আছে যার পার্লামেন্টে শতকরা বাইশ জনকে শতকরা পঞ্চাশটা আসন দেওয়া হয়? তা হলে অপর পক্ষের শতকরা আটাশটা আসন জোর করে কেটে নেওয়া হয়। যাদের আসন কাটা যাবে তারা বিদ্রোহ করবে না? কংগ্রেসের ভিতরে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটবে। হিন্দুদের ভিতরেও। ওজন তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সেটাকে আরো বাড়িয়ে প্যারিটি করা কারো সাধ্য নয়। অমন করলে কংগ্রেসও ইন্টারিম গভর্নমেন্টে বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যাবে না। মুসলিম লীগ গেলে খোলা মাঠে গোল দেবে। তাই হোক।' মানস বিরক্ত হয়।

"তা হলে বিকল্প নেই, মিস্টার মল্লিক।" আখতার ক্ষুণ্ণ হন।

মানস গম্ভীরভাবে বলে, "কত কাল পরে স্বাধীনতার সুযোগ এল। স্বাধীন হয়েই যদি মুসলমানরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁদের অংশের নাম হবে পাকিস্তান আর পাকিস্তানী মানে মুসলিম ও মুসলিম মানে পাকিস্তানী তবে একজনও হিন্দু পাকিস্তানে বাস করবে না। বাংলাদেশের সবটাই যদি পাকিস্তানের সামিল হয় তবে পৌনে তিন কোটি বাঙালী হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে বিহারে, ওড়িশায়, যুক্ত প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে আশ্রয় নেবে। তাদের শূন্যতা পূরণ করবে ওইসব প্রদেশের সমসংখ্যক উর্দুভাষী মুসলমান। ওরাই হবে শতকরা পঁয়তাল্লিশ। আসাম জুড়লে শতকরা আটচল্লিশ। তপ্ত কটাহ থেকে আপনারা ছিটকে পড়বেন জলন্ত আগুনে। বাংলার লীগপন্থী নেতারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কাগজে লিখেছে, লর্ড পেথিক-লরেন্স জিন্না সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, মিস্টার জিনা, আপনি কি ইণ্ডিয়ান নন? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, না, আমি ইণ্ডিয়ান নই। তিনি হিন্দু নন বলে যে ইণ্ডিয়ানও নন এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই মনোভাব যদি নয় কোটি ভারতীয় মুসলমানের হয় তবে লোকবিনিময় রোধ করা যাবে না। এটা একটা সর্বনেশে থিওরি। ইংরেজ চলে যাচ্ছে বলে কোটি কোটি হিন্দু ও কোটি কোটি মুসলমানও যে যার ঘরবাড়ী ক্ষেতখামার মন্দির মসজিদ ছেড়ে চলে যাবে এটা তো স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার নয়, অপব্যবহার।"

হকচকিয়ে যান আখতার সাহেব। এত কথা তিনি জানতেন না। বলেন, "যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। কেউ বাংলার বাইরে যাবে না, কেউ বাইরে থেকে আসবে না! দুঃস্বপ্ন! নাইটমেয়ার! জিন্না, লিয়াকৎ আলী এলেও আমরা তাঁদের ফেরৎ পাঠাব। ইচ্ছা করলে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে পারেন।"

"কিন্তু তাঁরা যেখানে যাবেন সেইখানেই তো হবে রাজধানী। তাতে কলকাতার কী লাভ? আমাদের পক্ষে দিল্লীই তো নিকটতর, লাহোর দূর অস্ত। যদি জানতুম যে কলকাতাই রাজধানী হবে, তার পূর্ব মহিমা ফিরে আসবে, তা হলে না হয় পার্টিশন সমর্থন করতুম। তবে ওই নামটা নয়। ওটা পালটে দিতে হতো।" মানস ইঙ্গিত করে।

সম্ভবপর নাম নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। কোনোটাই দু'জনের পছন্দ হয় না। আপাতত পাকিস্তানই মেনে নিতে হয়।

"ধন্যবাদ, মল্লিক সাহেব। আপনি আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। এবার আমিও আপনাকে এমন কিছু বলব যাতে আপনারও চোখ ফোটে।" আখতার বলেন।

"সে কেমন কথা?" মানস আশ্চর্য হয়।

"সাত বছর আগে আমরা বাঙালী মুসলমান ছিলুম। ইতিমধ্যে এমন কী হলো যার ফলে আমরা আজ পাকিস্তানী মুসলমান হয়েছি বা হতে চাইছি? সেটা আর কিছু নয়, কায়দে আজম আমাদের আশা দিয়েছেন যে বাঙালী মুসলমান হিসাবে শুধুমাত্র সীলেট নয়, পাকিস্তানী হিসাবে অসমীয়াভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল সমেত সমগ্র আসামই আমরা পাব। আমাদের ভূমিহীন চাষীরা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। দশ বিশ বছরের মধ্যে আসাম প্রদেশও মুসলমানপ্রধান ও বাঙালীপ্রধান হবে। তাতে আপনাদেরও তো লাভ। কিন্তু ওই যে আপনি বললেন, পাইকারী হারে লোকবিনিময় যদি হয়ে যায় তবে উর্দুভাষী মুসলমান এসে বাংলাভাষী মুসলমানদের কিস্তিমাৎ করবে।" আখতার স্বীকারোক্তি করেন।

"গুড গড, মিস্টার জামান।" মানস মাথায় হাত দিয়ে বসে। "এক ঢিলে ক'টা পাখী আপনারা মারবেন? পাঁচটা মেরেও সন্তুষ্ট নন। আরো একটা মারবেন? আসাম?"

"পাঁচটা পাখী কী বলছেন, বুঝতে পারলুম না।" আখতার বলেন।

কামালউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল মানস তার বিবরণ দেয়। "কামালউদ্দীনও জানতেন না যে আরো একটা পাখী মরবে।"

আখতার লজ্জিত হন। "কংগ্রেস কক্ষনো এতগুলো দাবী মানবে না। একমাত্র ভরসা ইংরেজ। তাদেরই বা এমন কী গরজ যে মুসলিম লীগের পক্ষ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে যাবে? বিশেষত যাবার মুখে। যদি সত্যি সত্যি যায়!"

"না গেলে মুসলিম লীগের সাহায্যে একটার পর একটা মিউটিনি দমন করতে হবে। দুর্ভিক্ষেরও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষকে দমন করার উপায়ও নিশ্চয় মুসলিম লীগ বাতলে দেবে। যেমন তেতাল্লিশ সালে দিয়েছিল। আমি তো বলি জিন্না সাহেবকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে ইংরেজরা তাঁর মাথার উপরে রাজছত্র ধরুক। কংগ্রেস জেলে ফিরে যাক। মহাত্মা সেদিন কাকে যেন বলেছেন, জবাহরলাল কেন ওদের চোয়ালের ভিতর ঢোকার জন্যে ছুটে যাচ্ছেন? ব্যস্ততাটা জবাহারলাল আর আজাদেরই বেশী। গান্ধীজীর তো নয়ই, বল্লভভাইয়েরও নয়। বড়লাটকেই এঁদের কাছে ছুটতে হবে, এঁদেরকে বড়লাটের কাছে নয়। আগ্নেয়গিরি শিখরে বসে বড়লাট কতদিন লাভাবর্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন দেখা যাক। লর্ড ওয়েভেল সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা থেকে অপসরণ করেছেন, এবার ভারত থেকেও অপসরণ করবেন। যদি সব দিক সামলাতে না পারেন। ওদিকে ইউরোপীয় অফিসাররা ঘরমুখো। তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও পেনসন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যেও একটা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট প্রয়োজন। সেটা গঠন করা জিন্না সাহেবের প্রথম কর্তব্য হবে, যদি তিনি বড়লাটের আমন্ত্রণ পান। এক ঢিলে ছয় পাখী মারা তো পরের কথা।" মানস উপহাস করে।

"আপনি কি মনে করেন কংগ্রেস আবার জেলে ফিরে যাবে? আট আটটা প্রদেশের মন্ত্রীপদ ত্যাগ করবে? কেন্দ্রে অর্ধেক রাজত্বের প্রস্তাব উপেক্ষা করবে? আজাদকে বর্জন করলে এমন কী ক্ষতি হবে?" আখতার ভেবে পান না।

"আজাদ সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বন্দী হয়ে আসছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম গান্ধীজীরও পূর্বের। নৈতিক বলুন, রাজনৈতিক বলুন তাঁর দাবী কারো চেয়ে কম নয়। সাম্প্রদায়িক কারণে তাঁকে বর্জন করলে কংগ্রেস তার নিজের মুখে চূণকালি মাখবে। এর পরে

যদি সংগ্রামের দরকার হয় একজনও মুসলমান কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেবে না। মুসলিম নির্বাচকদের ভোট কংগ্রেস প্রার্থীরাও বহু ক্ষেত্রে পেয়েছেন, তবে বহুল পরিমাণে নয়। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই আছে, তাই কংগ্রেস শুধু হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নয়। কংগ্রেস চায় সেকুলার স্টেট, আমেরিকা যার আদর্শ। দুঃখের বিষয় ইংরেজদের এটা বিশ্বাস হচ্ছে না, পাছে তাঁদের মুসলিম মিতাদের মামলা দুর্বল হয়। বেশ তো, তাঁরা তাঁদের মুসলিম মিতাদের নিয়ে যতদিন চালাতে পারেন, চালান। কে তাঁদের পায়ে ধরে সাধছে যে কংগ্রেসকেও সঙ্গে নিতে হবে, তার জন্যে আজাদকে বিসর্জন দিতে হবে। এটা ক্রিকেট নয়। কংগ্রেসকে ডাকলে সে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের তিনজন নেতাকেই নেহরুর সাথী করবে।" মানস যতদূর জানে।

"কিছু মনে করবেন না, মল্লিক সাহেব। আজাদের মহত্ব আমিও মানি। কিন্তু ভারতের নিয়তি নির্ভর করছে কংগ্রেস লীগ মীমাংসার উপরে। জিন্নাকে বাদ দিয়ে সে মীমাংসা হতে পারে না। আজাদকে বাদ দিয়ে হতে পারে। তিনি যদি সরে দাঁড়ান মীমাংসা সুগম হয়।" আখতার বলেন।

মানস হেসে বলে, "কিন্তু তিনি সরে গেলেও তো ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা থেকে কংগ্রেসের ক্রুট মেজরিটি সরে যাবে না। সরকার মনোনীত সদস্যরা যদি নিরপেক্ষ থাকেন। জিন্নার মাথাব্যথার কারণ কংগ্রেসের ওই ক্রুট মেজরিটি। কংগ্রেস যেমন ব্রিটিশ সরকারের ক্রুট ফোর্সের কাছে সারেণ্ডার করবে না জিন্না সাহেবও তেমনি কংগ্রেসের ক্রুট মেজরিটির কাছে সারেণ্ডার করবেন না। তাঁকে নিষ্কণ্টক করতে হলে কংগ্রেসের ক্রুট মেজরিটিকেও সরাতে হবে। শুধু আজাদকে নয়। ওয়েটেজ, প্যারিটি ইত্যাদি কত রকম দাবী ওঁর ঝুলিতে! সেসব একে একে বেরোবে। কংগ্রেস একে একে প্রত্যেকটি খারিজ করবে, কারণ তার মেজরিটির পায়ের তলায় রয়েছে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের অফুরন্ত সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ মানুষের কারাবরণ। হাজার হাজার কর্মীর ত্যাগ ও সেবা। নেতাদের পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়। দীর্ঘকালের ঐকান্তিক সাধনার ফলে সে যদি মেজরিটি পেয়ে থাকে তবে সেটা জনসাধারণের আস্থার জোরে। গায়ের জোরে বা মন্ত্রের জোরে নয়। কংগ্রেসের সেই কষ্টার্জিত মেজরিটিকে ক্রুট মেজরিটি বা হিন্দু মেজরিটি বলে খাটো করতে গেলে মীমাংসা কারো সঙ্গেই হবার নয়। না

মুসলিম লীগের সঙ্গে, না ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে। আজাদের অবশ্য সরে যাবার সময় হয়েছে। তিনি ছ'বছর ধরে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট।"

"কিন্তু আমি বলছিলুম ইনটারিম গভর্নমেণ্ট ও কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা। মীমাংসা তো সেই দুটি ফোরামেই হবে। সে দুটি ফোরামে যদি আজাদ থাকেন তবে জিন্না থাকবেন না বলেই আমার ধারণা। আর জিন্নাই তো হ্যামলেট নাটকের প্রিন্স অভ্ ডেনমার্ক। তিনি না থাকলে নাটক জমবে না।" আখতার ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

মানস চমকে ওঠে। সে কখনো এ লাইনে ভাবেনি। "কিন্তু এই আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে বড়লাট কী করে সরকার চালাবেন? কতদিনই বা চালাতে পারবেন? মীমাংসা জরুরি। মীমাংসা হবেই। নয়তো লাভাবর্ষণের সময় বিনা মীমাংসায় অপসরণ করতে হবে।" মানসও ভবিষ্যদ্বাণী করে।

'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। গান্ধীর চেয়ে জিন্না দড়। এ বছরটা জিন্নার বছর। যেমন ১৯৪২ সালটা ছিল গান্ধীর বছর। জিন্না ডাক দিলে তুলকালাম কাণ্ড বাধবে।" আখতার আশঙ্কা করেন।

"তা যদি হয় তবে শাপে বর হবে। ইংরেজরা আরো আগে কুইট করবে। ডিভাইড করারও সময় পাবে না। আজাদও বাদ নন, জিন্নাও বাদ নন, বড়লাটই বাদ। ত্রিভুজের একটা ভুজ বাদ গেলে বাকী দুটোর মধ্যেই মীমাংসা হবে। এক দফা গৃহযুদ্ধের পর সন্ধি। সে দুটো ভুজও বড়ো আর ছোট। মেজরিটি আর মাইনরিটি। মীমাংসা যেটা হবে সেটা সমানে সমানে নয়, অসমানে অসমানে। মুসলিম লীগ কলকাতা পাবে না, দিল্লী পাবে না, লাহোর পাবে কি-না সেটা নির্ভর করবে শিখ মাইনরিটির উপরে, হিন্দু মেজরিটির উপরে নয়।" মানস সেটা অনিশ্চিত রেখে দেয়।

"কিছু মনে করবেন না, মল্লিক সাহেব, সেই যে একটা কথা আছে না, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। তেমনি এক কাঁকুড় হচ্ছে সারা বাংলাদেশ আর তেমনি এক বীচি হচ্ছে কলকাতা মহানগরী। বাঙালী হিন্দুর মাথায় ঢুকেছে যে বারো হাত কাঁকুড়ের চেয়ে তেরো হাত বীচির গুরুত্ব বেশী। তাই সে কলকাতার জন্যে লড়বে, সারা বাংলার জন্য লড়বে না। কী করে এদের বোঝাব যে সারা বাংলার রক্ত চুষে কলকাতা আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সারা বাংলার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার রক্ত শুকিয়ে যাবে, সেটা হবে একটা মরা

শহর। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রকৃত সমাধান হচ্ছে সারা বাংলার জন্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এক রাষ্ট্র। যার রাষ্ট্রপতি একজন হিন্দু ও প্রধানমন্ত্রী একজন মুসলমান। কিংবা রাষ্ট্রপতি একজন মুসলমান ও প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্দু। শাসনতন্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত হবে যাতে এই ব্যবস্থাই হয় পার্মামেণ্ট সেটলমেণ্ট। তখন দেখবেন মুসলমানরা পাকিস্তান চাইবে না, পূর্ব পাকিস্তান তো কিছুতেই না। যে সমস্যা শরৎ বোস আর সুহরাবর্দী মিলে মিটিয়ে দিতে পারেন তার জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা কেন? ওঁরা কি বাংলার নাড়ী জানেন? বাঙালীর মন বোঝেন? লর্ড কার্জন সেটা জানতেন না। তাই একটা ঐতিহাসিক অপসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রদ করার জন্যে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন, বর্ধমানের আবুল কাসেম, কুমিল্লার আবদুল রসুল এককাট্টা হয়েছিলেন। উপায়ান্তর নেই দেখে ঢাকার নবাব মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনের শেষে সমবেত অবাঙালী মুসলমানদের নিয়ে রাতারাতি একটা পলিটিকাল সংস্থা পত্তন করেন। নাম রাখা হয় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ। হ্যাঁ, মুসলিম লীগ হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে ওঠে। যেখানে ওঠার কথা নয় সেইখানে, ঢাকায়। তেমনি পাকিস্তানও হঠাৎ ভুঁই ফুড়ে উঠছে। যেখানে ওঠার কথা নয় সেইখানে, বাংলাদেশে। পাকিস্তান শব্দটি তো বিভিন্ন প্রদেশের নামের আদ্য অক্ষর জুড়ে জুড়ে বানানো। কই, তার মধ্যে বেঙ্গলের বি কই? ওর একটা ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বাঙালী মুসলমানকে ভোলানো হয়েছে। এরাও পাইকারিভাবে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সত্যি কি ওটা বাঙালী মুসলমানের স্বার্থে? বাঙালী হিন্দুর স্বার্থে তো নয়ই। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। যার রাষ্ট্রপতি হিন্দু হলে প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান। কিংবা প্রধানমন্ত্রী হিন্দু হলে রাষ্ট্রপতি হবেন মুসলমান। ক্ষমতার বণ্টন হবে এমন ভাবে যে কোনো সম্প্রদায়ই প্রভু সম্প্রদায় হবে না। যেটা পাকিস্তান হলে অনিবার্য, অখণ্ড ভারত হলে তো অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজরা যাচ্ছে যাক, কিন্তু সেটা শাপে বর না হয়ে চিরস্থায়ী অভিশাপ হবে, যদি বাঙালী হিন্দু মুসলমান ক্ষমতা ভাগাভাগি না করে বাসভূমি ভাগাভাগি করে। কিছু মনে করবেন না, সার। আমি তো আপনার তুলনায় শিশু। এই সেদিন বিলেত থেকে ফিরেছি। দেশের রাজনীতির খেই হারিয়ে ফেলেছি! কে জানে আমিই হয়তো ভ্রান্ত।" আখতার সাহেব এক নিঃশ্বাসে বলে যান।

"না, না, আপনি ভ্রান্ত নন, মিস্টার জামান। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো। পার্টিতে পার্টিতে কোয়ালিশন যদি না হয় হিন্দু রাষ্ট্রপতি আর মুসলিম প্রধানমন্ত্রী আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ রোধ করতে অক্ষম হবেন। পার্টিশন আপনাআপনি ঘটে যাবে।" মানস আশঙ্কা করে।

"কিন্তু পার্টিশন হলে তো প্রদেশকে ভিত্তি করেই হবে।" আখতারের ধারণা।

"তেমন কী কথা আছে? অঞ্চলকে ভিত্তি করে কেন নয়? হিন্দুদের ক্রুট মেজরিটির ভয়ে যদি ভারত ভাগ হয় তবে মুসলমানদের ক্রুট মেজরিটির ভয়ে বাংলা ভাগ হবে না কেন? আমি কিন্তু কোনোটারই পক্ষপাতী নই। ক্রুট মেজরিটি আমার উক্তি বা আমার যুক্তি নয়। জিন্না সাহেবই এর জনক। মেজরিটি হলেই সে ক্রুট হবে, এটা ধরে নেওয়া ভুল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানদের মেজরিটি, কিন্তু হিন্দুরা তার জন্যে ভীত নয়, তাদের মুখে শোনা যায় না যে মেজরিটি হচ্ছে ক্রুট মেজরিটি। বাংলাদেশেও আমরা মুসলিম মেজরিটিকে ভয় করিনে, ক্রুট মেজরিটি বলিনে। কিন্তু মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন যদি না হয়, তার পরিবর্তে যদি হয় পার্টিশন, তা হলে প্রদেশের ভিত্তিতে নয়, অঞ্চলের ভিত্তিতে পার্টিশনের দাবী উঠবেই। সেটা তেরো হাত বীচির লোভে নয়, দুই নেশন থিওরির আনুষঙ্গিক মিথ্যা ও মিথ্যার আনুষঙ্গিক হিংসার প্রতিবাদে। সারা বাংলাদেশটাই হিন্দুর হোমল্যাণ্ড। তাকে মুসলিম হোমল্যাণ্ড বলে পাকিস্তানের সামিল করতে গেলে এই হবে তার উত্তর। এটা যাঁদের পছন্দ নয় তাঁরা প্রশ্নটা তুলে নিন। ভারত অবিভক্ত থাকলে বাংলাদেশও অবিভক্ত থাকবে। মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ শাসন করলে হিন্দুরাও তা মেনে নেবে। এতদিন তো মেনে নিয়েছে। আমার কথা যদি বলেন আমি মন্ত্রীদের জাত ধর্ম বিচার করিনে, পলিসি বিচার করি। অফিসারদের জাত ধর্ম বিচার করিনে, যোগ্যতা বিচার করি। রাইট ম্যান, রাইট পলিসি এইসবই বিচার্য। মুসলিম লীগের যেসব পলিসি ন্যায়সঙ্গত সেসব পলিসি আমি সমর্থন করি। মুসলিম অফিসারদের মধ্যে যাঁরা হিন্দু মুসলমান সকলের উপকার করেন আমি তাঁদের প্রশংসা করি। কেন তাঁরা পর হয়ে যাবেন, কেন আমাদের পর মনে করবেন, এর কোনো সঙ্গত কারণ আমি জানিনে। ইংরেজরা চলে যাবে বলে মুসলমানরাও চলে যাবে এটা কি ইতিহাসের নির্দেশ? না দুই নেশন থিওরির পরিণাম? সব চেয়ে দুঃখের

বিষয় সাধারণ নির্বাচনে এই থিওরি অধিকাংশ মুসলমানের ভোট পেয়ে জিন্না সাহেবের উপর আস্থা প্রমাণ করেছে। তিনি এখন সেই ভোটের জোরে পাকিস্তান দাবী করবেন, না পেলে গায়ের জোরে তুলকালাম কাণ্ড করবেন। করা সহজ, কারণ দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। ক্যাবিনেট মিশন যদি তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়ে নতুন এক এ্যাওয়ার্ড দেয় তা হলে কংগ্রেস তা এবার সরাসরি বর্জন করবে। নয়তো তিনিই প্রকারান্তরে ভীটো দেবেন। আমি এই নাটকের নীরব দর্শক। এ নাটক বিয়োগান্ত না হলেই রক্ষা।" মানস চিন্তাকুল।

"আমার নিজের মতে দুই নেশন থিওরি হচ্ছে ঝুটা আর পাকিস্তান হচ্ছে ফাঁকিস্তান। বাঙালী মুসলমান একদিন এটা হৃদয়ঙ্গম করবেই। কিন্তু ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে এখন আর মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারা যাবে না। তার জন্যে চাই আরো একটা সাধারণ নির্বাচন। আমাদের এখন দেখতে হবে যাতে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন অন্তত আমাদের এই প্রদেশে হয়। বাংলাদেশ আজ যা করে অবশিষ্ট ভারত কাল তা করে। গোখলের সেই উক্তি কি মিথ্যা হবে? আমি তলে তলে চেষ্টা করে যাব। ইনশা আল্লা, যদি সফল হই তবে বাকী ভারত ভাগ হয়ে গেলেও বাংলাদেশ ভাগ হবে না. স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবে। শরৎ বোস প্রেসিডেন্ট, সুহরাবর্দী প্রাইম মিনিস্টার। খোদা হাফেজ।" আথতার বিদায় নেন।

বাড়ী ফিরতে দেরি হয়েছিল। খাদি কর্মী বঙ্কিম কর তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। সৌম্যদার বন্ধু। একসঙ্গে জেল খেটেছেন।

"সৌম্যদার চিঠি পেয়েছি। ওরা ভালোই আছে। কিন্তু ওদের কুঁড়েঘর এখনো বাসযোগ্য হয়নি। বৌদি চান কলকাতার মতো বাথরুম ও টয়লেট। শহরের ক'জন বড়লোকের বাড়ীতে তা আছে? কুঁড়েঘরে তো একেবারেই বেমানান। তার সঙ্গে দু'খানা পাকা ঘর জুড়তে হবে। টাকা অবশ্য বৌদিই জোগাবেন, তাঁর অর্থের অভাব নেই। কিন্তু লোকে বলবে কী?"

মানস যুথিকার দিকে তাকায়। "এক আজব সমস্যা।"

"সমস্যা না ছাই। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে বলে কি তাদের মতো মাঠে জঙ্গলে ছুটতে হবে? শৌচের ব্যবস্থা যার যে রকম রুচি। এ ক্ষেত্রে জোর জবরদস্তি করা অহিংসা নয়। সে অধিকার জনগণেরও নেই। সৌম্যদা যদি জনগণের কাছে নত হয় তা হলে জানব স্বাধীন ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না।" যুথিকা জুলির পক্ষ নেয়।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। ইংরেজরাও তো বলে, হোয়েন ইউ আর ইন রোম ডু অ্যাজ দ্য রোমানস ডু।" বঙ্কিমবাবু সাফাই নেন।

"কী, জজসাহেব? তোমার রায় কী।" যূথিকা কৌতুক করে।

"শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে এর উত্তর দিয়ে গেছেন। তুমি যদি লোকের উপকার করতে যাও তো তাদের একজন হতে হবে। তার জন্যে তাদের লেভেলে নামতে হবে। গান্ধীপন্থী কর্মীরা যদি বিদেশী মিশনারীদের মতো বাস করে তবে উপকারও তেমনি ভাসা ভাসা হবে। তারা যখন চলে যাবে তখন কেউ তাদের শিক্ষা মনে রাখবে না। সৌম্যদাও কি ওখানে বরা র থাকবে। তা তো মনে হয় না। স্বরাজের পর কাজ ফুরিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সহধর্মিণীরও।" মানস যতদূর বোঝে।

"গান্ধীপন্থী কর্মীদের কাজ স্বরাজের পরেও ফুরোবার নয়, জজ সাহেব। স্বরাজ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য সর্বোদয়। আমরা শেষ মানুষটি পর্যন্ত যাব। তাকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করব, কর্মহীনতা থেকে উদ্ধার করব, অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করব, দুর্বলতা থেকে উদ্ধার করব। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়তে পারবে। তার মতো লোকদের মত না নিয়ে কেউ রাজা হতে পারবে না, তাদের উপর খাজনা ধার্য করতে পারবে না, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারবে না। এই হচ্ছে স্বরাজের তাৎপর্য। কে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করল না করল সেটা গৌণ। দেখছেন তো তাদের সর্বপ্রধান সেবক গান্ধীজীর সঙ্গে নেগোশিয়েশন না চালিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন তাঁর অনুগা ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে চালাচ্ছেন। গান্ধীজীকে বাদ দেওয়া মানে পীপলকে বাদ দেওয়া। হস্তান্তর যেটা হবে সেটা উপরে উপরে হবে। সব নিচের মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছবে না। কাজেই সৌম্যদাকে থাকতে হবে সেই মানুষটির কাছে। তাকে ছেড়ে গেলে চলবে না। আর বৌদি যদি সমস্ত জেনেশুনে বিয়ে করে থাকেন তবে তাঁকেও অনুব্রতা হতে হবে।" বঙ্কিমবাবুর মতে।

"দাদা, আপনি কি বিয়ে করেছেন?" যূথিকা সন্দিগ্ধ স্বরে সুধায়।

"যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল ভিখারী স্বামীকে তিনি ত্যাগ করেছেন। আমিও মুক্ত, তিনিও মুক্ত।" বঙ্কিমবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

॥ পনেরো ॥

জাহাজে ওঠার আগে মিলি চিঠি লেখে জুলিকে। বলে, "আমি আবার অকূলে ভাসলুম রে! জীবন আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমার স্থান। ঝাঁসীর রানী হতে চাইলেই কি হওয়া যায়, ভাই? তোকেও বুঝতে হবে যে জোন অভ্ আর্ক হতে চাইলেই হওয়া যায় না। নৌসেনা বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ কোনোটাই এদেশে জমবে না। তার আগেই এদেশ স্বাধীন হবে। আয়ারল্যাণ্ডের মতো স্বাধীন। তার পরেও যদি কেউ আইরিশ রেপাবলিকান আর্মির মতো অখণ্ড ভারতীয় সেনা গঠন করতে চায় করতে পারে। কিন্তু আমি তার মধ্যে নেই। যারা আমাদের নয় তারা আমাদের নয়। জোর করে তাদের আপন করা যায় না। ওরা যদি আলাদা হতে চায় আলাদাই হোক। শুধু দেখতে হবে যেন আমাদের ভাগ থেকে কলকাতা বাদ না পড়ে! ইংরেজদের ঘটে ওটুকু বুদ্ধি আছে। ওরা যদিও পিটারকে বঞ্চিত করে পলকে দিতে ওস্তাদ তবু ভারত ত্যাগের সময় পিটারকে চিরশত্রু করতে সাহস পাবে না। বাণিজ্য তো পিটারের সঙ্গেই। আর ওরা বণিক জাতি।"

এর পর মিলি আসে আসল কথায়। "জুলি, আমার বিশেষ অনুরোধ যতদিন না তোর নিজের কুটীর হয় ততদিন আমাদের বাড়ীই তোর বাড়ী, আমার মা বাবাই তোর মাসিমা মেসোমশায়। তুই ওঁদের কাছেই থাকিস্। তাতে ওরা আমাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ ভুলবেন। তুই ওঁদের আরেকটি মেয়ে। শুধু মনে রাখিস্ যে ওঁরা রাজনীতির লোক নন, রাজনীতি এড়িয়ে চলেন। ওঁদের পক্ষে ওটাই নিরাপদ পলিসি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। ওঁদের কাছে এটা স্পষ্ট যে ওঁদের বাসস্থানটা কুম্ভীরীস্থান হতে যাচ্ছে। যদি না কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন হয়।"

মিলির নৌসেনাবিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ার বিশদ বিবরণ সে নিজে লেখেনি। লিখেছেন তার দাদা। জুলিকে নয়, ওর বাবাকে। ক্যাপটেন মুস্তাফী সেটা শোনান ওর মাকে। ওর মা শোনান জুলিকে। আর জুলি সৌম্যকে।

সৌম্য তা শুনে বলে, "ওর ভিতরে যে আগুন ছিল তা দেখছি এতকাল পরেও নিবে যায়নি। ধন্যি মেয়ে!"

জুলির তা শুনে কী অভিমান! "তোমার সঙ্গে ঠিক মানাত। আমি তো কবে নিবে গেছি, যদি আদৌ জ্বলে থাকি।"

"না, না, তোমার ভিতরেও আগুন আছে, জুলি। সে আগুন তুমি লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে ধীরে ধীরে ও অলক্ষে সঞ্চারিত করবে। বাক্য দিয়ে নয়, ব্যক্তিত্ব দিয়ে। জন জাগরণ না হলে আমরা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কী করব! আমরা যাকে গঠনের কাজ বলি তা জনজাগরণের সূত্র। দেখতে নাটকীয় নয় বলে বামপন্থীরা বিমুখ। দক্ষিণপন্থীদেরও চাড় নেই, কারণ তাঁরা আইনসভায় গিয়ে মন্ত্রী হতে চান। এবার বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য হয়েই তাঁদের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি। যার জন্যে আজীবন দুশ্চর তপস্যা। এর পরে একদিন শুনবে তাঁরা পদত্যাগ করে ফিরে এসেছেন। আমাদের পথ তেমন পথ নয়। আমরা জনগণের কাছে যাই ভোটের জন্যে নয়। ওদের ভিতরে আগুন সঞ্চার করতে। যে আগুন হিংসার আগুন নয়, তেজস্বিতার আগুন।" সৌম্য জুলিকে বোঝায়।

ইনটারিম গভর্নমেন্টের প্রসঙ্গ ওঠে। সৌম্য বলে, "জবাহরলাল ও আজাদ অত্যধিক ব্যগ্র। তাঁদের মতে ওটা নাকি প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট। বিপ্লবের পর যেমন হয়। বিপ্লব কবে হলো যে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট হবে? কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। ওটা বড়লাটের নিয়ন্ত্রণাধীনই থাকবে, নেহরু নামক প্রধানমন্ত্রীর নয়। প্রধানমন্ত্রী পদটাও কবিকল্পনা। বড়লাট বা মুসলিম লীগ কেউ সেটা মেনে নেবে না। উর্ধ্বতন দায়িত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই থাকবে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নয়। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে আইনসভা কাউকে পদচ্যুত করতে পারবে না। বড়লাট অসন্তুষ্ট হলে কিন্তু তা করতে পারবেন। আর মুসলিম লীগকেও মাশুল জোগাতে হবে। রকমারি মাশুল। নয়তো ওরা সহযোগিতা করবে না। ওরা সহযোগিতা না করলে বড়লাট কংগ্রেসকেই বলবেন ওদের মান ভঞ্জন করতে। বাপু কী করবেন? জবাহর ও আজাদকে টেনে রাখবেন না যেতে দেবেন? ভিতরে ভিতরে এটা গান্ধী বনাম জিন্না। বাইরে থেকে মনে হয় ব্রিটেন বনাম ভারত।"

মিলির অনুরোধে নয়, মুস্তাফীদের অনুরোধেই ওরা তাঁদের ওখানে থাকে। আশ্রমে ওদের জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হলে সেখানে উঠে যাবে।

মুস্তাফীরা প্রত্যেক শুক্রবার রিসিভ করতেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁদের

বৈঠকখানায় আসতেন শহরের গণ্যমান্য উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক ও সরকারী কর্মচারী। সবরকম বিষয়েই আলাপ আলোচনা হতো।

রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার বলেন, "কেবল ইংরেজদের সঙ্গে নয় মুসলমানদের সঙ্গেও একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক চাই। যেটা শাসক শাসিতের নয়, শোষক শোষিতের নয়, উচ্চ নীচের নয়। স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যে সমানভাব প্রত্যাশা করি অথচ পাইনে আমাদের কাছ থেকে মুসলমানরাও সেই সমানভাব প্রত্যাশা করে অথচ পায় না। তাই মুসলিম লীগের প্রথম শর্ত হলো তাকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমান মর্যাদা ও সমান ওজন দিতে হবে। যাকে বলে প্যারিটি। কিন্তু তার মানে দাঁড়াচ্ছে একই সিংহাসনে দুই রাজা। যার নাম দ্বৈরাজ্য। ব্রিটিশ রাজের দুই উত্তরাধিকারী সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে একই সিংহাসনে বসবে এটা কী করে সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে না? দারা শিকো বনাম আওরংজেব। আধুনিক আওরংজেবের সামর্থ্য থাকলে তিনি আধুনিক দারা শিকোকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে সমগ্র সাম্রাজ্য অধিকার করতেন। তেমন সামর্থ্য নেই জেনে ছয়টা প্রদেশের বিপরীতে ছয়টা প্রদেশ দাবী করছেন। এটাও একপ্রকার প্যারিটি। গান্ধীজীর কথা শুনে মনে হয় তিনি বিনা দ্বন্দ্বে ছয়টা প্রদেশ ছেড়ে দেবেন, কিন্তু একটি শর্তে। সোভরেনটি থাকবে উর্ধ্বতম স্তরে ফেডারল গভর্নমেণ্টের হাতে। সে তিনটিমাত্র বিষয় পরিচালনা করবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ। জিন্না সাহেবের এতে প্রবল আপত্তি। সোভরেনটি তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। তা হলে গিভ অ্যাণ্ড টেক হয় কী করে? গিভ অ্যাণ্ড টেক বিনা কি কংগ্রেস লীগ চুক্তি সম্ভবপর? কংগ্রেস লীগ চুক্তি না হলে কংগ্রেস লীগ সংঘর্ষ রোধ করবে কে? ইংরেজ? ইংরেজ কি চিরস্থায়ী? ওরা তো এখন যাই যাই করছে।"

এর উত্তরে সৌম্য মুখ খোলে। "গান্ধীজী তো একথাও বলছেন যে, হয় কংগ্রেসকে নয় লীগকে কেন্দ্রের ভার দিয়ে ওরা এক্ষুণি বিদায় হোক।"

প্রখ্যাত উকীল মোহিনীমোহন ধর রাজনীতিতেও ধুরন্ধর। তিনি চোখ বুজে শুনছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার মতো তুখোড় পলিটিসিয়ান এদেশে আর জন্মাননি। গান্ধী চলেন ডালে ডালে তো জিন্না চলেন পাতায় পাতায়। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছেন যে দীর্ঘ-মেয়াদী সমাধানের আশ্বাস না পেলে হ্রস্বমেয়াদী সমাধানে তাঁর আগ্রহ নেই।

পাকিস্তান হবে কি হবে না সেইটেই প্রথম কথা। ইনটারিম গভর্নমেণ্ট তার পরের কথা। আর পাকিস্তান বলতে তিনি কেবল সেপারেট নয়, সোভরেন স্টেটও বোঝেন। বাংলাদেশ হবে তার একটা প্রদেশ। আসামও আরেকটা। সেটাও নাকি মুসলিম নেশনের অংশ। ক্যাবিনেট মিশনকে তিনি ধাঁধায় ফেলেছেন। ইংরেজরা শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পক্ষপাতী। অশান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কংগ্রেসও চায় না। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি বলে, আমরা পাকিস্তানের জন্যে লড়তে তৈরি, মরুক না লাখে লাখে হিন্দু মুসলিম শিখ তা হলে অশান্তির চূড়ান্ত হবে। এই নির্বাচনেই তো দেখা গেল মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। 'জরের যম জারমলীন। হিন্দুর যম নুরুদ্দীন। নুরুদ্দীনকে ভোট দিন। পাকিস্তান জিতে নিন।' বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগের জয়। কৃষক প্রজার জামানত বাজেয়াপ্ত। জিন্না সাহেব এখন থেকেই পাকিস্তানের বাদশা বনে বসে আছেন। অশান্তিকে তিনি ডরান না। জেহাদ বলে একটা অস্ত্র আছে তাঁর তূণে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের চেয়ে ঢের বেশী জোরালো। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দিতে অনিচ্ছুক ধর্মের জন্যে তারা প্রাণ দিতে ও প্রাণ নিতে প্রস্তুত। গান্ধীজীর পরামর্শে সারা ভারত যদি মুসলিম লীগের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজরা বিদায় হয় তা হলে তার পরের দিনই পানিপথের যুদ্ধ। হিন্দু মহাসভা অখণ্ড ভারতের জন্যে লড়বে। দিন দিন তারও প্রভাব বাড়ছে। সমান ভায়োলেন্স। আওরংজেব বনাম শিবাজী।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেও আঁচতে পারছে হিন্দু মুসলমানের জঙ্গী মনোবৃত্তি। হিন্দুদের সংখ্যার জোর কম, তাই দাপট কম, নইলে তারা যে অহিংসার পূজারী তা নয়। সে সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধী। গৃহযুদ্ধের বিরোধী তো বটেই। কিন্তু আর-একটা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করার মতো দম তার সহকর্মীদের নেই।

গৃহকর্তা ক্যাপটেন মুস্তাফী বিতর্কে যোগ দেন। "এর কোনো সামরিক সমাধান নেই, মোহিনী। তোমরা নেতারা একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করো। ক্যাবিনেট মিশনও তারই অন্বেষণ করছে। আমার জামাতা সুকুমারের মুখে শুনেছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী স্বয়ং ভারত সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার নিয়েছেন। ভারত সম্পর্কিত ফাইল এখন তাঁর নিজের দেরাজে। কাউকে জানতেই দিচ্ছেন না ব্রিটেন কী করবে না করবে। তবে

গান্ধীকে তিনি পছন্দ করেন না, গত মহাযুদ্ধের সময় গান্ধী ইংরেজদের পিঠে ছোরা মেরেছিলেন। জিন্নাকেও তিনি আস্‌কারা দিতে চান না। জিন্নার অস্ত্র জেহাদ নয়, ভীটো। সে অস্ত্র অ্যাটলী সাহেব জিন্নার হাতে থাকতে দেবেন না। জিন্নাও কিছুদিন পরে টের পাবেন যে ইংরেজ তাঁর খেলা খেলবে না, তাঁকেই ইংরেজের খেলা খেলতে হবে। মান অভিমান বৃথা।"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "গ্যাখ, কালীকৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে নেতা বলে লজ্জা দেয় না। আমার কৃষক প্রজা দল তো গোহারান হেরেছে। লোকের মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে রয়েছে। যেখানে অবজেকটিভ চেঞ্জ সম্ভব নয়, সেখানে সাবজেকটিভ চেঞ্জ দিয়ে পরিস্থিতিকে শান্ত করতে হয়। অবজেকটিভ চেঞ্জ বলতে বুঝি ভূমিহীনকে ভূমিদান, কর্মহীনকে কর্মদান, মুদ্রাস্ফীতিরোধ, ধনিকদের উপর বর্ধিত কর। ইংরেজ কর্তাদের দিয়ে এসব প্রয়োজনীয় বস্তুগত পরিবর্তন হবে না, ওঁরা সেটা উপলব্ধি করেছেন। আর সাবজেকটিভ চেঞ্জ বলতে বোঝায় ক্ষমতার হস্তান্তর। ইংরেজরা এখন এর জন্যে তৈরি। তারা জানে এখন যদি যায় মানে মানে যাবে। দেরি করলে মারামারির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। জট খুলতে পারবে না। শত কয়েক ইংরেজ প্রাণে মরতেও পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো শ্রীরাধা যেমন বলেছিলেন, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব? ভারত হেন সাম্রাজ্য কাকে দিয়ে যাব? কংগ্রেসকে? না, কংগ্রেসকে ষোল আনা কিছুতেই নয়। মুসলিম লীগকে? না মুসলিম লীগকে হিন্দুপ্রধান বা শিখপ্রধান অঞ্চল কখনো নয়। তা হলে কি পার্টিশন? পার্টিশন হলে কেবল ভারতের কেন? বাংলার নয় কেন? পাঞ্জাবের নয় কেন? সে রকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে দুই বা তিন পক্ষের সম্মতি নিতে হবে। উপর থেকে চাপিয়ে দিতে গেলে বিপত্তির অবধি থাকবে না। পক্ষপাতের অভিযোগ উঠবে। হিন্দু মুসলিম শিখ আলাদা আলাদা করে ইংরেজদেরই পদাঘাত করে তাড়াবে। নেগোশিয়েশন ফেল করলে ইংরেজদের সর্বনাশ, অথচ কংগ্রেস লীগের পৌষমাস নয়। এই দুই দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া দরকার। তার জন্যে যদি সালিশী করতে হয় এই অধমকে ডাকলে এই অধম দোরে দোরে গিয়ে পায়ে ধরে সাধতে রাজী। শিখদের আমি চিনিনে। কিন্তু অন্য দুই পক্ষকে চিনি। একদা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলুম। জিন্নার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির মেম্বর। সেদিনকার সেই প্রীতির সম্পর্ক আর নেই। তিনি সেই দল ভেঙে

দিয়ে আইনসভায় মুসলিম লীগ দল গড়ায় আমিও ছিটকে পড়ি। কেন্দ্রে নয়, বাংলার আইনসভায় আমার দল হয় কৃষক প্রজা দল। তবু পরিচয় দিলে জিন্না নিশ্চয়ই চিনবেন। কংগ্রেসও এককালে ছিলুম। তার পর সি. আর. দাশের স্বরাজ পার্টিতে। অনেক ঘাটের জল খাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমি না ঘরকা না ঘাটকা। সকলের সঙ্গে কথা বললে তবেই তো বুঝতে পারব কোন্ সমাধানটা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। একপক্ষ নিল, অপরপক্ষ নিল না, এমন যদি হয় তবে আমিও তো ব্যর্থ।"

বাসুদেব হালদার হাসেন। "সকলের গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ইংরেজরা যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে তবে আরো অর্ধ শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন অপেক্ষা করা ওদেরও মত নয়, আমাদেরও মত নয়। চেঞ্জ একটা চাইই চাই। তার জন্যে চাই একটা রাজনৈতিক সমাধান। সেটা যে আদর্শ সমাধান হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো। ষোল আনা কোনো পক্ষই পাবে না। লড়াই করলেও না। বুদ্ধিমানের কাজ গিভ অ্যাণ্ড টেক। সেটা যেভাবেই হোক। ক্ষমতা ভাগও হতে পারে। দেশ ভাগও হতে পারে। প্রদেশ ভাগও হতে পারে।"

সৌম্য প্রতিবাদ করে। "না না, দেশভাগ নয়। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অবিভাজ্য। না, না, প্রদেশভাগ নয়। বাংলার ভাষা, বাংলার সঙ্গীত অবিভাজ্য। ক্ষমতা ভাগে আমার আপত্তি নেই। ক্ষমতা ভাগ কেন, ক্ষমতার সবটাই নিক না মুসলিম লীগ। ক্ষমতা মানেই দায়িত্ব। দায়িত্বকে ভাগ করতে পারা যায় না। মুসলিম লীগ এককভাবেই নিক বাংলাদেশে সরকার গঠনের দায়িত্ব। অবিচার, অত্যাচার দেখলে আমরা সত্যাগ্রহ করব। এমন ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করব যে মুসলমানদের একভাগও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সরকারের ভুল নীতি বানচাল করে দেবে। আমার কাছে বিরোধিতা করার অধিকারটাই গৌরবের। বিরোধিতা অবশ্য কথায় কথায় নয়। মূলনীতির প্রশ্নে। যেখানে সরকার গঠনের দায়িত্ব কংগ্রেস নিয়েছে সেখানে মূলনীতির প্রশ্নে সত্যাগ্রহ করার অধিকার মুসলিম লীগেরও রয়েছে। আমিই তখন লীগের পক্ষ নিয়ে সত্যাগ্রহে নামব। গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষেরও মর্যাদা অনেক। মুসলিম লীগ সেই মর্যাদা লাভ করবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও বহুসংখ্যক প্রাদেশিক আইনসভায়। তবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েক বছর অন্তর অন্তর

পালাবদল হয়। বিরোধীপক্ষ হয় সরকারপক্ষ। সরকারপক্ষ হয় বিরোধীপক্ষ। তাই দুই পক্ষেরই স্বার্থ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে বলবৎ রাখা। আমাদের দেশে সেটা কিন্তু ব্যাহত হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা। তার বদলে যদি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি থাকত স্বতন্ত্র নির্বাচননির্ভর মুসলিম লীগ গড়ে না উঠে যৌথ নির্বাচননির্ভর ইউনিয়নিস্ট পার্টি গড়ে উঠত ও সে পার্টি একদিন কংগ্রেসের মতো হিন্দু মুসলমানের মিশ্র ভোটে নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করত। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর প্রথম কাজ হবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পরিবর্তে যৌগ নির্বাচন প্রবর্তন। তখন জিন্না সাহেব আবার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টির মতো একটা মিশ্র দল পত্তন করবেন ও হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টানের ভোটে জিতে সরকার গঠন করবেন। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? এর উৎপত্তি হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অপোজিশন হিসাবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মহাপ্রস্থানে গেলে কংগ্রেসও মহাপ্রস্থানে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নয়, পাঁচ দশ কি বিশ বছব বাদে। কংগ্রেস সরকারের বিরোধী পক্ষই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিয়ে সরকার গঠন করবে। এমনও হতে পারে যে কংগ্রেসও দু'ভাগ হয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী। গত কয়েক বছর হলো তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে দুর্বল, কিন্তু বৃদ্ধদের মৃত্যু বা অবসরগ্রহণের পর বামপন্থীরাই প্রবল হবে। আমার তো বিশ্বাস এই অধ্যায়ের শুরু হয়েছে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে। সেই স্বতন্ত্র নির্বাচন থেকেই ধাপে ধাপে এসেছে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। তবে ইংরেজরা বোধ হয় ভাবতেই পারেনি যে তাদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল নীতির পরিণাম হবে ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। তারা কুইট করতে চায় করুক, নয়তো আরো কিছুকাল থেকে আবার এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হোক। কিন্তু ডিভাইড করতে হয় তো ওদের বিদায়ের পর আমরাই ভাইয়ে ভাইয়ে করব. ওরা নিরপেক্ষ সেজে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে কেন? আমি বিশ্বাসই করিনে যে ওরা ব্যালান্স অভ্ পাওয়ার নিজেদের হাতে রাখবে না। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একটা দোনোমনো ভাব আছে। গান্ধীজী কিন্তু অটল ও অনড়। পাকিস্তান দিতে হয় আমরাই দেব, ইংরেজরা নয়।"

মোহিনীবাবুকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। তা নয়। তিনি চাঙ্গা হয়ে বলেন, "জিন্না মানুষটি যে কত বড়ো তুখোড় পলিটিসিয়ান তার ধারণাই নেই গান্ধী মহারাজের। হবে কী করে? তিনি কি সত্যাগ্রহ

আর গঠনকর্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়ে মাথা খাটিয়েছেন? তিনি যেমন সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্ম বিশেষজ্ঞ, জিন্না তেমনি পার্লামেণ্টারি ও কনষ্টিটিউশনাল স্পেশিয়ালিস্ট। তিনি এই নিয়ে লেগে আছেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। গান্ধী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আজাদ, নেহরু এঁরা তাঁর তুলনায় এমেচার। ধরো, মুসলিম লীগ যদি কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট করে তবে কংগ্রেস কি মেজরিটির ভোটে সেপারেট ইলেকটোরেট তুলে দিয়ে জয়েণ্ট ইলেকটোরেট প্রবর্তন করতে সাহস পাবে? দেশময় দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যাবে না? কে থামাবে যদি ইংরেজরা না থামায় বা থামাবার শক্তি রাখে? মুসলমানরা যেদিন একবাক্যে বলবে যে স্বতন্ত্র নির্বাচন চাইনে, যৌথ নির্বাচন চাই, সেদিন এ আপদ যাবে। কিন্তু সেটা হবে পাকিস্তান অর্জনের পর তার কুফল দেখে। তার আগে নয়। আপাতত মুসলিম লীগ যদি শাসনতন্ত্র রচনায় সহযোগিতা না করে তবে শুধুমাত্র মেজরিটির ভোটে বিরাট কোনো পরিবর্তন আশা করা যায় না। কারণ কংগ্রেসের মেজরিটি হচ্ছে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে হিন্দু মেজরিটি: একটা সম্প্রদায় কখনো আরেকটা সম্প্রদায়ের নিয়তি নির্ধারণ করতে পারে না। করতে গেলে গৃহযুদ্ধ অবধারিত। তবে একবার পাকিস্তান স্বীকার করে নিলে দুই সম্প্রদায়ে মিলে একটা আপসে পৌঁছতে পারে। জিন্না বার বার সেই কথাই বলে আসছেন। আপস মানে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। কংগ্রেসের মন মেজাজ যতদূর আমি বুঝি সে কারো সঙ্গে কোয়ালিশনে রাজী হবে না, যদি না কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের পরামর্শ অনুসারে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীরা কাজ করেন। মুসলিম লীগেরও একটা হাই কমাণ্ড হয়েছে। সে তাতে নারাজ। দুই হাই কমাণ্ডের গুঁতোগুঁতি কোয়ালিশন সরকার ছত্রভঙ্গ হবে। আর কোথায় না হোক বাংলাদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠন করতে পারা যেত। কিন্তু পারা যাবে না। কারণ কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বা লীগ হাই কমাণ্ড কোনো পক্ষই তাঁদের কণ্ট্রোল ছাড়বেন না। এই অধমের উপর যদি ভার দেওয়া হতো এই অধম সালিশী করতে এগিয়ে যেত। কিন্তু এই অধম এখন সর্বদল পরিত্যক্ত। তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখব কনষ্টিটিওয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর নির্বাচনে দাঁড়ালে কেউ আমাকে ভোট দিয়ে সেখানে পাঠায় কি না। জিন্নার সঙ্গে আমার যেমন যোগাযোগ বাংলাদেশে আর কারো তেমন নয়। আর জিন্নাই যে নাটের গুরু এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, সৌম্য। নাটের গুরু ভালোর জন্যেও বটে, মন্দের জন্যেও বটে।

সেবার লখনউতে কংগ্রেস লীগ প্যাক্ট হয়েছিল টিলক আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। এবারও সেইরকম একটা প্যাক্ট হতে পারে রাজাজী আর জিন্নার মধ্যস্থতায়। রাজাজীর সঙ্গেও এই অধমের প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু এখন তাঁর দুর্দিন যাচ্ছে। তিনি কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে যোগ দেননি বলে মাদ্রাজের প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠন করার সময় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি। অথচ তিনিই তো সর্বপ্রথম পদত্যাগ করেছিলেন। কোথায় কৃতজ্ঞতা? রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কোনো পদার্থই নেই। মহাত্মারও একদিন সেই দশা হবে।"

সৌম্য বৈরাগ্যের সঙ্গে বলে, "তিনি রাজক্ষমতা চাননি ও চান না।"

এতক্ষণ বাদে মৌনভঙ্গ করেন অধ্যাপক মাহমুদ শরীফ। "কাযদে আজম জিন্নাহ্ সাহেবও কি ক্ষমতা চেয়েছেন না চান? তিনি চান সমতা। হিন্দু মুসলমানের সমতা, কংগ্রেস লীগের সমতা, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের সমতা, গান্ধী জিন্নাহ্র সমতা। কংগ্রেস নেতাদের কাছে লিবার্টিই সবচেয়ে কাম্য। লীগ নেতাদের কাছে ইকুয়ালিটিই সবচেয়ে কাম্য। এই যে পাকিস্তানের দাবী এটা প্রকৃতপক্ষে সমতার দাবী। স্বরাজের দাবী যেমন স্বাধীনতার পাকিস্তানের দাবী তেমনি সমতার। ইংরেজরা বিদায় নিলে স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু সমতা আসবে না, যদি না পাকিস্তানের রূপ ধরে আসে। তার মানে এক নেশন নয় দুই নেশন। সমতার প্রয়োজন আছে এটা যদি মেনে নেন তা হলে পাকিস্তানেরও প্রয়োজন আছে এটাও মেনে নিতে হবে। সমতার খাতিরেই বাংলাদেশকেও পাকিস্তানের সামিল করা হচ্ছে, বাংলাদেশ হবে পূর্ব পাকিস্তান, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাঙ্গালীস্থান নয়। সমতার প্রয়োগ না থাকলে এর মতো ধোঁকাবাজি আমরা সহ্য করতুম না। এখনো সময় আছে, এখনো দেশভাগ নিবারণ করা যায়, কিন্তু কংগ্রেসের নাছোড়বান্দা মনোভাব ও মুসলিম লীগের যুদ্ধং দেহি মনোবৃত্তির ফলে দেশ যদি সত্যি সত্যি ভাগ হয়ে যায় তবে স্বাধীনতাও আসবে, সমতাও আসবে, কিন্তু আসবে না মৈত্রী। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার একটি বাদ পড়বে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের বৈরী হয়েই কে জানে কতকাল কাটাবে! দেশ একবার ভাগ হয়ে গেলে আবার একদিন জোড়া লাগবে এটা একটা দিবাস্বপ্ন। একাকার করার জন্যে একটা রাষ্ট্র হাতিয়ার শানালে অপরটাও হাতিয়ার শানাবে। বলপরীক্ষায় হিন্দুস্থান জিতবে, পাকিস্তান হারবে, এমন সম্ভাবনা দেখলে ব্রিটেন ছুটে আসবে হস্তক্ষেপ করতে। পাকিস্তান একবার হলে বরাবরের জন্যেই হলো মনে রাখবেন।

তৃতীয় পক্ষ যতদিন থাকবে দেশভাগও ততদিন থাকবে। ভারত ছেড়ে যাওয়া মানে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া নয়। ইংরেজকে দুনিয়া ছাড়াতে পারে এত শক্তি কংগ্রেসের বা হিন্দুর বা হিন্দুস্থানের নেই। গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, কিন্তু একাকার করতে পারে না। অন্তত এখনো তা পারেনি। একাকার যে এখনো রয়েছে এটা তৃতীয় পক্ষের কল্যাণে। তবে একাকার করাই যদি শ্রেয় হয় তবে কায়দে আজমের সঙ্গে সমানে সমানে এগ্রিমেণ্ট করতে হবে। একপক্ষ মেজরিটি অপরপক্ষ মাইনরিটি এটা এগ্রিমেণ্টের মূলসূত্র নয়। আমরা আজকাল নিজেদের আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মাইনরিটি বলে ভাবিনে। আমরা পাকিস্তানী ন্যাশনাল মেজরিটি। এটা একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন। আপনারা এখনো ভাবছেন যে আপনারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মেজরিটি। আপনাদের চিন্তার বিবর্তন হয়নি। প্যারিটিই হচ্ছে পাকিস্তানের বিকল্প। আমরা যদি সারা ভারতে প্যারিটি পাই তা হলে পাকিস্তানের জন্যে উদগ্রীব হব না। পাকিস্তানে সারা ভারতের সব মুসলমানের লাভ হবে না। যারা হিন্দুস্থানে থাকতে চাইবে বা থাকতে বাধ্য হবে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আর আমরা বাঙালী মুসলমানরাও যে অবাঙালী মুসলমানদের সর্বঘটে দেখে সুখী হব তা নয়। আপিস আদালত, দোকান বাজার, কল কারখানা, চায়ের জমি ভরে যাবে তাদের মাইগ্রেশনে। পাকিস্তানের পক্ষে তারা ভোট দিয়েছে, তাদের মাইগ্রেশনের অধিকার আছে। সব চেয়ে বড়ো বৈষম্য হবে যদি পূর্ব পাকিস্তান বলতে বোঝায় কেবল পূর্ব বঙ্গ ও সীলেট। দেশভাগ চাইলেও প্রদেশ ভাগ আমরা চাইনে। আশা করি কংগ্রেসও চাইবে না। চাইলে কিন্তু বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়েরই ঘর ভেঙে যাবে। বাঙালী জাতীয়তার বনিয়াদ ধ্বসে যাবে।”

সিভিল সার্জন বীরেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী উত্তেজিত হয়ে বলেন, “আপনারা দেখছি গাছেরটাও খাবেন, তলারটাও কুড়োবেন। মুসলমান হিসাবে পাকিস্তান আর বাঙালী হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশ। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্যে কত লোক ফাঁসী গেল, আন্দামানে গেল, জেলে গেল, বেত খেল, জরিমানা দিল। তার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। এখন সারা বাংলার তখ্‌তে আপনারাই রাজা হয়ে বসেছেন, তাতেও সন্তুষ্ট নন, গোটা বাংলাদেশকে স্টেপিং স্টোন করে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ

করতে চান। বঙ্গভঙ্গ রদ করে আমরা বিহারে ঠকে গেছি, ওড়িশায় ঠকে গেছি, আসামে ঠকে গেছি, বাংলাদেশেও ঠকে গেছি। কোনোখানেই একজন বাঙালী হিন্দু প্রধানমন্ত্রী নেই। বাঙালী হিন্দু অফিসার ক্লাস এখন অনাথ।"

মুস্তাফী তাঁকে শান্ত করে বলেন, "দেখুন, ডাক্তার সাহেব, বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে বাঙালী হিন্দু অন্য দিক দিয়ে ঠকে যেত। বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলে একটা মতবাদ গড়ে উঠত না। সাহিত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, ইণ্ডাস্ট্রি, শিক্ষাদীক্ষা—কত দিক দিয়ে কত প্রগতি হয়েছে ভেবে দেখবেন। এই যে আজ বাঙালী মুসলমানের মুখে বাঙালী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব শুনছেন এটাও সেই আন্দোলনের সুফল। তবে এঁদের দোটানা এখনো যায়নি, এঁরা ইসলামের প্রতি আনুগত্য আর মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য দুই আনুগত্যের মধ্যে দোল খাচ্ছেন। এটা একটা সাইকোলজিকাল কেস। এটাকে সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতা দিয়ে বোঝানো যায় না। কিছুকাল পাকিস্তানে বাস করলে পরে এঁদের দোটানা কেটে যাবে। তখন দেখবে এঁরাও সমান বাঙালী জাতীয়তাবাদী। দুঃখের বিষয় তার জন্যে হয়তো আবার বঙ্গভঙ্গের দরকার হবে। আমার মেয়ে মিলি এখন সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।"

"মধুমালতীর পক্ষে ওটা একটা ডিফিট।" মোহিনীবাবু বলেন। "বাঙালী হিন্দুদের পক্ষেও, ওদের দাবী যদি হয় কার্জনের প্রেতকে জীয়ানো। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক একটা পুরনো বোতল। এর মধ্যে একটা নতুন মদ এসে ঢুকেছে। ইণ্ডিয়াম ন্যাশনালিজম। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টরা যখন আট আটটা প্রদেশ সাধারণ নির্বাচনে জিতে মন্ত্রিত্ব নেয় তখনি আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। যেখানে নবাব বাদশারা রাজত্ব করেছেন সেখানে গোবিন্দবল্লভ পন্ত, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম জনমত সহ্য করবে? এর পরের ধাপ তো দিল্লীর লাল কেল্লায় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। মুসলিম জনমত ফেটে পড়বে না? সেটা বন্ধ না করতে পেরে তারা করবে স্বাধীনভাবে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ নিশান উত্তোলন। তার জন্যে করতে হবে পাকিস্তান হাসিল। হয় কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করে, নয় ইংরেজের সঙ্গে যুক্তি করে, নয় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করে। ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড টমসনকে জিন্না সাহেব একথা বলেছেন। কথাটাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। জিন্না একজন তুখোড় পালটিসিয়ান।"

মুস্তাফী হাত জোড় করে বলেন, "আপনারা কেউ না খেয়ে যাবেন না মিলির বন্ধু জুলির আজ রান্নার পরীক্ষা। ওর মাসিমা ওকে শেখান।'

॥ ষোল ॥

যাঁরা যাবার কথা ভাবছিলেন তাঁরা খাবার কথা ভেবে জাঁকিয়ে বসেন।

ডাক্তার নিয়োগী অধ্যাপক শরীফের দিকে চেয়ে বলেন, "হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব কে না চায়? কিন্তু তার জন্যে হিন্দুকেই দাম দিতে হবে, মুসলিমকে নয়, এ কেমন কথা? প্যারিটি চ্যারিটি নয়। দরাদরির ব্যাপার। দরাদরির জন্যে সরাসরি কথাবার্তা চালাতে হয়। তৃতীয় পক্ষকে মাঝখানে রেখে সরাসরি কথাবার্তা হয় না। আর প্যারিটি বা চ্যারিটি সেই তৃতীয় পক্ষ অনিচ্ছুকের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। হিন্দুদের উপর জোর জুলুম করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই আজ ইংরেজদের নেই। তারা এখন চাচার মতো আপনা বাঁচাতেই ব্যস্ত। আর গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করার হুমকি যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা যদি তুখোড় পলিটিসিয়ান হয়ে থাকেন তবে তাঁদের জানা উচিত যে শ্মশান ও গোরস্থানের মধ্যে প্যারিটি হলে ন'কোটি হিন্দু ও ন'কোটি মুসলমান ফৌত হবে। তার পরেও বাইশ কোটি হিন্দু বেঁচে থাকবে, কিন্তু একটিও মুসলমান বেঁচে থাকবে না। যদি না ইংরেজ তাদের পক্ষ নেয়। কিন্তু পক্ষ নিলে ইংরেজও তো কয়েক হাজার মরবে। সে স্পৃহা কি তাদের কারো আছে? হিন্দুরা ও শিখেরা তাদের জন্যে জার্মানদের সঙ্গে, ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে। জাপানীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বন্দী হয়েছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে আবার হয়তো ইংরেজদের পক্ষে লড়বে। তাদের শত্রু করে ইংরেজদের কী লাভ? জিন্না সাহেব যদি হুমকি দেবার সময় মনে মনে ধরে নিয়ে থাকেন যে ইংরেজরা তাঁর হয়ে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে লড়বে তা হলে তিনি তাঁর ব্রিজ খেলার পার্টনারের হাতে কী কী তাস আছে তা না জেনে নিজের হাত দেখেই ওভারকল করছেন। যারা তুখোড় খেলোয়াড় তারা ওভারকল করে না। তিনি হয়তো এটাও ধরে নিয়েছেন যে অহিংসাবাদী গান্ধী অনশন টনশন করে হিংসাবাদী হিন্দুদের নিবৃত্ত করবেন। অমনি করে মুখরক্ষা ও শেষরক্ষা হবে। কিন্তু জেহাদ যারা

শুরু করবে তারা অত সহজে সেটা থামাতে পারবে না। হিটলার পারেনি, তোজো পারেনি। থামবে যখন তখন দেখা যাবে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান শিখ নিহত হয়েছে। আরো বেশী প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে একটা সীজ-ফায়ার হয়েছে। সীজ-ফায়ারের সময় যা হয়, এ পক্ষও কিছু রেখেছে, ও পক্ষও কিছু রেখেছে। সেই পর্যন্ত পাকিস্তানের সীমানা, হিন্দুস্থানের সীমানা। কোনো পক্ষই তাতে বিশেষ লাভবান হবে না। পরে আবার একহাত লড়বার জন্যে মনে মনে তৈরি হবে। সেটা আর যাই হোক অহিংস নয়। গান্ধীর দিন গেছে। জিন্নাকে মোকাবিলা করতে হবে জবাহরলালের সঙ্গে।"

অধ্যাপক শরীফের মুখ শুকিয়ে যায়। মুস্তাফী বলেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ক্যাবিনেট মিশন এসেছেন তিন পক্ষের গ্রহণযোগ্য সমাধান বার করতে। সকলের সঙ্গেই তাঁরা কথা বলছেন। সকলেই চায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইংরেজদের দিক থেকে আমি তো ইচ্ছার কোনো অভাব দেখছিনে। কংগ্রেস নেতারাও ইচ্ছুক। লীগ নেতারাও তাই। দেশের আবহাওয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আরো কিছুদিন পরে আরো ঠাণ্ডা হবে। তবে পুরোপুরি নর্মাল হবে বলে মনে হয় না। অর্থনৈতিক কারণে মানুষ আজ উদ্‌ভ্রান্ত। কী হিন্দু, কী মুসলমান।"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে কী ভাবছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "জিন্নার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাঁকে আমি ভালো করেই চিনি। পাকিস্তানের উদ্‌ভাবক চৌধুরী রহমৎ আলী লণ্ডনের এক রেস্টোরাণ্টে এক ভোজ দেন, তাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন হলেন ইকবাল, আরেকজন জিন্না। পাকিস্তানের প্রস্তাব জিন্না সরাসরি খারিজ করে দেন। ওটা অবাস্তব। তা হলে এমন কী ঘটল যে সেই জিন্নাই বছর পাঁচেক বাদে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন? এর উত্তর নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তন করতে গিয়ে দেখা গেল কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে একক মেজরিটি পেয়েছে, আরো দুটি প্রদেশেও সে লীগকে সঙ্গে না নিয়েও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করতে পারে। কোন্ দুঃখে সে লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে চাইবে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হলে সে বরং পদত্যাগ করে বনবাসে যাবে

তবু মুসলিম লীগের শর্তে রাজী হবে না। শাসনতন্ত্রের অনুশাসন অনুসারে প্রতি ক্ষেত্রে মাইনরিটিদের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। জিন্না আশা করেছিলেন যে মাইনরিটির প্রতিনিধি একমাত্র মুসলিম লীগ থেকেই নেওয়া হবে আর গভর্নররাও সেই নির্দেশ দেবেন। দেখা গেল কংগ্রেস তার নিজের দল থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়েছে। আর গভর্নররাও কংগ্রেসকে চটাতে সাহস পাননি, পাছে সে মন্ত্রিত্বই গ্রহণ না করে। মাস ছয়েক ধরে গান্ধীজীর সঙ্গে বড়লাটের যে পত্রব্যবহার চলে তার নীট ফল হয় কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বলবৃদ্ধি ও লাটসাহেবদের বলক্ষয়। এসব দেখে শুনে জিন্না সাহেব ফেডারেশনের উপরে বিশ্বাস হারান। রাজন্যরা যদি প্রতিনিধি মনোনয়ন না করেন, যদি তার পরিবর্তে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠান, তা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলও কংগ্রেস এককভাবে গঠন করতে সমর্থ হবে, লীগের মুখাপেক্ষী হবে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সে নিজের দল থেকেই আহরণ করবে, লীগ যদি মুসলমানদের একমাত্র দল বলে স্বীকৃত না হয়। যেমন করে হোক কংগ্রেস একাধিপত্য বানচাল করতেই হবে। জিন্না সাহেব তাই ফেডারেশন অগ্রাহ্য করে তার বদলে দাবী করেন দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। একটা হিন্দুদের, অন্যটা মুসলমানদের। এরাও মেজরিটি, ওরাও মেজরিটি। এরাও নেশন, ওরাও নেশন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তাধারা সহসা খাত বদলায়। তার মধ্যে একটা যুদ্ধং দেহি ভাবও আসে। টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সেই ভাবটাই ব্যক্ত হয়। ইংরেজ চলে গেলে কংগ্রেস তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে অসহ্য, অসহ্য এই নিয়তি। অপর উত্তরাধিকারী হবে মুসলিম লীগ, প্রয়োজন হলে ওয়ার অভ্ সাকসেসন লড়বে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁর দীর্ঘকাল লেগেছে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস বা গান্ধী তাঁর দিকে মিটমাটের হাত বাড়িয়ে দেননি। যুদ্ধের ইস্যুতে বনবাসে গিয়ে তাঁকে উপবাসী রাখেন। ভেবেছিলেন তাতে তাঁর বল কমে যাবে। বল কমে যাওয়া দূরে থাক, সব ক'টা প্রদেশেই বেড়েছে। কংগ্রেস-মুসলিমরা এখন মুষ্টিমেয়। তাঁর বল এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে তিনি ইংরেজদের ডিকটেট করতে পারেন। কংগ্রেসকে তো গ্রাহ্যই করেন না। প্রয়োজন থাকলেও কোয়ালিশনের জন্যে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না। পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হবে।"

সৌম্যদা আর স্থির থাকতে পারে না। বলে, "কংগ্রেস-মুসলিমরা

সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ধর্মে মুসলমান আর জন্মসূত্রে ভারতীয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদেরও ভূমিকা আছে, সে ভূমিকা এখনো শেষ হয়নি, যে কোনো দিন আবার তাঁদের ডাক পড়তে পারে। আমরা কি তাঁদের প্রতি বেইমানী করতে পারি? লীগ বললেও না। বড়লাট বললেও না। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে এঁদের একজন না থাকলে কংগ্রেসও থাকবে না। মুসলিম লীগই গভর্নমেণ্ট চালাক। কংগ্রেস আপস করবে না, লড়াই করা তো দূরের কথা। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে রাস্তায় রাস্তায় যদি হাতাহাতি মারামারি খুনোখুনি বাধে কংগ্রেস তার মধ্যে থাকবে না, সেটা থামাবার দায় দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, তবে মানবতার খাতিরে গান্ধীপন্থীরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত হতে বলতে পারেন। শুধু গান্ধীপন্থীদের কেন, মানুষমাত্রের কর্তব্য মানুষকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করা। পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য নারীকে ধর্ষকের হাত থেকে উদ্ধার করা। এক্ষেত্রে কে হিন্দু কে মুসলমান বাছবিচার করা অনুচিত। এমন মুসলমান নিশ্চয়ই আছেন যিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে হিন্দুর প্রাণ বাঁচাবেন। জিন্না সাহেবের থীসিসটা তো এই যে ইংরেজ রাজ চলে গেলে কংগ্রেস রাজ কায়েম হবে, সুতরাং মারো শত্রু পারো যে প্রকারে। থীসিসটাই ভুল। দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকবে না। কংগ্রেস যদি থাকে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করেই থাকবে। মিটমাটের জন্যে কংগ্রেসের দুয়ার সব সময়ই খোলা। তা না হলে গান্ধীজী জিন্না সাহেবের দুয়ারে সতেরো দিন ধরে ধরনা দিতেন কেন? কায়দে আজম যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট না করে ইংরেজের সঙ্গেই মিটমাট চান তাতেও কংগ্রেস রাজী হবে, যদি তার মূলনীতিতে ঘা না পড়ে। সেরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিজেকে সরিয়ে জেলখানায় ফিরে যাবে। কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে কংগ্রেসের মূল নীতির সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে হবে। কংগ্রেসের মেজরিটি হিন্দু মেজরিটি নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টানের মিলিত মেজরিটি। সাম্প্রদায়িক মেজরিটি নয়, রাজনৈতিক মেজরিটি। তেমন মেজরিটি জাতীয়তাবিরুদ্ধ তো নয়ই, গণতন্ত্র বিরুদ্ধও নয়। আর কংগ্রেসের সংগ্রামকেও মাইনরিটিবিরুদ্ধ বলা যায় না। কংগ্রেসপন্থীরা কখনো মুসলমানের গায়ে হাত দেয়নি, কখনো দেবেও না। কংগ্রেস মন্ত্রীদের গদীচ্যুত করার জন্যে লীগপন্থীরা অনেক কিছু বানিয়েছেন। ভবিষ্যতেও বানাতে পারেন। উদ্দেশ্যটা কী? কংগ্রেস মন্ত্রীদের আবার গদীচ্যুত করা? তার জন্যে

তাঁরা প্রস্তুত। তা না হয়ে উদ্দেশ্য যদি হয় ভদ্রভাবে মিটমাট তা হলে কোয়ালিশনের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে, পার্টিশনের জন্যে ঝগড়াঝাটি নয়।"

শরীফ সাহেব তারিফ করেন। কোয়ালিশন লীগপন্থীরাও চায়। কিন্তু হিন্দুর সঙ্গে, লীগবহির্ভূত মুসলমানের সঙ্গে নয়। ওরা স্টুজ, ওরা কুইসলিং। মওলানা আজাদই বলুন, খান আবদুল গফ্ফার খানই বলুন, এঁরা কেউ সাচ্চা মুসলমান নন। হিন্দুর সঙ্গে মিটমাট একদিন না একদিন হবে, পাকিস্তানেও হিন্দু থাকবে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে কোনোদিন নয়। যদি না এঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে লীগে যোগ দেন। মুসলিম ইউনিটির খাতিরে সব মুসলমানকেই লীগের নিশানতলে সমবেত হতে হবে। তার পরে হবে কোয়ালিশন অথবা পার্টিশন।"

সৌম্য আর কথা বাড়াতে চায় না। এই ফ্যানাটিকদের সঙ্গে তর্ক বৃথা। তখন রায় বাহাদুর খেই হাতে নেন। "শরীফ সাহেব, এটা কি আপনারা ভেবে দেখেননি যে ভারত ভেঙে দু'খানা হলে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ও ভেঙে দু'খানা হবে? তা যদি হয় তবে মুসলিম ইউনিটি যাকে বলছেন তাই হবে মুসলিম ডিস্ইউনিটির নিদান। ভারতের সর্বনাশ তো হবেই। আপনাদের তাতে কী এসে যাবে? আপনারা তো ভারতীয় নন, আপনারা মুসলমান। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরও সর্বনাশ হবে। সেটা নজরে পড়ছে না, হিন্দু আধিপত্যকে খর্ব করাই একমাত্র লক্ষ্য। জিন্না যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাকিস্তান তিনি আদায় করবেনই। তার জন্যে নিজের এজমালী ঘরে আগুন দিতেও তাঁর হাত কাঁপবে না। কিন্তু সারা ভারতের সব মুসলমান যদি পাকিস্তানে জড়ো না হয় তো যারা হিন্দুস্থানেই থেকে যাবে তাদের দশা কী হবে? পাকিস্তানে তারা হবে বিদেশী। হিন্দুস্থানে তারা হবে বিধর্মী। সর্বত্র কৃপার পাত্র। জিন্না সাহেব পাকিস্তানে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞাতি গোষ্ঠী সবাই কি সেখানে গিয়ে এখানকার ক্ষতিপূরণ পাবে? ব্যবসায়ীরা পাবে ব্যবসায়, ব্যারিস্টারেরা পাবেন প্র্যাকটিস, শ্রমিকরা পাবে কলকারখানার কাজ, কৃষকরা পাবে কর্ষণের জমি? বিশ্বাস হয় না, অধ্যাপক সাহেব। তার পর ভেবে দেখুন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কোনো কারণে যুদ্ধ বেধে যায় মুসলমানের বোমা পড়বে মুসলমানের মাথায়। ধর্মভাই বলে সে রেহাই পাবে না। বোমা যে ফেলবে সে হিন্দু মুসলমানে বাছবিচার করবে না। হিন্দু মুসলমান একই মহল্লায় না

হোক একই শহরে বাস করে। বোমা এত উপর থেকে ফেলা হয় যে তার লক্ষ্য শুধুমাত্র হিন্দু হতে পারে না। এমন একটিও শহর নেই যেটি মুসলিমবিহীন। আজকের মুসলিম ইউনিটি কালকের মুসলিম নিধনের পথ করে দেবে, যদি সেটা পার্টিশনের জন্যে আকাশ পৃথিবী তোলপাড় করে। আজাদ ও আবদুল গফ্‌ফার খান মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু। কায়দে আজম জিন্না মুসলমানের নন, মুসলিম লীগ নামক দলের শ্রেষ্ঠ নেতা।"

"মুসলমানের প্রকৃত বন্ধু কে সে বিচার মুসলমানের উপরেই ছেড়ে দিলে ভালো হয়, রায় বাহাদুর।" শরীফ উত্তপ্ত হয়ে বলেন। "আজাদ যা পেয়েছেন তা হিন্দুর কাছ থেকে পেয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতি পদ। জিন্নাহ্‌ যা পেয়েছেন তা মুসলমানের কাছ থেকে পেয়েছেন। লীগসভাপতি পদ। বাদশাহ্‌ বাহাদুর শাহ্‌ জাফরের পতন ও কায়দে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র উত্থান এর মধ্যবর্তী যুগটা আমাদের গৌরবের যুগ নয়, আপনাদেরই গৌরবের যুগ। এখন আমরা যে মওকা পেয়েছি তার সদ্‌ব্যবহার করলে ভারতের অর্ধেক অথবা পাকিস্তানের গোটা সিংহাসন আমাদের হবে। মুসলমানের হাতে মুসলমান হয়তো একদিন মরবে, কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে গেলে চলবে না। লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম রাজত্বের রেস্টোরেশন। আমাদের নিন্দাবাদ না করে বরং এই বলে ধন্যবাদ দিন যে আমরা নিখিল ভারত দাবী করছিনে। রেস্টোরেশন চাইলেও পুরো মোগল সাম্রাজ্যের নয়। আপনাদের সঙ্গে সদ্‌ভাবের খাতিরেই দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, আলীগড় ত্যাগ স্বীকার করছি। কায়দে আজমের এই ত্যাগস্বীকার মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ স্বীকারের চেয়ে কম নয়। জেলে যাওয়াটাই কি ত্যাগস্বীকারের একমাত্র নিরিখ?"

"এতই যখন ত্যাগ করছেন", ডাক্তার নিয়োগী রাগ চেপে বলেন, "তখন কলকাতাসমেত পশ্চিমবঙ্গও ত্যাগ করুন।"

শরীফ সাহেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, মোহিনীবাবু কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "ওটা একটা আত্মঘাতী প্রস্তাব। বাংলাদেশ দু'ভাগ হলে পশ্চিম ভাগটা হবে হিন্দুস্থানের ল্যাজ আর পূর্ব ভাগটা পাকিস্তানের ল্যাজ। যে প্রদেশ সারা দেশের মাথা ছিল সে কোনো অংশেরই মাথা হবে না। বাঙালী জাতির গোড়া কেটে আগায় জল দিলে সে কি দিন দিন শুকিয়ে যাবে না? একেই বলে, রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ। কার্জনের আমলেও এ দাওয়াই এত খারাপ ছিল না, কারণ কেন্দ্র ছিল একটাই, তার কাছে গিয়ে নালিশ

করতে পারা যেত। এবার দেশ দু'ভাগ হয়ে দুই কেন্দ্র হবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে অত্যাচার হলে সে হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করতে পারবে না, কারণ সে সেখানে এলিয়েন। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেটাকে দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করবেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুও তাকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে না। ছুটবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর কাছে সাহায্যের জন্যে। তখন আমরা কবির ভাষায় গাইব, এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে! না, ডাক্তার সাহেব, এ দাওয়াই আপনার উপযুক্ত হয়নি, এটা একটা হাতুড়ে দাওয়াই। এর থেকে মালুম হচ্ছে বাঙালীর মস্তিষ্ক এখন দেউলে। বাঙালী বলতে আমি বাঙালী মুসলমানকেও বোঝাতে চাই। পাকিস্তানের জন্যে অবাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তাঁরাও দেউলেপনার পরিচয় দিচ্ছেন। শরীফ সাহেব, আপনারা ভাবছেন আপনারা ওঁদের ব্যবহার করছেন। তা নয়। ওঁরাই আপনাদের ব্যবহার করছেন। আমি আবার বলি, জিন্না সাহেব একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান। তিনি আপনাদের এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন। এর মধ্যেই তিনি বাঙালী মুসলমানের স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন ও ভুলিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রস্তাবটার উপর কলম চালিয়ে দেশকে প্রদেশে পরিণত করেছেন। পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশে। পাকিস্তান হলে সেখানকার কেন্দ্র থেকে শাসক নিয়োগ হবে। সে শাসক বাঙালী না হতেও পারেন। হিন্দুস্থানের মুসলিম অফিসারগণ দলে দলে চলে আসবেন পাকিস্তানে চাকরি করতে। আপনাদের সন্তানরা তো হিন্দুস্থানে চাকরি করতে যেতে পারবেন না। একেই বলে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচা।"

"আপনি তা হলে আমাদের কী চাইতে পরামর্শ দেন? দুই প্রান্তে দুই স্বতন্ত্র পাকিস্তান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান? হিন্দুস্থান কি দুই পাকিস্তানকে দুই বগলে পুরবে না? দুই পাকিস্তানের এক হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়।" শরীফসাহেব বলেন।

"সেলফ ডিটারমিনেশনের অধিকার আপনাদের আছে। আপনারা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু আমাদেরও কি সে অধিকার নেই? আমরাও কি সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারব না? আপনারা ভারতে মাইনরিটি হতে রাজী না হলে আমরাও পাকিস্তানে মাইনরিটি হতে নারাজ হব, প্রোফেসর শরীফ। আমরা চাইব কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ।" ডাক্তার সাহেব বলেন।

"তা হলে 'বন্দে মাতরম্' মিথ্যা? 'বঙ্গ আমার জননী আমার' মিথ্যা? 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' মিথ্যা? বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা লিখেছেন? তা নয়। আপনারাই ভুল করছেন। পাকিস্তানকে আপনারা অকারণে ভয় করছেন। পাকিস্তান হিন্দুর শত্রু নয়। আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন ছিল সিরাজউদ্দৌলার আমলে।"

তাপের মাত্রা বাড়ছে দেখে মুস্তাফী তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দেন। সৌম্যর দিকে ফিরে জানতে চান গান্ধীজী আজকাল নীরব কেন।

"তিনি আজকাল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এমন নিঃসঙ্গতা জীবনে অনুভব করেননি। এমন এক দিন ছিল যেদিন সমগ্র দেশে কংগ্রেসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সেদিন তিনি ভারতীয় প্রাণশক্তির একমাত্র প্রতিভূ হিসাবে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি আরউইনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। তেমন দিন আর ফিরল না। কংগ্রেসের ভিতরেই দেখা গেল তাঁর কথার দাম কমে গেছে। ভোট নিলে হয়তো তিনিই জিততেন। কিন্তু তেমন জয় তিনি চাননি। তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও থাকেন না। প্রতিনিধিত্বের দাবী সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। কংগ্রেসকে তিনি ছাড়লেও কংগ্রেস কিন্তু তাঁকে ছাড়ে না। কমলি নেহি ছোড়তি। কংগ্রেস নেতারা যখনি তাঁর পরামর্শ নিতে যান তখনি তিনি তাঁর পরামর্শ দেন। কিন্তু নিতে বাধ্য করেন না। লোকে ভাবে তিনি একজন ডিকটেটর। কিন্তু ডিকটেটর যদি তিনি হয়ে থাকেন তবে সেটা নৈতিক বলে বলীয়ান মহাপুরুষের ডিকটেটরশিপ। সেটার পরিচয় মেলে সংগ্রামের সময়। তখন কংগ্রেস তাঁকে দেয় সেনাপতির ভূমিকা। শান্তির সময় কিন্তু তিনি আর সেনাপতি নন। তিনি পরামর্শদাতা। কংগ্রেসের হয়ে কথা বলার দায় তাঁর নয়, কংগ্রেস সভাপতির। গত ছ'বছর ধরে মওলানা আজাদের। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে চান তবে আজাদকেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এখন দেশে কংগ্রেসের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরেও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী। সবচেয়ে বড়ো কথা গান্ধীজীর সঙ্গেও কংগ্রেস নেতাদের পায়ে পা মিলছে না। ভারতের শাসনব্যবস্থার কংগ্রেস নেতারা চান কেন্দ্রীকরণ। মুসলিম লীগ নেতারা চান দ্বিকেন্দ্রীকরণ। আর গান্ধীজী চান বিকেন্দ্রীকরণ। যেখানে এতখানি মতভেদ আর সব ক'টা মতই নীতিগত

সেখানে অন্যান্য নেতাদেরকে কথা বলতে দিয়ে নিজের সরে থাকাই শ্রেয়। সকলেই জানে তিনি কেন্দ্রের হাতে মাত্র তিনটি বিষয় রেখে দিয়ে আর সব বিষয় প্রদেশের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। ফলে প্রদেশের বল বাড়বে, কেন্দ্রের বল কমবে। কংগ্রেস নেতাদের কিন্তু উল্টো মত। তাঁরা প্রদেশকে দুর্বল না করে কেন্দ্রকে বলবান করতে চান। যেমন ব্রিটিশ আমলে। যেমন মোগল আমলে। শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে ভারতের বলকানীকরণ হতে পারে। অথচ জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবী তুলে ভারতকে বলকানের অভিমুখে রওনা করে দিতে উদ্যত। ভারত যদি ধর্মের নিরিখে দু'ভাগ হয় ভাষার নিরিখে বহু ভাগ হবে না কেন? একবার যদি ভাঙন শুরু হয় সেটা কি সেখানেই থামবে? শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকলে সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে? মুসলমানদের নিশ্চয়ই একটা বখরা দিতে হবে। কিন্তু দাবীদার তো একমাত্র মুসলমানরাই নন। এ এক জটিল সমস্যা। এর একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হলে ঘোর অশান্তি। যে আগুন জ্বলবে তাতে সবাই দগ্ধ হবেন—গান্ধী, জিন্না, আজাদ, তারা সিং, আম্বেদকর, সাভারকর, লর্ড ওয়েভেল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সময় থাকতে তার প্রতিবিধান করতে চান বলেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীত্রয়কে ভারতে পাঠিয়েছেন। পেথিক-লরেন্স দীর্ঘকালের ভারতবন্ধু। ক্রিপসও তাই। শুনছি তৃতীয়জনের নাম আলেকজাণ্ডার।"

"শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আমরাও চাই, চৌধুরীজী। ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ না হলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসাই হবে। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে নেতারা সবাই থাকবেন, আজাদ সাহেব বাদে। দরাদরি সেইখানে বসেই চালাবেন। তার পর কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে তাঁদের মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করবেন। সেখানে তা পাশ হয়েও যাবে। কেন্দ্রীকরণ, দ্বিকেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ যেটাই হোক না কেন সর্বসম্মতিক্রমেই হবে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যেমন অধিকাংশের ভোটে বিল পাশ হয়, কখনো কখনো একটামাত্র ভোটের ব্যবধানে, ভারতের মতো বহুধর্মী, বহুভাষী দেশে সেটা অনুসরণ করা চলবে না। এই কথাটাই কায়দে আজম বলে আসছেন পঁচিশ বছর ধরে। মেজরিটি ভোট মামুলী বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু যেসব প্রশ্নে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থাকে সেসব প্রশ্নে একান্নজনের মেজরিটি ভোটই যথেষ্ট নয়। অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ করতে হয়। এমন প্রশ্ন থাকতে পারে যার নিষ্পত্তির জন্যে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ভোটের আবশ্যক হয়। ভারতে হিন্দুর সংখ্যানুপাত শতকরা সত্তরের মতো। এখানে

দুই-তৃতীয়াংশ না হয়ে তিন-চতুর্থাংশ ভোটই মাইনরিটিদের পক্ষে নিরাপদ। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কংগ্রেস যদি বলে, ভারতের সরকারী ভাষা হবে হিন্দী আর মুসলিম লীগ যদি বলে, উর্দু, তা হলে সেটা শতকরা একান্নটা ভোটে পাশ হলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। শতকরা সাতষট্টি হলেও মুসলিম লীগের বিষম আপত্তি থাকবে। লীগ পক্ষে বহু হিন্দু শিখও ভোট দেবেন। তবু নিরাপত্তার খাতিরে শতকরা পঁচাত্তরই বিধেয়। নয়তো হিন্দী উর্দু উভয়কেই সরকারী ভাষা করতে হয়। ব্রিটেনের মতো একমাত্র ইংরেজীকেই সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। হিন্দু মুসলিম বিরোধের তলে তলে কাজ করছে হিন্দী উর্দু বিরোধ। এটা যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে সক্রিয়। উর্দুকে আদালত থেকে হটানো মানে মুসলিম রাজকর্মচারীদের হটানো। হিন্দীকে তার জায়গায় বৈঠানো মানে হিন্দু রাজকর্মচারীদের বৈঠানো। সার সৈয়দ আহমদ আতঙ্কিত হন হিন্দীভক্তদের উৎসাহ দেখে। তাঁর কংগ্রেসবিরাগের মূলে হিন্দুবিরাগ নয় হিন্দীবিরাগ।” অধ্যাপফ শরীফ বিশ্লেষণ করেন।

রায় বাহাদুর কটাক্ষ করেন, “সেই সঙ্গে বাঙালী উকীল ব্যারিস্টার শ্রেণীর প্রতি বিরাগ। এই শ্রেণীটাই নাকি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্টের অপোজিশন হিসাবে কংগ্রেস পরিচালনা করতে করতে একদিন সেই গভর্নমেণ্টের উত্তরাধিকারী হবে। যে পদ্ধতিতে হবে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। সার সৈয়দের মতে সেটা ভারতের মতো দেশের অনুপযুক্ত। একই কথা শোনা যায়, শাসক শ্রেণীর মুখেও। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে। পদ্ধতিটা ভারতের অনুপযুক্ত তো বটেই, ভারতও পদ্ধতিটার অনুপযুক্ত। কিপলিং তো একটা কবিতাই লিখে ফেলেন, ‘হারি চাণ্ডার মুকার্জি ব্যারিস্টার অ্যাট ল’। হা হা হা! পড়েছেন?”

কেউ পড়েননি শুনে রায় বাহাদুর বলেন, “বাঙালী বাবুদের উপর সে কী গায়ের ঝাল ঝাড়া! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ ট্রাইবাল আক্রমণকারীরা এসে বাঙালী বাবুদের পার্লামেণ্টারি লীলাখেলা সাঙ্গ করে দেবে। তাঁদের প্রাণে বাঁচাই দায় হবে। জীবিত থাকলে কিপলিং সাহেবের চোখ কপালে উঠত যখন শুনতেন যে বাঙালী বাবু সুভাষ চাণ্ডার বোস সেই সব ট্রাইবালদের এলাকা দিয়ে কাবুলে গিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের তোড়জোড় করছেন। পার্লামেণ্টারি লীলাখেলায় তাঁরও অনীহা।”

"পার্লামেণ্টারি লীলাখেলায় আমাদেরও অনীহা।" সৌম্য গান্ধীপন্থীদের দিক থেকে জানায়। "সাধারণ নির্বাচনের পরে জনগণের সঙ্গে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আর সংশ্রব থাকে না। তবু পরের বারের নির্বাচনে একটা জবাবদিহির দায় থাকে। যে দায় চার্চিলের মতো মহা প্রতাপশালী জননায়কেরও ছিল। সাধারণ নির্বাচকরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। গান্ধীজীর মতো পার্লামেণ্টারি লীলাখেলার উপর আস্থাহীন সংগ্রামীর উপরেও এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে। পার্লামেণ্টারি পন্থাকে তিনি এখন সত্যাগ্রহের মতোই গুরুত্ব দেন। ইংরেজরা যদি এখন হারি চাণ্ডার মুকাজির সঙ্গে পার্লামেণ্টারি হারজিতের খেলায় যোগ দিতে সম্মত থাকেন তবে কেবল আটটি প্রদেশে কেন, কেন্দ্রীয় আইনসভাতেও কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। হারি চাণ্ডারের দল একদিন মেজরিটি পাবেন সেই আশঙ্কায় তাঁরা মুসলিম লীগের উৎপত্তি ঘটিয়েছেন, তাকে সেপারেট ইলেকটোরেটের মই ধরিয়ে দিয়েছেন, সে মই বেয়ে উপরে উঠেছে কংগ্রেসের মেজরিটিকে ভীটো দিয়ে চালমাৎ করতে। যেটা করতে বড়লাটেরও বাধে। আর কোনো উপায় পাওয়া যাচ্ছে না বলে কেন্দ্রটাকেই দু'ভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে। সেটা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে, ইংরেজদের স্বার্থে নয়, একথা বিশ্বাস করা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে শক্ত। আমাদের সন্দেহ হয় এটা আমাদের সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লক্ষ্য থেকে দিগ্‌ভ্রান্ত করার ফন্দী। আমরা ইংরেজের সঙ্গে না লড়ে মুসলমানদের সঙ্গে লড়ব। জনতার রোষ পড়বে জনতার উপরে, হিন্দুর রোষ মুসলমানের উপরে, মুসলমানেরই রোষ হিন্দুর উপরে। ইংরেজরাই হবে দু'পক্ষের রক্ষক ও সালিশ। তাদের সালিশীতে একপক্ষ পাবে পাকিস্তান, অপর পক্ষ হিন্দুস্থান। যেন এইজন্যে এতকালের স্বপ্ন। উমেশ চাণ্ডার বনার্জি থেকে যায় শুরু। সুভাষ চাণ্ডার বোসেও যা শেষ নয়। এই মুহূর্তে আমাদের একমাত্র ভাবনা স্বাধীনতার জন্যে অধীর হয়ে আমরা যেন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ি। তা হলে স্বাধীনতা তো হবেই না, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক চিরকালের মতো বিষিয়ে যাবে। এটা আমাদের আত্মপরীক্ষার আর আত্মশুদ্ধির সময়। এখনকার পলিসির নাম মার্ক টাইম।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে শোনে। এর পর অধ্যাপক শরীফ বলেন, "চৌধুরীজী, ইংলণ্ডের মতো দেশেও এককালে গৃহযুদ্ধ বেধেছিল। পিউরিটান বনাম অন্যান্য। এ রকম বিরোধ কোথায়ই বা না বেধেছে! ইংরেজরা আপনাদের

হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেলেও এ রকম বিরোধ বাধবে। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ নয়, হিন্দু মুসলমান উভয়ের দেশ। তাকে যদি আপনারা মেজরিটির ভোটে আপনাদের মনোপলি করতে যান তো আমরাও ভোটের রাজনীতির উপর আস্থা হারিয়ে নেতাজী সুভাষ বোসের পন্থা অনুসরণ করব। উদ্দেশ্য হোমল্যাণ্ড অর্জন। গান্ধীজীর মতো জিন্নাহ্ সাহেবের বুকের ভিতরেও একই আগুন জ্বলছে। কিন্তু সেটা কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির নয়, হিন্দু আধিপত্য থেকেও মুক্তির। ইংরেজদের কথায় তিনি নাচছেন না। আটটা প্রদেশ কংগ্রেস দখল করেছে বলেই নাচছেন। উপরন্তু নিয়েছে পাঞ্জাব মন্ত্রিমণ্ডলেরও একাংশ। কংগ্রেস এখন তার দখল পাকা করতে চায়। তার পলিসি কনসলিডেশন। তাই মার্ক টাইম। লীগ পলিসি তার বিপরীত। কায়েদে আজম বেশীদিন সবুর করবেন না। প্রলয় নাচন নাচবেন।"

॥ সতেরো ॥

ভুরিভোজনের পর বিদায় নেবার পালা। মোহিনীবাবু বলেন, "ত্রেতাযুগে দ্রৌপদী এর চেয়ে এমন কী ভালো রাঁধতেন হে, বাসুদেব?"

"কথাটা ঠিক। তবে ত্রেতাযুগে নয়, দ্বাপর যুগে।" রায় বাহাদুর হাসেন।

"কিন্তু কোফতা আর কালিয়া কি দ্বাপরযুগেও ছিল?" শরীফ সাহেব তর্ক করেন। "আমি ভাবছি চৌধুরানীজী কার কাছে এ বিদ্যা শিখলেন।"

"কেন? আমাদের বাড়ীর বাবুর্চির কাছে। মানে বাপের বাড়ীয়। পিণ্ডিতে যখন ছিলুম তখন থেকেই আবু তালিব আমাদের সঙ্গে আছে। বছর তেইশ চব্বিশ।" জুলির যতদূর মনে পড়ে।

"সে কী, আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন?" শরীফের তাক লাগে।

"এখনো তো দেশভাগ হয়নি। হবে না আশা করি। কিন্তু যদি হয় তবে আবুকে বিদেশী বলে তার বুড়ো বয়সে জবাব দিতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে।" জুলি বলে।

"কেন? বিদেশী বলে কেন?" শরীফ চমকে ওঠেন। "পূর্ব পাকিস্তানও হবে তার স্বদেশ। আপনারও তাই।"

"কিন্তু আমরা যে কলকাতার মানুষ। কলকাতা কি পূর্ব পাকিস্তানের সামিল হবে? যদি দেশভাগ হয়। হবে না আশা করি।" জুলির ধারণা।

"কলকাতা বাদ দিয়ে কি পূর্ব পাকিস্তানের কথা ভাবা যায়? আপনারা ঠাওরেছেন পূর্ব পাকিস্তান মানে পূর্ববঙ্গ। ভুল! ভুল! বিলকুল ভুল! গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্যে দিল্লী ছেড়ে দিচ্ছি, আগ্রা ছেড়ে দিচ্ছি। তার উপর কলকাতাও ছাড়ব! এ তো ভারী মজার কথা।" শরীফ সাহেব বিদ্রূপ করেন।

ডাক্তার নিয়োগী আর সইতে পারেন না। বলেন, "সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অভিযান মনে পড়ে? কলকাতার গোরাদের তিনি মানুষ বলে গণ্য করেননি। পরিণাম পলাশীতে পরাজয় ও পতন। এবার কলকাতার হিন্দুদের মানুষ বলে গণ্য করা হবে না, যেন তাদের সম্মতি অসম্মতির কোনো দাম নেই। মুসলিম লীগ চাইবে, ব্রিটিশ সরকার দেবেন। ব্যস্। অমনি কলকাতার হিন্দুরা ক্রীতদাসের মতো হস্তান্তরিত হবে!"

ক্যাপটেন মুস্তাফী উভয় পক্ষকে থামিয়ে দেন। "আর ক'টা দিন সবুর করুন। শোনা যাক ক্যাবিনেট মিশন কী নিষ্পত্তি করেন। তাঁরা এক এক করে গান্ধী, জিন্না, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি বড়ো বড়ো নেতাদের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করছেন। নিজেদের মন খোলা রেখেছেন। গান্ধীজী নাকি দেশভাগে রাজী হবেন জিন্না সাহেব যদি দুই রাষ্ট্রের এক ডিফেন্স, এক ফরেন অ্যাফেয়ার্স, এক রেল পোস্ট অফিসে রাজী হন। কলকাতা তা হলে পূর্ব পাকিস্তানেই যাবে। কিন্তু কলকাতার লোক ইণ্ডিয়ান পাশপোর্টেই সর্বত্র যেতে আসতে পারবে। আমরা যারা এখানে বাস করব তাদেরও সেই একই পাশপোর্ট।"

শরীফ সন্তুষ্ট হন না। "গান্ধীজী এক হাতে যা দেবেন আরেক হাতে তা ফিরিয়ে নেবেন। ঝানু পলিটিসিয়ান। কিন্তু জিন্না সাহেব কি ভুলবেন? ভবী ভোলে না। বিকেন্দ্রীকরণ নয়, দ্বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর লক্ষ্য। কেউ তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবেন না। ক্যাবিনেট মিশনও না। তাঁর পেছনে ন'কোটি মুসলমান। সবাই লড়াকু। তবে গৃহযুদ্ধ এড়ানোই সুবুদ্ধি। তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করতে হবে উভয়কেই।"

মিলির মা বাবাকে, জুলি ও সৌম্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিরা একে একে বিদায় নেন। তখন চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে মিসেস মুস্তাফী বলেন, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।"

"কেন ওকথা মনে হলো, মাসিমা?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"ওঁদের ওইসব কথাবার্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে কলকাতা নিয়ে হিন্দু মুসলমানে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। মিলি থাকলে ওই আগুনে ঝাঁপ দিত। ভাগ্যিস্ সে এখন নিরাপদ দূরত্বে। তার সঙ্গে রণও। ওদের আচমকা দেশ ছেড়ে যাওয়ায় শক পেয়েছিলুম। জুলি এসে পড়ায় সামলে নিই। এখন দেখছি ওদের চলে যাওয়াই শাপে বর হয়েছে। বেঁচে থাকলে আবার কতবার দেখা হবে। মিলির যা স্বভাব। আগুন দেখলেই ও ঝাঁপ দেবেই।"

"সেটা তো আমারও স্বভাব, মাসিমা। কলকাতা জ্বলছে শুনলে আমি কি এখানে বসে বেহালা বাজাব নাকি? আমার মা রয়েছেন ওখানে। তা ছাড়া আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে জনতা। হিন্দুদের মুসলমানদের হাত থেকে, মুসলমানদের হিন্দুদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চার বছর আগে ওরা সবাই আমাকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নইলে আমার তো কোর্ট মার্শাল হতো, মাসিমা।" জুলি মনে করিয়ে দেয়।

"তোমাকে আমরা কলকাতা যেতে দেব না, জুলি। সৌম্যকেও না। সেটা শুধু তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে নয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্যেও। কলকাতার আগুনের ফুলকি এখানেও তো উড়ে আসতে পারে। নুরুদ্দীনের দলবল কি আমাদের রেহাই দেবে? জরের যম জারমলান, হিন্দুর যম নুরুদ্দীন। গায়ে কাঁটা দেয়। কেন যে তোমরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে চাও বুঝতে পারিনে। ওরা তো ঘরের ঢেঁকী কুমীর নয়, যেমন এরা।" মিলির মা অকপটে বলে যান।

"আমরা তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছি যে এদিকে পাকিস্তান হলে ওদিকে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেব।" মুস্তাফী প্রকাশ করেন। "কিন্তু কলকাতা নিয়ে যদি লড়াই বাধে তবে যেখানে আছি সেখানে থাকাই ভালো। এখানে আমাদের অসংখ্য পেসেণ্ট। অধিকাংশই মুসলমান। ওরা যদি বাঁচতে চায় তো ওদের ডাক্তার পরিবারকেও বাঁচাবে। আর তোমরাও তো আশ্রমের মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু লোককে জীবিকা জোগাচ্ছ। ওরা বাঁচবে কী

করে তোমরাই যদি না বাঁচো? যাকে বাঁচাও সে বাঁচায়।" মুস্তাফী বিশ্বাস করেন।

সৌম্য সেকথা সমর্থন করে। "আমি কাসাবিয়াঙ্কার মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকব। সেটাই আমার পিতার আদেশ। মরতে হয় মরব। আমাদের উদ্দেশ্য অপর পক্ষের অন্তঃপরিবর্তন ঘটানো। ইংরেজদের বেলা সেটা অনেকদূর সফল হয়েছে। কিন্তু লীগপন্থী মুসলমানদের বেলা আদৌ সফল হয়নি। কেমন করে হবে, কতদিনে হবে, এই এখন আমাদের ভাবনা। মূলনীতি বিসর্জন না দিয়ে এটা যদি সম্ভব হয় তো গান্ধীজী বাঁচবেন। নয়তো তাঁর জীবন সংশয়। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের ভাবনা। জুলির জন্যে আমি চিন্তা করিনে। সে দ্রৌপদীর মতো রন্ধনের পরীক্ষায় পাস করেছে। দ্রৌপদীর মতো বীরত্বের পরীক্ষায়ও পাস করবে।"

"তোমাকে একলা রেখে আমি কোথাও যেতে পারব না। তুমি যেখানে আমি সেখানে।" জুলি বলে দৃঢ় স্বরে।

মুস্তাফীরা তা শুনে আশ্বস্ত হন। মিলির মা বলেন, "আমার মেয়ে নও বলে কি তুমি আমার মেয়ের চেয়ে কম আপন? তোমাকে কি আমি বিপদের মুখে কলকাতায় ঠেলে দিতে পারি?"

মিলির বাবা বলেন, "আমার মনে হয় না ব্যাপার ততদূর গড়াবে। গড়ালে ইংরেজরাই এদেশে অনির্দিষ্টকাল আটকা পড়বে। বার্টন সাহেব আমাকে বলে গেছেন সামনের জানুয়ারি মাসেই তিনি ইণ্ডিয়া কুইট করবেন। তবে যদি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পান তা হলে আরো এক বছর দেরি করতে পারেন। একই মনোভাব আরো অনেক সাহেবেরই। এদেশ থেকে ওঁদের মন উঠে গেছে। দেশে ফিরে গেলে অন্য কোনো চাকরির আশা আছে। কিন্তু বেশী দেরি করলে চাকরি বাকরি খালি থাকবে না। ক্যাবিনেট মিশন এটা বোঝেন। তাই একটা মিটমাটের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। দ্যাখ, সৌম্য, তোমরা স্বীকার করো আর না করো মুসলিম লীগেরও একটা কেস্ আছে। বিলেতের গভর্নমেণ্টে এক পার্টি যায়, আরেক পার্টি আসে। কনসারভেটিভের পর লিবারল, লিবারলের পর কনসারভেটিভ। ইদানীং লিবারলের জায়গায় লেবার। এর নাম রোটেশন। আমাদের দেশে কি রোটেশনের জো আছে? কংগ্রেসের পর মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের পর কংগ্রেস এ রকম পালাবদল কি সম্ভব? দিল্লীতে মুসলিম লীগ কোনো কালেই

মেজরিটি পাবে না। তা হলে কি সে কোনোদিনই ক্ষমতার মুখ দেখবে না? তার জন্যে কি তাকে কংগ্রেসের অনুগ্রহে কংগ্রেসের জুনিয়র পার্টনার হতে হবে? জিন্না সাহেব কারো অনুগ্রহ চান না। না কংগ্রেসের, না ইংরেজের। সেইজন্যে তিনি একটা তৃতীয় বিকল্প বার করেছেন। মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান। পাকিস্তান হলে সেখানে কংগ্রেসই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী হবে। তাঁর জুনিয়র পার্টনার হতে পারবেন কংগ্রেস মন্ত্রীরা। যেমন এই বাংলাদেশে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া একদিন না একদিন হবেই। কোথাও কংগ্রেস সিনিয়র ও লীগ জুনিয়র পার্টনার। কোথাও লীগ সিনিয়র ও কংগ্রেস জুনিয়র পার্টনার। বলা বাহুল্য এর জন্যে চাই দুই পার্টির মধ্যে চুক্তি। আর সেই চুক্তি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর রিনিউ করা চাই। কিন্তু তার গ্যারান্টি দেবে কে? নতুন শাসনতন্ত্র কি গ্যারান্টি দিতে পারে? নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করার অপূর্ব সুযোগ এসেছে আমাদের জীবনে। আমরা যেন এর সদ্ব্যবহার করতে পারি।”

সৌম্যকে স্বীকার করতে হয় যে ইংলণ্ডের মতো রোটেশন ভারতে চলবে না। কোয়ালিশনই শ্রেয়। কিন্তু সমমনস্ক পার্টি না হলে কোয়ালিশন মানে নিত্য দ্বৈরথ। তা হলে কি তৃতীয় বিকল্প বলতে পার্টিশন? দুই আর্মি, দুই ফরেন অ্যাফেয়ার্স, দুই রেলওয়ে সীস্টেম? এক রাষ্ট্রের নাগরিক অপর রাষ্ট্রে এলিয়েন? পাকিস্তানে গান্ধী, হিন্দুস্থানে জিন্না? ইণ্ডিয়ান নেশন দু'ভাগ? ভারতীয় মুসলিম সমাজ দু'ভাগ? কোনো সুরেই ঐক্য থাকবে না? পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু'চির? মোগল সম্রাট বা ব্রিটিশ বড়লাট কেউ এমন বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারেননি। জিন্নাকে বড়লাট করলে যদি তাঁর অন্তঃপরিবর্তন ঘটত!

“আমাদের গণসংযোগ প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানই পাঁউরুটি আর মাছ ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এর প্রতিকার ইংরেজের গদীত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসেরও গদীত্যাগ। অন্যান্য দল মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে মিশে রাজত্ব করুক। কিন্তু পার্টিশন কদাচ নয়।” সৌম্য এই বলে শুভরাত্রি জানায়।

সৌম্যর 'সর্বোদয় আশ্রম' ধর্মীয় আশ্রম নয়। তার বাইরের ফটকে উৎকীর্ণ: “শুনহ, মানুষ ভাই। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই!” ফটকের একপাশে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল: “এখানে

হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ হরিজন, উচ্চ নীচ, নরনারী ভেদ নাই। সকলেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব।" আর একপাশে: "শ্রমই এই আশ্রমের প্রাণ। শ্রমই জপ তপ উপাসনা ও আরাধনা।"

আশ্রমের কাজকর্ম সকাল ছ'টায় শুরু, সন্ধ্যা ছ'টায় শেষ। সে সময় সকলেই যে যার বাড়ী ফিরে যায়, থাকে কেবল চৌকিদার, মালী আর জনা কয়েক আবাসিক কর্মী, যাদের আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাদের আহারাদির ব্যবস্থা তারাই করে,। কিন্তু দুপুরবেলা সকলেই আশ্রমের লঙ্গরখানার অতিথি। সেখানে নিখরচায় ডাল, ভাত ও একটা কি দুটো সবজি খেতে দেওয়া হয়। পরিবেশন করে ব্রাহ্মণ হরিজন, হিন্দু মুসলমান, নর নারী, যখন যাদের নাম লটারিতে ওঠে। আর রান্না করে যারা রন্ধননিপুণ। তাদের জাত বা ধর্ম দেখে নয়, গুণ ও কর্ম দেখে বাছাই করে আশ্রম কমিটি। তারাও পালা করে রাঁধে। অন্য সময় করে যার যার নিজের কাজ। কামারের কাজ, কুমোরের কাজ, ছুতোরের কাজ, দর্জির কাজ, তাঁতীর কাজ, কাটুনীর কাজ। এমনি হরেক রকমের কাজ। ময়লা সাফাইয়ের কাজ নিয়মিত করতে হয় কর্মীদের সবাইকেই। বাসন মাজা, কাপড় কাচা যার যার নিজের।

সকলে এক সঙ্গে বসে খায়। কিন্তু মেয়েদের আলাদা পঙ্‌ক্তি। রাত্রে মেয়েদের থাকতে দেওয়া হয় না। তবে যারা স্ত্রী নিয়ে থাকতে চায় তাদের জন্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র কুটির আছে। তার জন্যে ভাড়া দিতে হয়। সেটা আসে উপার্জন থেকে। উৎপাদন অনুসারে উপার্জনের হিসাব হয়। উপার্জনে তারতম্য থাকে। আশ্রম কাউকে মজুরি দেয় না। নিজের খরচে খেলে আমিষ খেতে নিষেধ নেই, কিন্তু আশ্রমের খরচে খেলে নিরামিষই বিধি। নইলে খরচ বাড়ে। আশ্রমের সাধ্যের বাইরে। এই আশ্রম একটা ট্রাস্ট। সৌম্যও ট্রাস্টিদের একজন। তার পৈত্রিক সম্পত্তির কতক অংশ ট্রাস্টের তহবিলে খয়রাত করেছে। বাকী দু'জন ট্রাস্টী গুজরাটী। তাঁরা সৌম্যর উপরে আস্থাবান। তাকে পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়।

রোজ আশ্রমে গিয়ে তার প্রথম কাজ ঝাড়ু আর বালতি হাতে সাফাইয়ের অভিযানে যোগ দেওয়া। এটাই আশ্রমিকদের সমবেত প্রার্থনা। শরীরকে শুচি রাখা যেমন প্রাথমিক কর্তব্য পরিবেশকে পরিষ্কার রাখাও তেমনি

প্রাথমিক কর্তব্য। অপরিষ্কার পরিবেশ থেকে কতরকম ব্যাধির উৎপত্তি সভ্য জাতি বলে যাদের পরিচয় তারা পরিবেশ পরিষ্কার রাখে! আমরা কি সভ্য জাতি? তা যদি হয়ে থাকি তবে আমাদের পরিবেশকেও নিজের মতো সাফ সুতরো রাখা চাই। দুঃখের বিষয় যত জন নিখরচায় আশ্রমের ভাত খায় তত জন নিখরচায় আশ্রম সাফ রাখতে এগিয়ে আসে না। সৌম্য ধৈর্য ধরে সহ্য করে যায়। এর পেছনে বহু শতাব্দীর উচ্চ নীচ মনোভাব আছে। আমরা উচ্চ বর্ণ, আমরা নীচ বর্ণের মতো ধাঙড়ের কাজ করব? তা হলে করবেটা কে? যারা চিরকাল করেছে তারাই চিরকাল করবে। পূর্বজন্মের কর্মফল। কত বড়ো বড়ো মহাপুরুষ এলেন আর গেলেন, কেউ কি এ প্রথা বদলে দিতে পারলেন? মহাত্মা গান্ধী পারবেন? পাগলামি! সৌম্য একটু একটু করে সাড়া পায়। জুলি ঝাড়ুদারনীর মতো গাছকোমর বেঁধে সাথী হয়।

এখানকার কর্মীরা সবাই সবাইকে সাথী বলে। যেমন কমিউনিস্টরা পরস্পরকে বলে কমরেড। এটা ছোটখাটো একটা সমাজ। অথচ ধর্মীয় সমাজ নয়। তা বলে ধর্মহীনও নয়। যে যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে প্রেরণা এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা পুরাতন তাঁত চরকা ঘানি ইত্যাদি অবলম্বন করলেও নতুন এক আদর্শের প্রেরণা। সারা দিন তারা অক্লান্তভাবে কাজ করে।

"আমরা যদি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারি তা হলে বিশ্ব জয় করতে চাইনে। বিশ্ব জয় করে কী লাভ হবে, যদি নিজের আত্মাকেই হারাই? ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের দিকে চেয়ে ছাখ। মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তাদের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করছে। যার পরিণতি জার্মানদের গ্যাস চেম্বারে ইহুদীদের গণহত্যা আর মার্কিনদের পারমাণবিক বোমায় জাপানীদের গণবিনাশ। এ ছাড়া আর কোনো পরিণতি হতে পারত না ও পারবে না। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে ছাখ। সেখানেও মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। তফাৎটা এই যে প্রাইভেট ক্যাপিটালিজমের স্থান নিয়েছে স্টেট ক্যাপিটালিজম। শ্রমিকদের ও কৃষকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাটিয়ে নিয়ে ও নাগরিকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৈনিক বানিয়ে ওরা ভাবছে ওরা একটা নতুন শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করছে। একদিন উপলব্ধি করবে ওটা একটা নতুন শৃঙ্খল। যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধের পর কোনো পক্ষে

কেউ জীবিত থাকে। আমরা মনুষ্যত্বের বিনাশের উপর নয়, বিকাশের উপরেই জোর দিই। চরকা চিরকাল চরকা থাকবে না, তারও বিবর্তন হবে। কিন্তু সে থাকবে কাটুনীর আয়ত্তে। কাটুনী তার আয়ত্তে নয়। মানুষের জন্যেই যন্ত্র, যন্ত্রের জন্যে মানুষ নয়। যন্ত্রকে দিয়ে মানুষের পরিশ্রম কমাতে গিয়ে যন্ত্র মানুষকেই ছাঁটাই করছে, আর সেই ছাঁটাই মানুষগুলিকে যুদ্ধের ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়ে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভারতেও তাই হবে কংগ্রেস নেতারা যদি গান্ধীজীর পন্থা থেকে বিচ্যুত হন। যদি মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে সত্য ও অহিংসা ততই দূরতর হচ্ছে।" সৌম্য তার প্রিয় সাথীকে শোনায়।

জুলি বিনা বাক্যে মেনে নেয়। কখনো ঝাড়ুদারনী হয়ে ঝাড়ু দেয়, কখনো ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেয়, কখনো তাঁতঘরে গিয়ে ব্লাউসের কাপড় বুনতে বসে, কখনো কাটুনীদের সঙ্গে বসে তার জন্যে সুতো কাটে। বাগানে গিয়ে মাটি কোপায় কখনো। সারাদিন খেটে খুটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে যখন তখন তার শরীরময় ক্লান্তি আর ব্যথা। আহারের পর সকাল সকাল বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ঘুমের ঘোরে সৌম্যকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে। পাছে সে উঠে পালিয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে সে কখন থেকে জেগে আছে। জুলিকে জাগিয়ে না দিয়ে অপেক্ষা করছে।

মনে মনে সে তার বান্ধবী বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেয়। তোদের বিপ্লবের আগে আমাদের বিপ্লব হবে, আমরাই জনগণের হৃদয় জয় করব। একবার ওদের হৃদয় জয় করতে পারলে ওদের যা করতে বলব তাই করবে। না, আর ভাঙ্‌চুর নয়। খুন খারাপি তো নয়ই। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করবে ও বাইরে থেকে আক্রমণ এলে আত্মরক্ষা করবে। ভাত কাপড়ের জন্যে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। মোটা চাল মোটা কাপড় নিজেরাই উৎপন্ন করবে। নুনটাই যা দুর্লভ। সেটাও লোনা জমিতে পাওয়া যায়। পঞ্চায়েৎই হবে সত্যিকার সোভিয়েট।

জুলি যে সর্বতোভাবে সৌম্যর সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করছে এটা লক্ষ করে সে আনন্দিত হয়। কিন্তু একই কালে বাবলীর সঙ্গে টক্কর দেবার কথাও ভাবছে। এর জন্যে সে দুঃখিত। জুলিকে বলে, "বাবলীদের দলেও ত্যাগী পুরুষ ও নারী আছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু উপায় মহৎ নয়। আমরা যদি আমাদের উপায়ে দৃঢ় থাকি তা হলে একদিন জনগণ তুলনা করে

দেখবে কোন্‌টা শ্রেয় আর কোন্‌টা প্রেয়। আপাতত আমাদের নিজেদের মধ্যেই যথেষ্ট দোনোমনো। সত্যিকার গান্ধীপন্থীর সংখ্যা এখন আঙুলে গোনা যায়। পঁচিশ বছর আগে আরো অনেক বেশী ছিল। এইভাবে যদি চলতে থাকে পঁচিশ বছর বাদে একটি কি দুটিতে ঠেকবে। বাপু বলেন একজন সত্যাগ্রহীই যথেষ্ট। হ্যাঁ, একজন সত্যাগ্রহীই প্রতিরোধের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু দেশের পুনর্গঠন বা সমাজের পুনর্বিন্যাসের জন্যে যথেষ্ট নয়। বাবলীদের সে সমস্যা নেই। তারা সবাই একমত যে জমিদার, মহাজন আর পুঁজিপতিদের খতম করে সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে আর রাষ্ট্রকে পার্টির হাতের মুঠোর মধ্যে আনলে আর পার্টিকে একজন প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরের আজ্ঞাবহ করলেই প্রগতির পরকাষ্ঠা হবে। ইতিহাস রুশদেশে ওদের একটা সুযোগ দিয়েছে। তার থেকে ওদের ধারণা হয়েছে সব দেশে দেবে। আমাদের এদেশে দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়া বৃথা। শুধু নিজের লক্ষ্যে আর নিজস্ব উপায়ে স্থির থাকতে হবে। তোমার আমার যদি সেই পরিমাণে বিশ্বাসের জোর না থাকে তবে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব না। ইতিহাস আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তবে বাপুকে পেছনে ফেলার সাধ্য কারো নেই। তিনি দু'শো বছর এগিয়ে রয়েছেন। নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া মানব সভ্যতা বাঁচতেই পারে না, আর সে নেতৃত্ব তিনি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে গেলেও নৈতিক নেতৃত্ব বজায় থাকবে। ধ্রুবতারার মতো তিনি পথ দেখাতে থাকবেন। ইংরেজরা বলে, স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস। তুমি যদি বাবলীর সঙ্গে দৌড়ে জিততে চাও তবে তোমাকে ধীর স্থির আর তন্নিষ্ঠ হতে হবে।"

"তোমার কি মনে হয় বাপুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে? কংগ্রেস কি তাঁর নেতৃত্ব মানবে না?" জুলি জানতে চায়।

"কংগ্রেস নেতারা যদি একবাক্যে বলতেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে একমাত্র গান্ধীজীই কথাবার্তা চালাবেন ও তাঁর যা সিদ্ধান্ত কংগ্রেসেরও সেই সিদ্ধান্ত তা হলে তিনি সরে দাঁড়াতেন না। কিন্তু নেতাদের মধ্যেই এখন একটা অধীর ভাব দেখা যাচ্ছে। তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে যে কোনো দাম দিতে প্রস্তুত! ওদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও দিল্লীকা লাড্‌ডু খাবার জন্যে সাদরে ডাকছেন। যে খাবে সেও পশতাবে, যে

খাবে না সেও পশতাবে। কংগ্রেসের ভিতরে একটা খাই খাই ভাব আর ইংরেজের ভিতরে একটা যাই যাই ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ওরা আর থাকতে চায় না। কিন্তু ওদের শর্ত কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে। ভাগ করে খেতে গেলে ঝগড়া বাধবেই। সে ঝগড়া কতদূর গড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য গম্ভীর মুখে বলে।

"না, না। তা কিছুতেই হবে না।" জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। "কাজ নেই অমন লাড্ডুতে। বিনা শর্তে দিলে খাব, নয়তো খাব না। এই হবে কংগ্রেসের জবাব।"

"বিনা শর্তে দিলেও খাওয়া মুশকিল হবে। মুসলিম লীগ এমন গণ্ডগোল বাধাবে যে গিলতে পারা যাবে না, উগরে ফেলতে হবে। পদত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে ওরা মুসলিম লীগকেই দিল্লীকা লাড্ডু দিক। ওরাই গ্রাস করুক। শিখদের সঙ্গে যখন বেধে যাবে তখন টের পাবে কেমন মজা। তখন হয়তো কংগ্রেসের দিকে মিটমাটের জন্যে হাত বাড়াবে। মিটমাট হলে পার্টিশনের ভিত্তিতে নয়, বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে।" সৌম্যর মতে।

"যদি বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে না হয় তা হলে?" জুলি প্রশ্ন করে।

"তা হলে মিটমাট হবেই না। শহীদ হবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। বাপুকেও। তিনি তৈরি।" সৌম্য ঠিক জানে।

জুলি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে, "তা হলে আমরা কেন ঘর বাঁধতে যাচ্ছি? কুটির নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিই?"

"না, বন্ধ করে দেব না। সব চেয়ে খারাপটা ধরে নেব কেন? সেটা না ঘটতেও পারে। ইংরেজদের মতো লীগপন্থী মুসলমানদেরও অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর। বিকেন্দ্রীকরণে ওদেরও তো কিছু লাভ হবে। নিতান্ত ফ্যানাটিক না হলে তাতেই তারা রাজী হবে।" সৌম্যর মনে হয়।

"নিতান্ত ফ্যানাটিক যদি হয়?" জুলি জেরা করে।

"তা হলে দুরাশা।" সৌম্য হাল ছেড়ে দেয়।

"তা বলে তোমাকে আমি অনর্থক শহীদ হতে দেব না। বাপুকেও বারণ করব। আমরা বাঁচব ও বাঁচাব।" জুলি ভেবে চিন্তে বলে।

জুলিদের গৃহপ্রবেশের আগের দিন মুস্তাফীরা একটা পার্টি দেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মানসের বন্ধু ও সেইসূত্রে সৌম্যর আলাপী সত্যভূষণ সমাদ্দার। মর্টিমারের জায়গায় নতুন জেলা জজ। মিসেস সমাদ্দারও ছিলেন।

মুস্তাফী বলেন, "এরা দুটিতে ঘরকন্না পাতছে বটে, কিন্তু কে জানে ক'দিনের জন্যে! হঠাৎ একদিন সত্যাগ্রহের ডাক আসবে, অমনি এরা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।"

সমাদ্দার তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বলেন, "সত্যাগ্রহ হবে কার বিরুদ্ধে? ইংরেজরা তো ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে চলে যাবার তালে আছে। যারা আপনি চলে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ কেনই বা দরকার হবে? এক যদি কংগ্রেসের দাবী হয় ক্ষমতার হস্তান্তর কালে তাকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী করা। তেমন দাবী ইংরেজ মানবে কেন? মানলে যে মুসলিম লীগকে শত্রু করা হবে। তাতে ইংরেজের কী লাভ? কংগ্রেস কি তার বিপদের দিন পাশে দাঁড়াবে? পুরাতন শত্রুকে উত্তরাধিকারী করে পুরাতন মিত্রকে শত্রু করা কি সঙ্গত? ওটা ইংরেজ চরিত্র নয়। ইংরেজরা তেমন কাজ করতে গেলে মুসলিম লীগ জেহাদ ঘোষণা করবে। আর সেই জেহাদের লক্ষ্য কেবল ইংরেজ নয়, কংগ্রেসও হবে। মুসলিম লীগ ধর্মের নামে মাঠে নামলে যা হবে তা আর একটা কুরুক্ষেত্র। গান্ধীজী কি এটা বোঝেন না?"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "কংগ্রেস বলবে মুসলিম লীগকে একমাত্র উত্তরাধিকারী করতে। তার জন্যে সত্যাগ্রহ করতে হবে কেন? পদত্যাগ করলেই চলবে। পদত্যাগের পর গঠনের কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেই হলো।"

"বামপন্থীরা সে নির্দেশ মানলে তো?" সমাদ্দার সন্দেহ করেন।

সৌম্য মৌন থাকে। মুস্তাফী বলেন, "বামপন্থীরা দূরে থাক, দক্ষিণ-পন্থীরাও কি মানবে? সাড়ে ছ'বছর ধরে যারা অভুক্ত রয়েছে তারা এখন খেতে বসেছে, লাটসাহেবরাও তাঁদের জামাই আদরে খাওয়াচ্ছেন। এবার তো যুদ্ধের অজুহাতে উপবাস করা যায় না, যুদ্ধ আবার কবে বাধবে তারও ঠিক ঠিকানা নেই। এখন যদি অকারণে বা তুচ্ছ কারণে উপবাস করেন তবে ভবিষ্যতে যখন সত্যি সত্যি বিশ্বযুদ্ধ বাধবে তখন করবেন কী? বামপন্থীরা যদি অবুঝ হয় তবে তারাই দেশ শাসনের দায়িত্ব নিক। মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া কেন? ক্ষমতা বলতে দেশ ভাগ করার ক্ষমতাও

তো বোঝায়। ক্ষমতার আসনে বসে যদি ওরা ওদের ইচ্ছামতো দেশভাগ করে তবে তো সারা বাংলাদেশ ওদেরি হবে। যায় আসামও। এবার ইংরেজরা সত্যি সত্যি কুইট করছে, এবার প্রত্যাশা করতে পারা যাবে না যে তারাই কংগ্রেসের শূন্য গদী আগলাবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয়বার হবে না। এবারকার ইস্যু ইংরেজদের শূন্য স্থান পূরণ করবে একমাত্র কংগ্রেস, না যুগ্মভাবে কংগ্রেস ও লীগ, না বিভক্ত ভাবে কংগ্রেস ও লীগ। ইংরেজও থাকবে না, কংগ্রেসও থাকবে না, মুসলিম লীগ যা খুশি তা করবে, আর কোথাও না করুক বাংলাদেশে তো করবেই। তাকে সংযত করবে কে? কী উপায়ে? সত্যাগ্রহ কি সেই উপায়?"

সৌম্য নিরুত্তর থাকে। জুলি বলে ওঠে, "সত্যাগ্রহ বিফল হলে গৃহযুদ্ধ।"

"ছেলেমানুষি। মিলিও সেই কথা বলে। গৃহযুদ্ধ যদি সৈনিকে সৈনিকে হয় তা হলে হয়তো আমরা বেঁচে বর্তে থাকব, কিন্তু যদি জনতায় জনতায় হয় তবে সপরিবারে পরলোক যাত্রা করতে হবে। যাদের পরলোকে যেতে আপত্তি তারা পর প্রদেশে যাত্রা করবে। যঃ পলায়তি স জীবতি।" মুস্তাফী বলেন।

সমাদ্দার আবার খেই হাতে নেন। "উপরের শ্রেণীর মুসলমানরা প্রায় দু'শো বছর ধরে অভুক্ত। একবার রক্তের স্বাদ পেলে তারা পঞ্চাশ বছরের আগে গদী থেকে নামবেন না। ছলে বলে কৌশলে গদী আঁকড়ে থাকবেন। তাঁদের কাছে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। সত্যাগ্রহ বা গৃহযুদ্ধ কোনোটাই তাঁদের নড়াতে পারবে না। নিচের শ্রেণীর মুসলমানরা যতদিন না সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক চেতনায় উপনীত হয় ততদিন ওঁদের টলাবে কে? বৃথা অপেক্ষা। আপাতত আমাদের কর্তব্য ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া হলে ইংরেজরাই মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করে দেবে। কতকটা নিজেদের স্বার্থে, কতকটা ভারতের স্বার্থে। ভারতকে দুর্বল রেখে গেলে সোভিয়েট রাশিয়া এসে ঘাড় মটকাবে। ভারতরক্ষার দায়িত্ব ওরা বিভক্ত করতে চাইবে না। সেটা হবে যৌথ দায়িত্ব। তা হলে বিদেশ নীতিকেও যৌথ রাখতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও। শুনতে পাচ্ছি ক্যাবিনেট মিশনও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

সৌম্য এইবার মুখ খোলে। "গান্ধীজীও সেই মর্মে চিন্তা করছেন।"

প্রতিমা সমাদ্দার জুলিকে একান্তে বলেন, "আপনাদের কুটির দেখতে

যাব একদিন আমরা। আপনারাও আমাদের কুটির দেখতে আসবেন একদিন।"

জুলি খুশি হয়ে বলে, "নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের কুটিরটা বাস্তবিকই কুটির। আপনাদের কুটিরটা কাল্পনিক।"

প্রতিমা সমাদ্দার হেসে বলেন, "তা হোক। আসবেন কিন্তু।"

॥ আঠারো ॥

স্বপনদার বাড়ীর কাছাকাছি বাস করেন যশোবিকাশ রায়। ব্রাহ্মণ তথা জমিদার তথা ব্যারিস্টার। এর জন্যে তাঁর গর্বের কারণ ছিল। কিন্তু বিধাতা তাঁর মুখরক্ষা করেননি। পিতামহের অমতে বিলেত যাত্রার সময় অর্থাভাবে পিরালী বংশে বিবাহ করেন। ফলে পিরালী হন। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যে পিরালী হয় তার ভাই বোন ছেলেমেয়েরাও পিরালী হয়। তাদের বিয়ের সময় মুশকিলে পড়তে হয়। তাঁর একমাত্র কন্যা যশোধরাকে তিনি লোরেটোতে পড়িয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনাও শিখিয়েছিলেন। দেখতেও সুন্দরী। তন্বী। দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু পিরালীদের মধ্যে সুপাত্র পাওয়া দুষ্কর। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাত্ররা গুরুজনের ভয়ে পেছিয়ে যায়। যদি বা কেউ রাজী হয় সে মোটা পণ চায়, সেটা খরচ হবে তার বোনের বিয়েতে।

অসবর্ণ বিবাহ যদিও তাঁর অহঙ্কারে বাধে তবু তিনি মেয়ের মুখ চেয়ে তাতেও রাজী হন। হাতের কাছে পান স্বপনদাকে। তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। রায় সাহেবেরই কাছে শিক্ষানবীশ। যাকে বলে ডেভিল। নিজের ডেভিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে তো প্রায়ই হয়। প্রস্তাবটা করেন মেয়ের মা। কিন্তু বিলিতী কেতা অনুসারে করতে হতো স্বপনদাকেই। বলতে হতো, "টুকটুক, তুমি কি আমার হবে?" স্বপনদা প্রেমের শিক্ষানবীশী করতে আসেননি, সে বিদ্যা তিনি ছাত্রজীবনেই আয়ত্ত করেছেন। প্রয়োগও করেছেন। ব্যর্থও হয়েছেন। বলেন, "আমাকে মাফ করবেন। আমার ভাঙা হৃদয় জোড়া দেবার ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে যে ভেঙে দিয়েছে। তার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি ও আরো কয়েক বছর করব।"

স্বপনদা জানতেন না যে টুকটুক দারুণ আঘাত পাবে। বিভিন্ন পাত্রের দ্বারা একটা না একটা অজুহাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে এক কাণ্ড করে বসে। বিলেত পালিয়ে গিয়ে এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করে। বাপ মা মাথায় হাত দিয়ে বসেন। সমাজে মুখ দেখাবেন কী করে? যতদিন পারেন চাপা দেন। কিন্তু পরে জানাজানি হয়ে যায়। বন্ধুরা রসিকতা করে বলেন, মুসলমানদের উপর পিরালীদের একটা পতঙ্গের মতো আকর্ষণ আছে। কন্যার পিতা কৈফিয়ৎ দেন, "পাত্রটি তো ভালো। সদ্বংশীয়। ওদের বংশের কে যেন নবাব ছিলেন। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্শ্ববর্তী সোয়াটের আখন্দ।" রেজা আলী আখন্দের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন স্বপনদা ইংরেজীতে ছড়া কাটেন—

"Who, or why, or which, or what,
Is the Akond of Swat?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে যান। তাঁকে জিজ্ঞাসু দেখে স্বপনদা বলেন, "ছড়াটা আমার নয়, এডওয়ার্ড লীয়ারের। ইংরেজরা জানত না আকন্দ বলতে কী বোঝায়, কাকে বোঝায়, কেন বোঝায়। আমরাও কি বুঝি? আমরা তো ভাবি আকন্দ ফুল। একজন আকন্দকে চাক্ষুষ করে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম। নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

বরটি উদার হলে কী হবে? তাঁর গুরুজন ঘোর রক্ষণশীল। তাঁর বেগম পর্দা মানেন না, পিয়ানো বাজান, ক্যারল গান করেন, ছদ্মনামে সিনেমায় অভিনয় করেন। আকন্দ পরিবারের মাথা হেঁট। ব্যারিস্টারি পসারেও টান পড়ে। স্বামীস্ত্রীতে মনোমালিন্য। তখন টুকটুক আবার এক কাণ্ড বাধায়। যুদ্ধের সময় যেসব মার্কিন মিলিটারি অফিসার এসেছিলেন তাঁদের একজনের সঙ্গে ইলোপ করে। স্বামী তালাক দেন।

কিছুদিন পরে খবর আসে টুকটুক আবার বিয়ে করেছে। বরের নাম জন শারম্যান উডরো। পূর্বপুরুষ সিভিল ওয়ারে নাম করেছিলেন। টুকটুকের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল হলিউডে গিয়ে চিত্রতারকা হওয়া। শ্বশুরবাড়ীর সেটা পছন্দ নয়। এ বাড়ীর মেয়েরা কেউ অভিনেত্রী হয় না। হলিউডের প্রযোজকরাও তাকে আমল দেন না। আজে বাজে ভূমিকা নিতে বলেন। সে রাজী হয় না। তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ততদিন জনেরও ক্লান্তি এসেছে। টুকটুক ডিভোর্স চায় ও পায়।

স্বপনদা একদিন আইনের পরামর্শ নিতে গিয়ে দেখেন ব্যারিস্টার সাহেবের মুখখানা কালো। কেন জানতে চাওয়ার আগে তিনি কাতর স্বরে বলেন, "স্বপন, টুকটুক আমার এক গালে কালি মাখিয়েছিল, এখন আরেক গালে চূণ মাখিয়েছে। আমি মুখ দেখাব কার কাছে? মেয়ে দ্বিতীয়বার ডিভোর্স পেয়েছে।"

স্বপনদা সান্ত্বনার স্বরে বলে, "অসুখী হওয়ার চেয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া শ্রেয়।"

মেয়ের মা জ্বলে ওঠেন, "এর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে ও সুখী হতো। এসব কেলেঙ্কারি করত না।"

"আমি কেমন করে জানব? আমি কি সর্বজ্ঞ?" স্বপনদা জবাবদিহি করেন।

"তোমার জানা উচিত ছিল যে তোমার নভেল পড়ে তরুণী মেয়েরা তোমাকেই তাদের রোমান্টিক নায়ক করতে চাইবে। আরো ক'জনের মাথা খেয়েছ কে জানে? ওরাও হয়তো এমনি অসুখী।"

"গ্যেটের 'তরুণ ভেরটারের দুঃখ' পড়ে সেকালের তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। তার জন্যে কি গ্যেটে দায়ী? এ কী সর্বনেশে কথা! ক'জন প্রেমিকাকে আমি বিয়ে করতে পারতুম?" স্বপনদা কপট ভয়ে ভীত।

যশোবিকাশ বলেন, "আর্ট যেমন জীবনের অনুসরণ করে জীবনও তেমনি আর্টের অনুসরণ করে। কার উক্তি? ওস্কার ওয়াইল্‌ডের না?"

"আর কার? যা চটকদার উক্তি।" স্বপনদা বলেন।

"আমি ভাবছি ও মেয়ে ইবসেনের সৃষ্টি না চেখভের? তোমার নয়, তা এতদিনে বোঝা গেছে। তুমি জানো কেমন করে সব দিক সামলাতে হয়। কিন্তু বলতে পারো ওর ভবিষ্যৎ কী? ও চায় স্বাধীন জীবিকা। সিনেমা লাইনই ওর পছন্দ। এদেশে তার কী রকম প্রস্‌পেক্‌ট?" জানতে চান যশোবিকাশ।

"উচ্চমান বিসর্জন দিলে অসীম পরিসর। কিন্তু টুকটুক আর টুকটুক থাকবে না। দেবিকারানী আর দেবিকারানী থাকতেন না। তিনি সময়মতো সরে যান। অবশ্য মনের মতো স্বামী পেয়ে। অতি উচ্চমনা পুরুষ। টুকটুকের ভাগ্যে কী আছে কে বলতে পারে! আর একজন শ্বেতোস্লাভ রেরিখ্‌ই বা কোথায়?" স্বপনদা সহানুভবী।

"তেমন একটি বর খোঁজা বাপ মায়ের সাধ্য নয়। আমরাই বা আর কদ্দিন? আমাদের পরে মেয়েটার ভার নেবে কে? টাকার অভাব হবে না। কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট রদ হয়ে যেতে পারে। ওটা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। ওরা চলে গেলে ব্যারিস্টারিও তো উঠে যেতে পারে। ব্যারিস্টাররাও ইংরেজদেরই সৃষ্টি। আমাদের রুজি রোজগারের সূত্র থাকবে না। তোমাকে ধরতে হবে বৈশ্যবৃত্তি। আমাকে যজমান বৃত্তি।" যশোবিকাশ হাহুতাশ করেন।

স্বপনদা হেসে বলেন, "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, চতুরানন।"

"হাসির কথা নয়, স্বপন। ইংরেজী এসেছিল ফার্সীর জায়গায়। এর পর হিন্দী আসবে ইংরেজীর জায়গায়। পারবে তুমি হিন্দীতে আদালতের কাজ চালাতে? আমি তো অক্ষম। এ বয়সে হামাগুড়ি দিতে নারাজ!" যশোবিকাশ হাসেন না।

"হিন্দী কেন বলছেন? উর্দুই তো হবে পাকিস্তানের আদালতের ভাষা। আর বাংলাদেশ তো পড়বে পাকিস্তানে।" স্বপনদা মনে করিয়ে দেন।

"ভাবনার কথা। ইংরেজরা আমাদের উপর শোধ তুলে যাবে। ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন পর্যন্ত সকলের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্যে প্রতিশোধ। তুমি তো জানো আমরা মডারেটরা সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করিনি। আমরা ছিলুম দূরদর্শী। আর একস্ট্রীমিস্টরা অদূরদর্শী। এখন ডে অভ্ রেকনিং আসন্ন। ইংরেজরা যদি গোটা বাংলাদেশটাই মুসলিম লীগকে দিয়ে যায় কংগ্রেস বা মহাসভা সেটা থামাবে কী করে? এবারকার নির্বাচনে মুসলিম লীগেরই একাধিপত্য। সুহরাবর্দী একজন বর্ণহিন্দুকেও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেননি। আর তাঁরই বা কতটুকু স্বাধীনতা? দাবার ঘুঁটি চালাচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেসকে জব্দ করাই তাঁর পলিসি। কংগ্রেস হয়তো ইংরেজের সঙ্গে আপস করবে, কিন্তু লীগ কখনো কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে না। ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসে বাধা দেবে। কৈকেয়ীর মতো দশরথকে বলবে, তুমি আমাকে বর দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। আমি চাই পাকিস্তান। যার সামিল হবে সারা বাংলা, সারা আসাম, সারা পাঞ্জাব। আমাকে আমার প্রার্থিত বর না দিয়ে তুমি কেমন করে বনবাসে যাও, দেখব। তোমার বিপদের দিন কৌশল্যা কি তোমার সেবা করেছিল? তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল? বুঝলে, স্বপন? ইংরেজরা মুসলিম লীগকে তার পাওনা না দিয়ে ছাড়া পাবে না। না দিয়ে

গেলে লীগপন্থীরা বিদ্রোহ করবে। গুলি করে হাজার হাজার মুসলমান মারতে হবে। সম্ভব নয়।" যশোবিকাশ মাথা নাড়েন।

"ক্যাবিনেট মিশনের স্টেটমেণ্ট পড়েছেন? ওঁরা সাফ বলে দিয়েছেন যে ওঁরা পাকিস্তান সমর্থন করেন না। মুসলিম লীগ যদি নাছোড়বান্দা হয় তবে অর্ধেক বঙ্গ, অর্ধেক পাঞ্জাব ও আসামের সিলেট জেলা পাবে। তাছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশ। যদি গোটা বাংলা, গোটা পাঞ্জাব ও গোটা আসামের জন্যে জেদ ধরে তবে সোভরেনটি পাবে না। সৈন্যসামন্ত, পররাষ্ট্রবিভাগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। মুসলিম লীগকে খুশি করার জন্যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ক্ষমতা তিনটি গ্রুপের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটা গ্রুপ, পশ্চিম প্রান্তের মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে আর একটা গ্রুপ, বাংলাদেশ ও আসামকে নিয়ে আরো একটা গ্রুপ। শেষের গ্রুপটাতে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা বাহান্নর নিচে। অমুসলমানদের সংখ্যা শতকরা আটচল্লিশের উপরে। প্রায় সমান সমান। গ্রুপদের নিজস্ব আইনসভা ও সরকার থাকবে। কোয়ালিশনের সম্ভাবনাই বেশী। এই হলো ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা। সেটা কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সেটা একটা এ্যাওয়ার্ড নয়।" স্বপনদা সংক্ষেপে প্রস্তাবের মর্ম শোনান।

"কেন্দ্র ও প্রদেশের মাঝখানে আরো একটা স্তর? গ্রুপ? দুনিয়ার আর কোন শাসনতন্ত্রে কেউ দেখেছে? ওটাকে চালু করে দেবার জন্যে ইংরেজদের আরো কিছুকাল থেকে যেতে হবে। নয়তো দু'দিনেই ভেঙে পড়বে। কেন্দ্রকে অমন করে কমজোরী করা বিজ্ঞতা নয়। মোগলরাও তা করেনি, ইংরেজরা নিজেরাও তা করেনি। কংগ্রেস তাতে রাজী হবে? লীগ যদি রাজী হয় তবে তা সেই মই বেয়ে গাছে ওঠার জন্যে। গ্রুপ থেকেই পৌছবে স্বাধীন পাকিস্তানে। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র পাঞ্জাব ও সমগ্র আসাম সমেত। ভাঙন ধরাবে কেন্দ্রীয় সৈন্যদলে। কংগ্রেস লীগ আপস ছাড়া এ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। সে আপস ইংরেজের হাতে নেই। আছে দুই দলের দলপতিদের হাতে। আমি তোমার মতো আশাবাদী নই, স্বপন।" যশোবিকাশ বলেন।

"আমিও কি আশাবাদী? লক্ষণ যা দেখছি তা আপসের নয়, গৃহযুদ্ধের। দু'পক্ষই তৈরি হচ্ছে। বিনা যুদ্ধে কেউ কাউকে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে না। আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাইনে। আমি দূরে সরে থাকতে চাই। কিন্তু

যাবই বা কোথায়? ইউরোপে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু দীপিকা কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তার কুকুরই তার সর্বস্ব।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

টুকটুকের মা মেখলা দেবী হেসে ওঠেন। "কুকুরই তার সর্বস্ব? স্বামী নয়? এই হচ্ছে তোমার শাস্তি। টুকটুককে বিয়ে করলে দেখতে তুমিই হতে তার ঠাকুর। সে হতো ঠাকুরসর্বস্ব।"

দীপিকা যদি শোনে তবে রক্ষে থাকবে না। স্বপনদা কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, "তা নয়। দীপিকা কলকাতায় থাকতে চায় সম্পত্তি পাহারা দিতে। ইংরেজরা যদি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভারত থেকে অপসরণ করে তবে তার পরে যেটা হবে সেটা জোর যার মুলুক তার। মালিক পালিয়ে গেলে সম্পত্তি লোপাট হয়। এটাই তো নিয়ম। আদালত কোথায় যে নালিশ করে ফেরৎ পাবে। ওসব অচল হবে। লর্ড ওয়েভেল ইনটারিম গভর্নমেণ্টের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি সফল হন তবে কংগ্রেস আর লীগ একসঙ্গে কাজ করতে করতে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে শিখবে। একটা মোডাস ভিভেণ্ডি গড়ে উঠবে। হিন্দু মুসলমান যদি এক না হয় ভারত এক হবে কোন্ মন্ত্রবলে? ইংরেজরা ক্ষমতা হাতে দিয়ে গেছে বলে? আমি চাই হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি। তুমি আমাকে কিছু দাও, আমি তোমাকে কিছু দিই। গিভ অ্যাণ্ড টেক। কিন্তু ওরা তো কেউ কারো সঙ্গে কথাই বলছে না। প্রত্যেকেরই সম্পর্ক ইংরেজের সঙ্গে। অপর পক্ষের সঙ্গে নয়। কৌশল্যাতে কৈকেয়ীতে মুখ দেখাদেখি নেই।"

"ত্মাখ, স্বপন, কংগ্রেস আর লীগ যদি মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে পরস্পরকে অপোজ করে, যদি প্রাদেশিক আইনসভায় পরস্পরের বিরোধী পক্ষ হয়, যদি কেন্দ্রীয় আইনসভায় পরস্পরের বিরুদ্ধতা করে, তবে বড়লাটের শাসন পরিষদে তারা মিলে মিশে শাসনকার্য চালাবে কী করে? গিভ অ্যাণ্ড টেক সর্ব ক্ষেত্রেই করতে হবে। কেবলমাত্র শাসন পরিষদে নয়। গান্ধীজী শুনেছি ওয়েভেল সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস বা লীগ এদের এক পক্ষের উপর গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দিতে। লীগ যদি গভর্নমেণ্ট চালায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু দুই দলের যেমন সম্পর্ক তাতে ওদের মেলাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে।" যশোবিকাশ বলেন।

ব্র্যাণ্ডি এল। স্বপনদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যশোবিকাশ বলেন, "আমার বয়স হলো সত্তর। কোর্টে যাওয়া আসা করা আর চলবে না,

গাউটের মতো হয়েছে। যতদিন পারি চেম্বার প্র্যাকটিস চালিয়ে যাব, যদি ইংরেজী থাকে। এখন আমার প্রধান ভাবনা টুকটুকের কী হবে। তোমার কি মনে হয় ও আবার বিয়ে করবে?"

"কেমন করে জানব? স্ত্রিয়াং চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

যশোবিকাশ হাসেন, কিন্তু মেখলা দেবী চটে যান। "নারীজাতিকে অত বড়ো অপমান আর কেউ করেনি। পচা রসিকতা।"

যশোবিকাশ তাঁর স্ত্রীকে প্রবোধ দেন। "যাঁরা সীতা, সাবিত্রী, উমা হৈমবতীর চরিত্র এঁকেছেন তাঁরা নারীকে কত বড়ো আসন দিয়েছেন। সম্মানও তো আর কেউ তেমন করেনি।"

"টুকটুক আসছে কবে।" স্বপনদা জিজ্ঞাসা করেন।

"যে কোনো দিন। আমাদের কাছেই থাকবে। বরাবর থাকলে তা আরো ভালো হয়। এ বয়সে আর কে আমাদের দেখাশুনা করবে? ভাস্কর? ভাস্কর তো বৌ নিয়ে মিলিটারি ক্যানটুনমেণ্টে। শুনছি ব্রিগেডিয়র হবে। ইংরেজরা এক এক করে উচ্চ পদ ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের এখনকার পলিসি হলো আর্মিটাকে ওদের সাগরেদ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া। গোরা ইংরেজের জায়গায় কালা ইংরেজ। যাতে ব্রিটিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা হয়। ভারতের স্বাধীনতায় ওদের আপত্তি নেই। যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটাকে মেনে নেওয়াই তো বিজ্ঞতা। এবারকার যুদ্ধে এন্তার ছেলেকে কমিশন দেওয়া হয়েছে। তারা বেকার হলে তো শত্রুতা করবে। আর তাদের বহাল রাখতে গেলে নিজেদেরই হটতে হয়। সেটার জন্যে ওরা মনে মনে প্রস্তুত। তবে ওদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সিভিলিয়ানদেরও ওই একই বক্তব্য। কিন্তু দেবেটা কে? হোম গভর্নমেণ্ট না ভারত গভর্নমেণ্ট? হোম গভর্নমেণ্ট দীর্ঘকাল ধরে পেনসন ও ক্ষতিপূরণের দায় বইতে রাজী হবে না। বইতে হবে ভারত সরকারকেই। কোন ভারত সরকারকে? যারা বিদায় নিচ্ছে তাদের ভারত সরকার নয়। যারা ক্ষমতা বুঝে নিতে চায় তাদেরই সরকার। ক্ষমতার হস্তান্তর মানেই দায়িত্বের হস্তান্তর। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করার জন্যে বড়লাট যে ব্যাকুল হয়েছেন তার কারণ এদেরই নিতে হবে পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত। রাজী হলে মিটমাট, নারাজি হলে বিচ্ছেদ। কংগ্রেস বা লীগ কেউ ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ চায় না। শত্রুতার অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে। মিত্রতার অধ্যায় আরম্ভ

হয়েছে। আমরা মডারেটরা এইটেই কল্পনা করেছিলুম। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা, ডব্লিউ সি বনার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, লর্ড সিন্‌হা কেউ তাঁবেদার ছিলেন না। তখনকার দিনে মহম্মদ আলী জিন্নাও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। তিনিও সমান স্বাধীনচেতা। পরিবর্তন তো মানুষ মাত্রেরই হয়। তাঁরও হয়েছে। গোখলের শিষ্য গান্ধীরও। দুঃখ এইখানে যে এঁদের মাঝখানে এখন দুস্তর ব্যবধান। গান্ধীজী যেমন বড়লাটের প্রতিপক্ষ জিন্না সাহেব তেমনি গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ। বিরোধীপক্ষই তো অলটারনেটিভ গভর্নমেণ্ট গঠন করে। গান্ধীজী একদিন তা করবেন, কিন্তু জিন্না সাহেবের কী আশা। যদি না দেশ দু'ভাগ হয়। বাধা দিলে সিভিল ওয়ার। ফলাফল অনিশ্চিত। ইংরেজ তার আগেই কুইট করবে।" যশোবিকাশ অনুমান করেন।

স্বপনদা জানতে চায়, "জিন্নাকে কি আপনি চিনতেন ?"

"চিনব না ? তখনকার দিনে কংগ্রেস ছিল আমাদেরি হাতে গড়া। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, এ্যাটর্নি ও উকীলরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করতেন কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হবে, সভাপতি হবেন কে, পলিসি কী হবে। 'আমরা বিলেতফের্তা ক'টাই দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই।' স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল থাকতেন আমাদের এই পাড়ায়। কংগ্রেসের কাজ দেখাশুনা করতেন। গান্ধীজীর আত্মচরিতে যে ঘোষালবাবুর নাম আছে তিনি আর কেউ নন, জানকীনাথ। হ্যাঁ, তিনিও ব্যারিস্টার। সরলা দেবী তাঁরই কন্যা। কংগ্রেসের অধিবেশনে গান বাজনার ভার ছিল তাঁর উপরে। রবীন্দ্রনাথও গান গেয়ে শুনিয়েছেন। কংগ্রেস মুসলমানদেরও সভাপতি করত। মেম্বর তো করতই। জিন্না ছিলেন আমাদের তুরুপের তাস। ইংরেজদের বলতুম, এই দ্যাখ জিন্না আছেন আমাদের সঙ্গে। ইংরেজ মহলে তিনি অপ্রিয় ছিলেন। প্রিয় মুসলমানরা ঢাকায় শিক্ষা সম্মেলন করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে একটা চমক দেন। মুসলিম লীগ বলে একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন। খবরটা আসে রয়টারের মারফৎ লণ্ডন থেকে। ঢাকা থেকে সরাসরি নয়। তা হলে বোঝ কার কারসাজি। ওটা যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সেকেণ্ড ফ্রণ্ট এ বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ওঁদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন যে মুসলমানদের দিতে হবে সেপারেট ইলেকটোরেট। আমরা যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন দাবী করেছিলুম

তার পরিণতি হয় নির্বাচনের সময় হিন্দু মুসলমানের পৃথক ভোট। নির্বাচন জিতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যেতে হলে হিন্দু প্রার্থী মুসলিম ভোটারের দ্বারস্থ হবেন না, মুসলিম প্রার্থী হিন্দু প্রার্থীর দ্বারস্থ হবেন না। যে যার নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে নির্বাচিত হবেন। জিন্নাকে বাধ্য হয়ে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে প্রার্থী হতে হয়। মুসলিম লীগের মেম্বর হতে হয়। তা হলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন না। তিনি দুই নৌকায় পা রেখেছেন কেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থে আমি কংগ্রেসে আছি। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে মুসলিম লীগেও আছি? তখনকার দিনে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। ফলে জিন্না ছিলেন বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝখানে লখনউতে যে কংগ্রেস লীগ প্যাকৃট স্বাক্ষরিত হয় সেটা ছিল টিলক ও জিন্নার যৌথ উদ্যোগে। লখনউতে আমিও উপস্থিত ছিলুম। লীগ সদস্যরা কংগ্রেসের অধিবেশনে আসেন, আমরাও যাই লীগ অধিবেশনে। টিলক বলেন, 'হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজের ত্রিকোণীয় সংগ্রাম চলতে দেওয়া উচিত নয়। সংগ্রাম হবে এখন থেকে দ্বিপাক্ষিক। একপক্ষে হিন্দু মুসলমান। অপর পক্ষে ইংরেজ।', সেটা কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মনের কথা। সে সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। পরে যখন সেটা হয় কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ তখন জিন্না বলেন, 'তার আগে আরো একটা কংগ্রেস লীগ প্যাকৃট চাই।' টিলক জীবিত থাকলে সেটাই বোধ হয় পলিসি হতো। কিন্তু ইতিমধ্যে গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একবছরের মধ্যে স্বরাজ। উপরন্তু খেলাফৎ সমস্যার সুমীমাংসা। তা ছাড়া পাঞ্জাবের অন্যায়ের সুবিচার। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছিল অহিংস অসহযোগ। গণ সত্যাগ্রহ। তার জন্যে নির্বাচন বয়কট। আদালত বয়কট। আমি সেই সময় সরে পড়ি। জিন্না সাহেবও। কংগ্রেস লীগ প্যাকৃট তো পার্লামেণ্টরি রাজনীতির অঙ্গ। গান্ধীজী পার্লামেণ্টারি রাজনীতি বর্জন করেন। পরে সি আর দাশ ও মোতিলাল নেহরুর খাতিরে স্বরাজ দলের সঙ্গে আপস করেন, কিন্তু জিন্নার সঙ্গে নয়। সেই ইস্তক গান্ধী জিন্নার মতভেদ ও পথভেদ বেড়েই চলেছে। জিন্না দাবী করছেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস মুসলিমরা লীগ মুসলিমদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারেন না, তাঁদের বিসর্জন না দিলে কোনো চুক্তিই সম্ভব নয়, কোনো চুক্তি সম্ভব না হলে ক্ষমতার

হস্তান্তর একই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তাতে পারে না, তার জন্যে চাই দুটো কেন্দ্রীয় সরকার, একটা হিন্দু নেশনের হোমল্যাণ্ডের ও আরেকটা মুসলিম নেশনের হোমল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। একটিমাত্র কেন্দ্রে কোয়ালিশন যদি একান্তই হয় তবে দুই পক্ষের প্যারিটি তার জন্যে অত্যাবশ্যক। কংগ্রেসকে সেটা মেনে নিতে হবে। নইলে লীগের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। সে সংঘর্ষের পথ ধরবে। সেই জিন্না আর এই জিন্না! চিনতেই পারা যায় না। মুখের চেহারা একই রকম আছে, কিন্তু মনের চেহারা বেবাক বদলে গেছে। টিলক মহারাজ যেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেইটেই আবার আমাদের সামনে—তিনকোণা সংগ্রাম। কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় অপসরণ করে তা হলে আর তিনকোণা নয়, দ্বিপাক্ষিক।" যশোবিকাশ তন্ময় হয়ে বলেন ও স্বপনদা একাগ্র চিত্তে শোনেন।

এর পরে আর জমে না। যশোবিকাশের হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। মেখলা দেবীরও। টুকটুকের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাই প্রথম কথা। ভারতের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটা দ্বিতীয়।

স্বপনদা সংবিধান আইনের পরামর্শ চেয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চান না। তিনিও কন্যার জন্যে চিন্তিত। সেদিন এই শেষ।

ওদিকে দীপিকাদি ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁর কাছে বড়ো কথা কলকাতার ভবিষ্যৎ। মুসলিম লীগ যদি স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান চায় তবে তাকে কেবল হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির নয়, পাঞ্জাব, বঙ্গ ও আসামের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিরও মায়া কাটাতে হবে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তার ভাগে পড়বে না। তবে সে যদি নিতান্তই সেসব অঞ্চল হাতছাড়া করতে না চায় তা হলে তাকে সার্বভৌমত্বের মায়া কাটাতে হবে। সার্বভৌমতার প্রতীক ডিফেন্স, ফরেন এ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেগুলি তুলে দিতে হবে এক যৌথ গভর্নমেণ্ট বা অথরিটির হাতে। সেটাও একপ্রকার কেন্দ্রীয় সরকার। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুই উপরাষ্ট্রই তার অধীনস্থ। যেমন হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর। অবিভক্ত ভারতই অন্য ভাবে বহাল থাকবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব আর আসামও থাকবে অবিভক্ত।

"লেবার যে আমাদের কত বড়ো শুভানুধ্যায়ী এই পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। মুসলিম লীগ কিছুতেই অত ছোট পাকিস্তান ও অত বড়ো

হিন্দুস্থানে রাজী হবে না। তা হলে ভারত ভাগের দাবী ত্যাগ করতে হয়। আর কলকাতার মায়া কাটানোও কি মুখের কথা? সুহরাবর্দী কি পারবেন বাংলা ভাগে রাজী হতে? আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে পাকিস্তান কলকাতা পাবে না। লড়াই করা বৃথা। কলকাতা আমাদেরই থাকবে। আমরাও কলকাতায় থাকব।" দীপিকাদি বলেন।

"হ্যাঁ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমাকে আর বঙ্গভঙ্গ দর্শন করতে হবে না। এক জীবনে একবারই যথেষ্ট। ইংরেজদের উপর তোমার অবিশ্বাস জন্মেছিল। সেটা সেই কমিউনাল এ্যাওয়ার্ডের পর থেকে। এখন তুমি বুঝতে পারছ ওরা হিন্দুর উপর জাতক্রোধ নয়। কী ভোগানটাই ওদের ভোগানো হয়েছে ১৯৪২ সালের কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে! একদিকে জাপান, আরেক দিকে কংগ্রেস। কিন্তু তার জন্যে ওরা প্রতিশোধ নিতে চায় না। পেথিক-লরেন্স আর ক্রিপস গান্ধী ও নেহরুর পুরাতন বন্ধু।" স্বপনদা বলেন।

"পেথিক-লরেন্সের মতো ফেমিনিস্ট কি আর আছে? স্ত্রীর পদবী বহন করে চলেছেন। ওর নিজের পদবী তো পেথিক। লরেন্স পদবীটা ওঁর স্ত্রীর। হ্যাঁ, একেই বলে প্রেমের জন্যে ত্যাগস্বীকার। স্ত্রীরাই তো স্বামীর পদবী বহন করে বেড়ায়, স্বামীরা স্ত্রীর পদবী বহন করা দূরে থাক বিয়ের পরে রাখতেও দেয় না। যেমন তুমি।" দীপিকাদি খোঁটা দেন।

স্বপনদা জানতেন যে দীপিকাদি কট্টর ফেমিনিস্ট। বাবলী যেমন কট্টর কমিউনিস্ট। এ নিয়ে আগেও তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। ইংরেজ মেয়েরা আজকাল স্বামীর পদবী ধারণ না করে পিতার পদবীই রক্ষা করে। দীপিকাদি ইচ্ছা করলে দীপিকা ঘোষ লিখতে পারেন। কিন্তু স্বপনদাকে যদি বলেন গুপ্ত-ঘোষ লিখতে তা হলে সেটা হবে সুকুমার রায়ের হাঁসজারু বা হাতিমির মতো কিম্ভুত। স্বামীর মতো স্ত্রীও হাস্যাস্পদ হবেন। আসলে ফেমিনিজম তত্ত্বটাই স্বপনদার পছন্দ নয়। এই যে মেয়েরা চাকরির জন্যে আজকাল ক্ষেপেছে এটা বিবাহের সঙ্গে বেখাপ। টুকটুক তার নবতম নিদর্শন। স্বামী আর সন্তান নিয়েই মেয়েদের জীবন।

আজ এ নিয়ে আর তর্ক না করে স্বপনদা বলেন, "পেথিক-লরেন্স ব্যারিস্টার, ক্রিপস ব্যারিস্টার, গান্ধী ব্যারিস্টার, নেহরু ব্যারিস্টার, প্যাটেল ব্যারিস্টার, জিন্না ব্যারিস্টার, লিয়াকৎ আলী ব্যারিস্টার। ওদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীও ব্যারিস্টার। এই ক'জন ব্যারিস্টারই ভারতের ভাগ্য

নিয়ন্ত্রণ করছেন। ইতিহাসের নির্বন্ধ। অখণ্ড ভারত বা দ্বিখণ্ড ভারত যেটাই হোক না কেন সিদ্ধান্তটা ব্যারিস্টারদের হাতে। নেহরু ও পাটেলকে বাদ দিয়ে হিন্দুস্থান সরকার হয় না। জিন্না আর লিয়াকৎকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান সরকার হয় না। তোমাকে মানতেই হবে যে ব্যারিস্টোক্রাসীর যুগ যায়নি ও যাবে না। ডেমোক্রাসী, বুরোক্রাসী আর ব্যারিস্টোক্রাসী এই তিনটি যেন এক বৃন্তে তিনটি ফুল। যেমন বিলেতে।"

দীপিকাদি রসিকতা করে বলেন, "এ যে দেখছি অষ্টবজ্র সম্মিলন। এর ফল হবে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী বসবে কি-না সন্দেহ। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করতে পারা যাবে কি-না সন্দেহ। ক্যাবিনেট মিশন সফল হবে কি-না সন্দেহ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। ঘোরতর নৈরাজ্যের মধ্যে আইন আদালত টিকে থাকবে কি-না সন্দেহ। ঘোলা জলে কমিউনিস্টরা মাছ ধরবে কি-না সন্দেহ। সারা জীবনের তপস্যা ব্যর্থ হলে গান্ধীজী বেঁচে থাকবেন কি-না সন্দেহ। স্টালিন তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবেন কি-না সন্দেহ। স্টালিন এলে ট্রুম্যানও আসবেন নিঃসন্দেহ। ক্যাবিনেট মিশন প্রত্যাবর্তন করছেন। কিন্তু শিখদের তুষ্ট করবার জন্যে কী উপায় করছেন? ওরা কি সহ্য করবে?"

॥ উনিশ ॥

দীপিকাদির মনে শান্তি, স্বপনদার অশান্তি। ক্যাবিনেট মিশন তৃতীয় কোনো বিকল্প রাখেননি। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে পারবে না। হিন্দুরা চাইবে তাকে হিন্দুস্থানের সামিল করতে, মুসলমানরা চাইবে পাকিস্তানের সামিল করতে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান যদি একই কেন্দ্র মেনে নেয় তবে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকবে, কিন্তু জিন্না যদি পাকিস্তানের জন্যেও প্যারিটি দাবী করেন তবে কংগ্রেস কিছুতেই রাজী হবে না। প্যারিটি মানে ব্যালান্স অভ পাওয়ার। ব্যালান্স অভ পাওয়ার কেউ কাউকে ছেড়ে দেয় না বলেই জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত। বার্লিন দ্বিধাবিভক্ত। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশও দ্বিধা হবে। সীতার মতো স্বপনদাও পাতালপ্রবেশ করবেন। আর একটি

লাইনও লিখবেন না। কার জন্যে লিখবেন? বাঙালীর জন্যেই লেখা, বাঙালীর ভাষাতেই লেখা। বাঙালী কোথায়? তার ভাষা কোথায়? এ কি সেই বাঙালী? এ কি সেই ভাষা? কলকাতা বার্লিনের মতো ভাগ হবে না। এই যা সান্ত্বনা। পূর্ব বঙ্গ? সে কি থেকে যাবে প্রহরীবেষ্টিত সীমান্তের ওপারে?

পূর্ব বঙ্গের জন্যে দীপিকাদির মাথাব্যথা ছিল না। ওখানে যত মুসলমান আছে আরব উপদ্বীপে, তুরস্কে বা ইরানেও তত নেই। ওরা যদি মনে করে ওরাও সেইরকম একটি নেশন তবে ওরাও একটি নেশন। নেশন শব্দটার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নাই। তা যদি থাকত ইহুদীরা বলত না যে ওরাও একটি নেশন। কখনো দেশ থেকে নেশন হয়, কখনো নেশন থেকে দেশ হয়। ইহুদীরা চলেছে দেশের সন্ধানে প্যালেস্টাইনে। ওদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বিরলবসতি কোনো দ্বীপে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে। ওরা কর্ণপাত করেনি। প্যালেস্টাইন ওদের পূর্বপুরুষের দেশ। সেইখানেই ওরা হোমল্যাণ্ড পুনরুদ্ধার করবে। ভারতের মুসলমানরাও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। তারা পূর্বপুরুষের দেশে ফিরে যেতে পারছে না, কারণ সেসব দেশে তো একটি নয়, বহুসংখ্যক। কতক আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা ভারতের ভিতরেই তাদের হোমল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করবে। হিন্দুদের বেলা দেশ থেকে নেশন। মুসলমানদের বেলা নেশন থেকে দেশ। ইতিহাসে এর নজীর আছে। তুর্করা তো তুরস্কের আদি অধিবাসী ছিল না। তুরস্কও ছিল না তার নাম। মধ্য এশিয়ার তুর্করা সদলবলে গিয়ে বলপূর্বক সে দেশ অধিকার করে দেশের নাম তুরস্ক রেখেছে। হাঙ্গেরীর নামকরণ হান বা হুন থেকে। তারাও গেছে এশিয়া থেকে।

"ওরা যদি কলকাতা ছেড়ে দেয় আমিও ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী যশোর ছেড়ে দিতে রাজী আছি। গৃহযুদ্ধ আমি এড়াতেই চাই। কিন্তু কলকাতা দাবী করলে যুদ্ধং দেহি। তোমাকে নোটিস দিয়ে রাখলুম। না, বার্লিনের মতো কলকাতা ভাগ করতে দেব না। কিন্তু বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব।" দীপিকাদি বলেন।

"সেটাও তো বাঙালী জাতির পক্ষে অগৌরবের বিষয়। যেমন জার্মান জাতির পক্ষে। তোমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে না? অগৌরবের বিষয় নিয়ে কি কোনো কালে কালজয়ী নাটক উপন্যাস লিখতে পারা যাবে? উত্তর-পুরুষকে আমরা জগৎ কবিসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেব কী করে?

কী সাহিত্যকীর্তি নিয়ে তারা ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দেবে? ব্যাড বার্গেন। ভেরি ব্যাড বার্গেন। এর চেয়ে ঢের ভালো স্বাধীন সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলাদেশ।"

"তার মানে প্রকাশ্য পাকিস্তান নয়, প্রচ্ছন্ন পাকিস্তান। মুসলিম মেজরিটিই স্থির করবে ফরেন পলিসি, ওয়ার অ্যাণ্ড পীস। হিন্দু মাইনরিটি ভুলের মাশুল দেবে। স্বাধীন বাংলাদেশ যদি ব্রিটেনকে মিলিটারি বেস দেয় তা হলে ফোর্ট উইলিয়ামে আবার গোরা ফৌজ মোতায়েন হবে। ব্রিটেন যদি আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশও আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সেটা মুসলমানদের পক্ষেও খারাপ হবে। কিন্তু ওরাও পারবে না পলিসি বদল করতে। ওরা যদি স্বতন্ত্র স্বাধীনতা চায় তো পূর্ববঙ্গ নিয়েই সন্তুষ্ট হোক। আমরা ওদের দিকে তাকাব না। চোখ ফিরিয়ে নেব। ওরা যাকে খুশি তাকে খাল কেটে ঘরে ডেকে আনতে পারবে। পরে পশতাবে।" দীপিকাদি বলেন।

স্বপনদাকে স্বীকার করতে হয় যে পাকিস্তানী মানসিকতা যেখানে এত ব্যাপক সেখানে বাঙালী মানসিকতা পাত্তা পাবে না। কিন্তু এর একটা ভালো দিকও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুদের মনেও ধর্মকে অবলম্বন করে নেশনবোধ জাগে। সেই নেশনবোধকে অবলম্বন করে সাহিত্যে ও জীবনে নব জাগরণ হয়। নেশনবোধ থাকলে মুসলমানদের মধ্যেও সাহিত্যে জীবনে নব জাগরণ আসত। হিন্দুরা এখন আর ধর্মের কাছ থেকে প্রেরণা পায় না। পৌরাণিক নাটক দেখে না। পৌরাণিক কাব্য লেখে না। উপন্যাসেও ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ। মুসলমানদেরও ধর্মের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে। নইলে তাদের কাব্য, উপন্যাস, নাটক তাদের দেশের মানুষ পছন্দ করবে না।"

"তোমার সঙ্গে এখানে আমি একমত। তোমার মতো আমি ঐতিহাসিক নিয়তি মানিনে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্তন মানি। বিবর্তন বাঙালী হিন্দুকে যে যুগে উপনীত করেছে বাঙালী মুসলমানকে সে যুগে উপনীত করেনি। অন্তত অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। ইংরেজদের ভেদনীতির উপরেই আমরা এতদিন সবটা দোষ চাপিয়েছি। সেটা পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধসত্য। যে কোনো কারণেই হোক ওরা অর্ধ শতাব্দী ব্যবধানে রয়েছে। ধর্মের ব্যবধানই একমাত্র ব্যবধান নয়। যুগের ব্যবধানও একটা ব্যবধান ও আমার মতে আরো দুস্তর ব্যবধান। কামাল পাশা তুর্কদের আধুনিক যুগে পৌঁছে দিয়েছেন। তেরশো বছরের পুরনো খেলাফৎ থেকে মুক্ত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকেও

খেলাফৎ রহিত হয়েছে। কামাল তেমনি স্বদেশকে শরিয়তী আইন থেকেও মুক্ত করেছেন। সেটাও এক অর্থে যুগপরিবর্তন। প্রবর্তন করেছেন সুইস আইন। ফলে সমাজকেও তিনি মোল্লাদের শাসন থেকে মুক্ত করেছেন। পাকিস্তানেও তাঁর মতো মুক্তিদাতার আবির্ভাব হবে। জিন্না সাহেব তাঁর জন্যে পথ তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তি বলতে তিনি বোঝেন তাঁর এক নম্বর শত্রু গান্ধীর কবল থেকে মুক্তি। গান্ধী যেমন বোঝেন তাঁর এক নম্বর শত্রু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কবল থেকে মুক্তি। দু'জনেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। যদি না গৃহযুদ্ধ বেধে যায় ও ইংরেজ আটকা পড়ে।" দীপিকাদি বলেন।

"আমি কিন্তু অতখানি আশাবাদী নই। ক্যাবিনেট মিশনের স্কীম যদি খারিজ হয় তা হলে হয় পার্টিশন, নয় গৃহযুদ্ধ। অথবা একই সঙ্গে দুই। ইংরেজরা কি অনন্তকাল অপেক্ষা করবে? কংগ্রেসকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে যোগ দিতেই হবে। ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টেও অংশ নেওয়া চাই। গৃহযুদ্ধ বাধাবার সঙ্কেত কংগ্রেস যেন না দেয়। দিলে দেবে লীগ। কিন্তু সে-ই বা কেন দেবে?" স্বপনদা অবিশ্বাস করেন।

দু'জনেরই ভাবনা বাংলাদেশকে ঘিরে বা কলকাতাকে ঘিরে। আসামের দিক থেকে কেউ ভেবে দেখেননি। ওরা ওদিকে তার স্বরে চিৎকার করছে যে আসাম গেল! আসামকে যদি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে গ্রুপ গঠন করা হয় তবে সেই গ্রুপে দুই প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা দাঁড়াবে একুনে শতকরা পঞ্চাশের উপর। তারাই তাদের ভোটাধিক্যে আসামের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান একজোট হয়ে তাদের ভোটাধিক্যে আসামকে বানাবে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপনিবেশ। অসমীয়ারা যেমন ভয় করে বাঙালী মুসসমানদের তেমনি ভয় করে বাঙালী হিন্দুদেরও। গ্রুপের হাতে ভাগ্য সমর্পণ যেন ডাইনীর হাতে সন্তান সমর্পণ। ওদের আপত্তি অহেতুক নয়।

কংগ্রেসকে ওদের আপত্তি বিবেচনা করতে হয়। ক্যাবিনেট মিশন আশা দেন আসাম ইচ্ছা করলে পাঁচ বছর বাদে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি গ্রুপ কনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে থাকে ও প্রাদেশিক কনস্টিটিশন পালটে দেওয়া হয়ে থাকে তবে নবগঠিত আসাম গভর্নমেণ্ট বেরিয়ে

যেতে চাইবে না, চাইলেও গ্রূপ গভর্নমেণ্ট বেরিয়ে যাবার দুয়ার খোলা রাখবে না। কিন্তু এইটুকু কারণে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের গোটা স্কীমটা বর্জন করতে চায় না। ব্যাপারটার চুলচেরা বিচারের জন্যে ফেডারল কোর্টে পাঠানো স্থির করে। কেননা মিশনের স্টেটমেণ্টের ভাষায় কিছু ত্রুটি ছিল। মিশন যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে তার থেকে অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য ব্যাখ্যা অনুসারে আসাম আদৌ না ঢুকতেও পারে। না ঢুকলে তাকে বাধ্য করতে পারা যাবে না।

গান্ধীজী তো আসাম কংগ্রেস নেতাদের সরাসরি পরামর্শ দেন কংগ্রেস ত্যাগ করতে। তা হলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ মানতে হবে না। আসাম গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস দলের গভর্নমেণ্ট। কংগ্রেস ত্যাগ করলে কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত মন্ত্রীরা গভর্নমেণ্ট ত্যাগ করতে সম্মানবদ্ধ। তা হলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তাঁদের জায়গায় যাঁরা মন্ত্রী হবেন তাঁরা গ্রূপে ঢুকতে রাজী হতে পারেন। কয়েকটা ভোট ভাঙিয়ে নিতে পারলে লীগ নেতা সাদুল্লা সাহেব গভর্নমেণ্ট গঠন করতে পারবেন। গান্ধীজী সেদিক থেকে ভাবেন নি। ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট বজায় রাখতে চান। মন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন না। জনমতও তার পক্ষপাতী নয়।

ক্যাবিনেট মিশন কেন্দ্রকে ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে চান। গান্ধীজীরও এতে সায় ছিল। তিনিই তো এর প্রথম প্রবক্তা। কংগ্রেসে নেতারা মনে করেন কেন্দ্রের হাতে আরো কয়েকটা বিষয় না থাকলে কেন্দ্র শক্ত সমর্থ হবে না। নিচের তলা থেকে সহযোগিতা না পেলে কেন্দ্র অচল হবে। শেষে ভেঙে পড়বে। জিন্না ঠিক সেই ভাঙনটার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করবেন। আরো আগেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এটা একটা তুচ্ছ কারণ নয়, গুরুতর কারণ। এই কারণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের স্কীম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের হাত চেপে ধরেন। ক্যাবিনেট মিশন বলেননি যে তাঁদের স্কীম গ্রহণ করতেই হবে। অগ্রাহ্য করার স্বাধীনতা কংগ্রেসের আছে। কিন্তু ক্রিপসকে দ্বিতীয়বার খালি হাতে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর মুখরক্ষা করতে হবে। কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন-সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এটা বড়লাটকে হতভম্ব করে দেয়।

লর্ড ওয়েভেল সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের জন্যে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি কেন্দ্রে রদবদল ঘটাতে উদ্‌গ্রীব। যেটা চার বছর আগে সম্ভব ছিল না সেটা এবার সম্ভব হবে। জঙ্গীলাটকে বাদ দিয়ে ভারতীয়দের একজনকে ডিফেন্সের ভার দেওয়া হবে। তিনিই হবেন ভারতীয় ফৌজের সর্বোচ্চ পরিচালক। ইংরেজ সেনাপতিদেরও উপরওয়ালা। এতেই সূচনা করছে যে ব্রিটিশ সৈন্য অচিরে ভারত ত্যাগ করবে। বাকী রইল বড়লাটের ভীটো দানের ক্ষমতা। সেটা তিনি আপাতত হস্তান্তর করবেন না। কিন্তু ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। তাঁর গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেই এখন যেমন দায়ী পরেও তেমনি দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে নয়।

কংগ্রেস এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করে না। কিন্তু বড়লাট যখন লীগের মুখ চেয়ে প্যারিটির প্রস্তাব করেন তখন কংগ্রেস বেঁকে বসে। সমগ্র দেশে মুসলমান যতজন হিন্দু তার প্রায় তিন গুণ। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ সদস্য যতজন কংগ্রেস সদস্য তার দু'গুণ। প্যারিটি কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? কংগ্রেস নারাজ হয়। তখন বড়লাট পাঁচজন মুসলমান, পাঁচজন বর্ণ হিন্দু ও একজন তফসীলী হিন্দু নিয়ে সমস্যার মীমাংসা করতে চান। জিন্না সাহেব কী করবেন? মেনে নেন। নইলে তার সঙ্গে কথাবার্তা এগোয় না। এগোয় কংগ্রেসের সঙ্গে।

ক্যাবিনেট মিশন পাকিস্তানের আর্জি খারিজ করেছেন বড়লাট প্যারিটির আর্জি। বাকী থাকে মুসলিম লীগের অসপত্ন মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবী। কংগ্রেস যখন একজন মুসলমানকে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে তার জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলির একটি দিতে চায় জিন্না তখন বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে বলেন, কিছুতেই না। কংগ্রেস হিন্দুদের দল, হিন্দুর জায়গায় মুসলমান পাঠাতে পারে না। কংগ্রেস বলে, মুসলমান তো কংগ্রেসের আদিকাল থেকেই কংগ্রেসে আছেন। কেউ কেউ প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। যেমন বদরুদ্দীন তৈয়বজী, রহিমতুল্লা সায়ানী, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলী। মহম্মদ আলী জিন্নাও হতে পারতেন, যদি কংগ্রেস না ছাড়তেন। এখনো একটা প্রদেশ শাসন করছেন কংগ্রেস মুসলিম মন্ত্রীরা। কেন্দ্রে অনধিকারী হলে প্রদেশেও তো তাঁরা অনধিকারী হবেন। তবে কি তাঁদেরও গদী ছাড়তে হবে?

কংগ্রেসের ভাগ থেকে একটি আসন যদি কংগ্রেস একজন মুসলমানকে দেয় লীগের ভাগ তো কমে না। বরং হিন্দু মুসলমান সমানসংখ্যক হয়। ইসলামের উপর আঘাত এলে সব মুসলমান একজোট হয়ে প্রতিরোধ করবেন।

বড়লাট কংগ্রেসকে অনুরোধ উপরোধ করেন এই নিয়ে সে যেন পীড়াপীড়ি না করে। জিন্না এক্ষেত্রে অটল অনড়। নিজের দলের একজন মুসলমানকে মনোনয়ন করার অধিকার কংগ্রেসের আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগ না করাই বিজ্ঞতা। অমন করলে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট দ্বিদলীয় হবে না, একদলীয় হবে। সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে। গণ্ডগোল বাধবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটকে জানায় কংগ্রেসের পক্ষে নিজের মৌল নীতি বিসর্জন দেওয়া সঙ্গত নয়। অমন করলে প্রতিষ্ঠান ভেঙে যাবে। কংগ্রেস ভেঙে গেলে ক্ষমতা নিয়ে কী হবে? কংগ্রেস ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে না।

তা হলে দাঁড়াল এই যে, ক্যাবিনেট মিশনের মুখ রক্ষার জন্যে কংগ্রেস কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে বসতে রাজী, কিন্তু বড়লাটের মুখ রক্ষার জন্যে তাঁর শাসন পরিষদে বসতে রাজী নয়। কংগ্রেস নেতারা না থাকলে পেনসন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি একতরফা গ্রহণ করা যাবে না। ব্রিটিশ অপসরণের পর সিভিল ও মিলিটারি অফিসারদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস নেতারা বলতে পারেন, মুসলিম লীগ দিতে চায় দিক, কংগ্রেস দেবে না। বড়লাট পড়ে যান বেকায়দায়। এখন যদি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হয় তবে পরে কখন হবে? তখন কি কংগ্রেস নেতারা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগদানের জন্যে চড়া দর হাঁকবেন না? পাল্লা দিয়ে লীগ হাঁকবে আরো চড়া দর। কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারা যাবে না। হয় নির্দলীয় সরকার চালাতে হবে, নয় একদলীয় সরকার চালাতে হবে, আর নয়তো এক একটি প্রদেশ এক একটি দলকে দিয়ে কেন্দ্রের সুবন্দোবস্ত না করেই ভঙ্গ দিতে হবে।

জিন্না সাহেব অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে বড়লাটের আমন্ত্রণ আসবে, তিনি কংগ্রেস নেতাদের অবর্তমানে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট জুড়ে বসবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাঁর দলের ভাগেই পড়বে। কংগ্রেস যদি পরে আসে আর সব পাবে, কিন্তু সেগুলি নয়। তিনি যা ডিকটেট করবেন ওয়েভেল তাই শুনবেন। তাঁর নির্দেশে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের কংগ্রেস মুসলিম

গভর্নমেন্টের পতন হবে, তার পরে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট মুসলিম কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের, পশ্চিম পাকিস্তানে লীগ গভর্নমেণ্ট ভিন্ন আর কোনো গভর্নমেণ্ট থাকবে না। আরো পরে আসামের কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট খতম হবে, তার জায়গায় নেবে লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। অমনি করে পূর্বপাকিস্তানেও মুসলিম লীগ নিষ্কণ্টক হবে। অবশেষে দুই পাকিস্তান মিলিয়ে এক পাকিস্তান। পাকিস্তানের সর্বেসর্বা হয়ে তিনি হিন্দুস্থানের কর্তাদের সঙ্গে বার্গেন করবেন। সর্বত্র কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে। কংগ্রেস মুসলিম বাদে।

বড়লাট জিন্না সাহেবকে জানিয়ে দেন, আপাতত ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করা সমীচীন হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে তলিয়ে দেখতে হবে। সময় লাগবে। ইণ্টারিম গভর্নমেন্টের বদলে গঠিত হবে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট। আকারে ছোট। সদস্যরা সবাই সরকারী কর্মচারী। পরে তাঁরা পদত্যাগ করবেন। এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা।

জিন্না সাহেব তো ক্ষেপে লাল। বড়লাট তাঁকে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না। কথা ছিল কংগ্রেস আসুক আর না আসুক লীগ আসবেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে তাঁর কথার কোনো দাম নেই। তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে লীগের সহযোগিতাও উপেক্ষা করবেন। অপেক্ষার অর্থ উপেক্ষা। তাঁর জীবনে রাজকুলের উপেক্ষা এই প্রথম। বড়লাটের সকাশে তিনি তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানান। যে পার্টি কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে যেতে রাজী হবে সেই পার্টি ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট যাবার হকদার হবে, এই তো ছিল শর্ত। তিনি এ শর্ত পূরণ করেছেন, এর জন্যে পাকিস্তানের দাবী ত্যাগ করেছেন, প্যারিটির দাবী ত্যাগ করেছেন, আর কত ত্যাগ করবেন ? অসপত্ন মুসলিম প্রতিনিধিত্বের দাবা ত্যাগ করা অসম্ভব। সেই কারণে যদি কংগ্রেস বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগদান না করে সেটা কার দোষ ? কংগ্রেস তো এমনিতেই যোগদানের হকদার নয়, যেহেতু সে বঙ্গ ও আসামকে এক গ্রুপভুক্ত করতে দ্বিধান্বিভ। কংগ্রেসের দোষে কি লীগের সাজা হবে ?

স্বপনদার বন্ধু মীর আবদুল লতিফ স্বপনদাকে বলেন, "নেহরুও আসছেন না, জিন্নাও আসছেন না। বেসরকারী সদস্যদেরও বড়লাট বিদায় দিয়েছেন। কেয়ারটেকার হবেন জনা কয়েক বাছা বাছা সিভিলিয়ান। তাই এর নাম কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট। এদিকে হিন্দু মুসললিম টেনসন বেড়েই চলেছে।

তবে ইঙ্গ-ভারতীয় টেনসন কমেছে। গান্ধীজী জয়প্রকাশ নারায়ণকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন। বামপন্থীরা শান্ত। কংগ্রেসের দিক থেকে কোনো গোলমাল বাধবে না। গান্ধীজী বাধতে দেবেন না। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের বলেছেন কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী হচ্ছে গণ সত্যাগ্রহের পরিবর্ত। আপাতত বছর দুই নতুন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে মনোনিবেশ করা যাক। ইংরেজরা দু'বছর সময় নিক। এর ত্যাৎপর্য বুঝতে পারছেন ?"

"না, মীর সাহেব। রাজনীতি আমি বুঝিনে। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে শুনতে চাওয়া।" স্বীকার করেন স্বপনদা।

"গান্ধীজীর পরামর্শ হয় কংগ্রেসকে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে নেওয়া হোক, নয় লীগকে। দুই সতীনকে একই বাড়ীতে রাখলে তারা বিস্ফোরণ ঘটাবে। কংগ্রেস ক্ষমতার জন্যে লালায়িত নয়, লীগ যদি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে তবে লীগকেই আমন্ত্রণ করা হোক। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসেরই নিরঙ্কুশ মেজরিটি। অবশ্য মনোনীত সদস্যরা যদি নিরপেক্ষ থাকেন। বাজেট অধিবেশনে লীগ হেরে যাবে। বড়লাট বোধ হয় সেই আশঙ্কায় জিন্না সাহেবকে আমন্ত্রণ করছেন না। আবার, কংগ্রেকে আমন্ত্রণ করতে তিনি পেছপাও। কংগ্রেস যদি যায় একজন কংগ্রেস মুসলিমকেও সঙ্গে নেবে। জেলযাত্রার দিন যারা সহযাত্রী রাজসভাযাত্রার দিন তারা বিবর্জিত, এ কী রকম বিচার ? এ কি সেই পথি নারী বিবর্জিতা ?" মীর সাহেব উচ্চহাস্য করেন।

স্বপনদা বিস্মিত হয়ে বলেন, "তা হলে কি কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্টই দু'বছর পায়চারি করবে ? যতদিন না নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হয়।"

"না, না, কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট কোথাও বেশী দিন কাজ করে না। এমন সব গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা নেওয়া কেয়ারটেকারদের কর্ম নয়। ওই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টই গঠন করতে হবে। সেটারই মেয়াদ হবে দু বছর কি তিন বছর। কংগ্রেসকে বাদ দিলে মেজরিটিকে বাদ দেওয়া হবে। আবার, মাইনরিটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। মুসলিম, শিখ, খ্রীস্টান এই তিন মাইনরিটিই থাকবেন। উপরন্তু পার্শী। তাঁদের তো আর কোনো দেশ নেই। আর তাঁরা গোড়া থেকেই কংগ্রেসে আছেন। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ মেহতা এঁরাই তো একদা কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

'স্বরাজ' আমাদের লক্ষ্য, কার কণ্ঠে এটা প্রথম উচ্চারিত হয়? দাদাভাই নওরোজীর সভাপতির অভিভাষণে। চল্লিশ বছর পূর্বে। সেই রকম সময়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। এতদিনে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। স্বরাজের পালটা লক্ষ্য হয়েছে পাকিস্তান। দাদাভাইয়ের রাজনৈতিক শিষ্য জিন্নার এই রূপান্তর। দাদাভাই যাকে স্বরাজ বলেন জিন্না তাকে বলেন হোমরুল। হোমরুল লীগ বলে একটা প্রতিষ্ঠানের হন সভাপতি। গান্ধীজী তখন ছিলেন তার উপসভাপতি বা সেইরকম কিছু। তাই আজকের গান্ধীপ্রাধান্য তাঁর চক্ষুঃশূল।" মীর সাহেব বলেন।

"হোম রুল কথাটা এল কোন্‌খান থেকে? আয়ারল্যাণ্ড থেকে। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের অনুসরণে ইণ্ডিয়ান হোম রুল আন্দোলন। মিসেস বেসাণ্ট ছিলেন অন্যতম নেত্রী। তাঁরও ছিল আর একটি হোম রুল লীগ। আইরিশরা হোম রুল পেতে যাচ্ছে, ব্রিটেন দিতে তৈরি, এমন সময় আলস্টারের প্রটেস্টাণ্টরা পাল্টা আন্দোলন শুরু করে দেন। তাঁরা ক্যাথলিক মেজরিটির আধিপত্য মানবেন না, তাঁদের জন্যে চাই স্বতন্ত্র একটি খণ্ড। সেটা হবে ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত। কার্সন তার প্রবক্তা। বিখ্যাত ব্যারিস্টার। আমার মনে হয় জিন্না সাহেব আইরিশ হোম রুল চেয়েছিলেন, এখন হিন্দু আধিপত্যের ভয়ে কার্সনের অনুকরণে আলস্টার অর্থাৎ পাকিস্তান চাইছেন। আইরিশ হোম রুলের নেতারা শেষ মুহূর্তে আপস করেন। আইরিশ ফ্রী স্টেটের দোসর হয় নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড। স্বাধীন নয়, স্বতন্ত্র। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান যদি বিচ্ছিন্ন হয় তবে ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত হবে। আরো এক ডোমিনিয়ন।" স্বপনদার আন্দাজ।

মীর সাহেব এ লাইনে চিন্তা করেননি। মনের মধ্যে তলিয়ে যান। তার পরে বলেন, "সম্ভবত তাই হবে। ক্যাবিনেট মিশন স্কীমে ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানের আউটলাইন রয়েছে। জিন্না যদি তাতেই তুষ্ট হন তবে তারই সম্ভাবনা আছে। বৃহত্তর পাকিস্তানের নয়। কলকাতা তাঁর নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমান কি সত্যি তাই চায়? আমার সন্দেহ আছে। তার প্রগতি আবার এক পুরুষ পেছিয়ে যাবে।"

স্বপনদা তা শুনে বলেন, "তাই যদি হয় তবে সেই ওদের ঐতিহাসিক নিয়তি। আমার স্ত্রী কিন্তু আমার সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে ঐতিহাসিক বিবর্তন।"

"মানুষ যেটা স্বেচ্ছায় বেছে নেয় সেটা তার নিয়তি নয়। ওরা যদি স্বেচ্ছায় দেশের একভাগ ও প্রদেশের একভাগ বেছে নেয় তবে সেটা নিয়তি নয়, অপশন। এটা রেফারেণ্ডাম করে অপশন দিতে হবে। জিন্নার উপরে যেন সেটা ছেড়ে দেওয়া না হয়। লীগের উপরেও না।" মীর সাহেবের অভিমত।

"কেন? এবারকার নির্বাচন কী পাকিস্তান অর্জনের ম্যাণ্ডেট নয়? লীগ তো প্রায় সব ক'টা মুসলিম আসন জিতেছে। কৃষক প্রজা দলের আসন সংখ্যা নগণ্য।" স্বপনদা বলেন।

"সেকথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তান কত বড়ো বা কত ছোট সেটা তো ভোটারদের জানানো হয়নি। তারা ধরে নিয়েছে গোটা বাংলাদেশটাই হবে পাকিস্তানের সামিল। হিন্দুদের ভাগ দিতে হবে না। চোখ বুজে যারা ভোট দিয়েছে চোখ খোলা রেখে তারা ভোট দিক, তা হলেই বোঝা যাবে তারা ছোট পাকিস্তান চায় না বড়ো পাকিস্তান। যার ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যৌথ।" মীর সাহেব বিশদ করেন।

'তা হলে আবার সেই হিন্দু প্রাধান্য মেনে নিতে হলো। প্যারিটি তো হিন্দুপ্রধান গ্রুপের সঙ্গে মুসলিমপ্রধান দুই গ্রুপের হতে পারে না। মুসলিম লীগ কি তাতে রাজী হবে? আমার মনে হয় বাঙালীর নিয়তি আগে থেকেই স্থির হয়ে রয়েছে। ওরা জার্মানদের মতো ভাগ হয়ে যাবেই। কলকাতা যদি বার্লিনের মতো ভাগ না হয়ে যায় তবেই আমি বাঁচি।' স্বপনদা বলেন।

"দেখুন, গুপ্তসাহেব, আপনি ধরে নিয়েছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আর একটি ইউরোপ, বাংলাদেশ হচ্ছে তার জার্মানী আর কলকাতা হচ্ছে তার বার্লিন। এই ধারণাটাই ভুল। তাই আপনি মনে মনে প্রমাদ গণছেন। মুসলমানরা হিন্দুদের মতোই ভারতময় ছড়ানো। তারা কেউ মন থেকে পাকিস্তান বলে একটা পৃথক রাষ্ট্র চায় না, কারণ তা হলে তারা দিল্লী আগ্রা লখনৌ, পাটনায় পরদেশী বনে যাবে। তারা বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী থেকেও আস্তানা গুটোবে। অথচ বোম্বাইতে জিন্না সাহেবের বিরাট ভবন। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে তিনি ওই প্রাসাদ তৈরি করেছেন। না, ওটা প্রাণ ধরে ত্যাগ করবেন না। মেয়েকেও দেবেন না। তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। শুনেছেন বোধহয় তার মেয়ে যাকে বিয়ে করেছে সে পার্সী খ্রীস্টান। জবাহরলাল তাঁর জামাতাকে গ্রহণ করেছেন, জিন্না কিন্তু তাঁর জামাতাকে গ্রহণ করেননি। গ্রহণ করলে নেতৃত্ব হারাতেন।"

"জবাহরলাল তাঁর নেতৃত্ব হারাতেন না?" স্বপনদা সুধান।

"হারাতেন, যদি গান্ধীজী ইন্দিরার বিবাহের বিপক্ষে দাঁড়াতেন। তিনি সায় দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে হিন্দু মুসলমান পার্সী খ্রীস্টানকে জুড়ে জুড়ে এক নেশন গঠন করা যাবে না। পাতানো সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। রক্ত সম্পর্কও অত্যাবশ্যক। জার্মানরা এটা মানতে চায়নি। ইহুদীরাও কি মানতে চেয়েছে? এই নিয়ে কত বড়ো অনর্থ ঘটে গেল হিটলারের আমলে। আকবরের নীতি সফল হলে হিন্দু মুসলমানের জাতিবৈর এতদিনে মিতালীতে পরিণত হত। হিন্দু হিন্দুই থাকত, মুসলমান মুসলমানই থাকত, কিন্তু অসংখ্য পরিবার আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতো। অতীতের জন্যে আফসোস করে ফল নেই। ভবিষ্যতের দিকেই দৃষ্টি রাখা যাক। যা বলছিলুম, মুসলমানরা মন থেকে হিন্দুদের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ কামনা করে না। জিন্না সাহেবের কাছে পাকিস্তান হচ্ছে বার্গেনিং কাউন্টার। তিনি যদি সমান শর্তে পার্টনারশিপ পান তবে পার্টিশন মুলতুবি রাখবেন। গান্ধীজী যদি সমান শর্তে পার্টনারশিপে রাজী হন তা হলে ক্ষমতার হস্তান্তর কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত হস্তে হবে। স্বাধীনতার আনন্দ হিন্দু মুসলমান সমানে উপভোগ করবে। আর নয়তো হিন্দুর কাছে যা স্বাধীনতা মুসলমানের কাছে তা নতুন এক পরাধীনতা। ওরা বিদ্রোহের নিশান তুলবে। সেটা নেবে গৃহযুদ্ধের আকার। জিন্না সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান দাবী করবেন। মুলতুবি রাখবেন না।" মীর সাহেব দুঃখিত।

"আপনারা ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরাও তাঁর শিবিরে যাবেন? ইউনিয়নিস্ট মুসলিমরাও?" স্বপনদা জেরা করেন।

"আমরা পড়ে যাব বিষম দোটানায়। সেটা পরিহার করাই কর্তব্য। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আর কোথাও না হোক বাংলাদেশে একটা কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গড়ে ওঠে। কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন। শহীদও তাই চায়, কিরণশঙ্করও তাই। কিন্তু দুই হাই কমাণ্ড অনড় অটল। কংগ্রেসকে স্বীকার করতে হবে যে মুসলিম লীগই মুসলিম নেশনের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস শুধু হিন্দু নেশনের। মুসলিম নেশন আর হিন্দু নেশনের মধ্যে সমতা রক্ষা করাও চাই, কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। তাদের সম্পর্ক মেজরিটি মাইনরিটির নয়, দুই মেজরিটির। যে যার ক্ষেত্রে মেজরিটি। এসব তত্ত্ব যদি কোয়ালিশনের পূর্বশর্ত হয় তবে তো কোয়ালিশনের কোনো আশাই থাকে না। আমরা দুর্ভাবনায় পড়েছি।" মীর সাহেব বিমর্ষ।

॥ বিশ ॥

দীপিকাদি এতক্ষণ মৌন ছিলেন। এবার মুখ খোলেন। "আমি কি কিছু বলতে পারি ?"

মীর সাহেব বলেন, "সে কী কথা! আপনি হলেন গৃহের কর্ত্রী। আপনি বলবেন না তো কে বলবে ?"

"আমি একজন সাধারণ নাগরিক। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই বাংলাভাষায় বাঙালীকে বাঙালী এমন কদর্যভাবে গালমন্দ করছে যে মেছুনীরাও লজ্জা পায়। এক্লেলরাও কাঁদে। কলম হাতে থাকতেই এই! তলোয়ার হাতে পেলে তো এরা একে অপরের মাথা কাটবে। দুনিয়ার লোক দেখবে বাঙালী হিন্দু খুন করছে বাঙালী মুসলমানকে, বাঙালী মুসলমান খুন করছে বাঙালী হিন্দুকে। কিন্তু কেন ? ঝগড়াটা তো হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের নয়। কংগ্রেস মুসলিমের সঙ্গে লীগ মুসলিমের। মওলানা আজাদের সঙ্গে কায়দে আজম জিন্নার। বড়লাটের শাসনপরিষদে আজাদ যদি যান জিন্না যাবেন না। জিন্না না গেলে শাসনপরিষদ সর্বজনগ্রাহ্য হবে না, বড়লাট তাই কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন কংগ্রেস মুসলিম বাদ দিতে। কংগ্রেস তার উত্তরে বলে, কংগ্রেস মুসলিম বাদ গেলে কংগ্রেসও বাদ যাবে। বড়লাট ভাবতেই পারেননি যে কংগ্রেস এই ইস্যুতে ব্যাক আউট করবে। জিন্নাকে তিনি বলেন সবুর করতে। যথাকালে তিনি ডাকবেন, এখন নয়। জিন্না তো রেগে টং। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের স্বীকৃতি দিলে তথাকথিত মুসলিম নেশনের সংহতি নষ্ট হয়। ইউনিয়নিস্ট মুসলিমদের বেলাও সেই যুক্তি। সিমলা বৈঠকের সময় তিনি বড়লাটের মনোনীত একজন ইউনিয়নিস্ট মুসলিমকেও কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে আসতে দেবেন না, বড়লাটও ইউনিয়নিস্টদের যুদ্ধকালীন সহযোগিতার কথা স্মরণ করে তাঁদের একজনকে আনতে ভুলবেন না। শাসনপরিষদের রদবদলের প্রস্তাব ভেস্তে যায়। একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবারেও। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট চান তো একজন কংগ্রেস মুসলিম বা ন্যাশনালিস্ট মুসলিমকেও তাঁর শাসনপরিষদে না নিয়ে পারেন না। তা করতে গেলে কিন্তু জিন্না সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায়

ছেদ পড়বে। আর কায়দে আজমই তো আজকের ভারতে অধিকাংশ মুসলমানের মুকুটহীন বাদশাহ। বড়লাট কি তাদের বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দেবেন ? তা হয় না। এখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী কী নির্দেশ দেন তারই অপেক্ষায় থাকবেন। এদিকে দেশ হয়েছে অগ্নিগর্ভ। একটা দেশলাইয়ের কাঠির শিখা থেকে যে কোনো দিন যে কোনো উপলক্ষে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে।" দীপিকাদি আশঙ্কা করেন।

মীর সাহেব একথা শুনে বলেন, "আমরা সকলেই তার জন্যে উদ্বিগ্ন। কিন্তু কায়দে আজম কেন বুঝতে চাইছেন না যে মওলানা সাহেবকে আসতে দিলে তিনি যেতেন মুসলমান হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে। বসতেন কংগ্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট অন্যতম আসনে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের একজন সদস্য হিসাবে রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা চালাতেন ভারতের বৃহত্তম দলের তরফ থেকে। তাঁকে সামনে রেখে যারা কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন করেছে, তিন বছর যিনি বন্দিশালায় কাটিয়েছেন, কংগ্রেস পলিসি যিনি প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত জানেন তাঁর অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নেবেন কী করে ? ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট তো শাসনযন্ত্র চালাবার জন্যে নয়। সে কাজ কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্টও করতে পারে। যেটা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টের আসল কাজ সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে দর কষাকষি। দু'শো বছরের একটা সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তার অ্যাসেটস কী, লায়াবিলিটিজ কী না জেনে চোখ বুজে তো গভর্নমেণ্টের দায়দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেওয়া যায় না। ক্ষমতার হস্তান্তর হচ্ছে দায়িত্বের হস্তান্তর। মওলানা সাহেব যাবেন কংগ্রেস প্রতিনিধি হয়ে, তাঁর যাবার ফলে লীগ প্রতিনিধির সংখ্যা একটিও কমবে না, বরং মুসলমানের সংখ্যা একটি বাড়বে। তথাকথিত মুসলিম নেশন যদি এটা না বোঝে তবে সেই অবুঝকে বড়লাট বোঝাবেন। নয়তো তার বিদ্রোহের ভয়ে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন মুলতুবি থাকবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এর নাম প্রগতি নয়, গতিরোধ। এটাও একপ্রকার ভীটো। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী তো পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন যে ভীটো দিয়ে প্রগতি বন্ধ রাখা চলবে না। তাঁর সেই ঘোষণা কি মাঠে মারা যাবে ? জিন্না সাহেব সদলবলে আসুন, পণ্ডিতজীকেও সদলচলে আসতে দিন। খ্রীস্টান, শিখ, পার্সী প্রতিনিধিও আসুন। পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলুন। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই,

ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গেও না। ওঁরাও চান স্বাধীনতা দিতে। মিত্রতা করতে। ভারত যদি স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের মেম্বর হতে চায় তবে ব্রিটেন স্বাগত জানাবে।"

দীপিকাদি প্রীত হয়ে বলেন, "আপনার সঙ্গে আমি একমত। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই সঙ্কটক্ষণে আপনি ও আপনার মতো চিন্তাশীল মুসলমানরা নীরব কেন? আপনারা কি খবরের কাগজে লিখে অবুঝদের বোঝাতে পারতেন না? এটা হিন্দুদের সমস্যা নয়, হিন্দুরা লিখতে গেলে শুনবে ওরা মুসলমানের সংহতি পছন্দ করে না। মুসলমানের সংহতির কমতি কোথায়? ধর্মীয় ব্যাপারে তো ওরা সবাই এককাট্টা। কিন্তু এটা হলো রাজনীতির ব্যাপার। এক্ষেত্রে মুসলমানরা কবে একাকাট্টা ছিল? মোগলরা এসে তুর্কী বা পাঠানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়নি? নাদির শাহ এসে মোগল বাদশাহের ময়ুর সিংহাসন ও কোহিনুর হরণ করেননি? কমিউনিস্ট পার্টিতেও মুসলমান আছে, কেবল কংগ্রেস পার্টিতে নয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা, কমিউনিস্টদের লক্ষ্য বিপ্লব। কখনো যদি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ক্ষমতা পড়ে তবে তাঁদের একজন মুসলিম কমরেডকেও তাঁরা ক্ষমতার আসনে বসাবেন। কংগ্রেস যে বড়লাটের অনুগ্রহে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব করছে তা নয়। কেন্দ্রেই বা কেন বড়লাটের অনুগ্রহনির্ভর হবে? তার চেয়ে বাইরে থাকাই তার পক্ষে সম্মানজনক। তাই বলে সে এই কারণে বিদ্রোহ করবে না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে শাসনতন্ত্র তৈরি করবে। মুসলিম লীগও সেখানে গিয়ে সেই কাজে হাত লাগাতে পারে। মিলে মিশে কাজ করলে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। না হলে তখন না হয় বিদ্রোহ করতে পারে।"

মীর সাহেব বলেন, "ও কথা আমারও কথা, দিদি। আমি যে নীরব রয়েছি তা কিন্তু মানব না। আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ডিঙিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলাদেশকে জুড়ে দেওয়া একটা মিসজয়েণ্ডার। বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান মিশ খাবে। বাংলাদেশকে আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র করলেই বরং উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে হিন্দু মেজরিটির হাত থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষা। স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা কম, কিন্তু প্রভাব বেশী। আমার সন্দেহ আসল উদ্দেশ্য তা নয়, ব্রিটিশ এ্যাওয়ার্ড।"

"এ্যাওয়ার্ড"! স্বপনদা যেন বাকশক্তি ফিরে পান। "এ্যাওয়ার্ড যদি লীগ নেতাদের অভিষ্ট হয় তবে সেটা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ভিতরেই নিহিত রয়েছে। একটা নয়, দুটোর একটা। ওঁরা যদি ছ'টা প্রদেশ চান তো ছ'টা প্রদেশই পাবেন, মায় আসাম, যেখানে মুসলমানরা মেজরিটি নয়। কিন্তু যৌথ সোভরেনটিতে রাজী হতে হবে। আর যদি তাঁরা একক সোভরেনটি চান তবে তাঁরা পাবেন আসামের একাংশ, বাংলার আধখানা, পাঞ্জাবের আধখানা, সমগ্র সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও বেলুচীস্থান। ইংরেজের হাত থেকে যদি পেতে হয় তো এইপর্যন্ত ওঁদের দৌড়। এর চেয়ে বেশীদূর নয়। কিন্তু কায়দে আজমের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে এমন উচ্চাভিলাষীও আছেন যাঁরা দিল্লী আগ্রা না পেলে সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা চান গোটা মোগল সাম্রাজ্য। কারণ তাঁরা মোগল বংশধর। ইংরেজ যা দিতে পারে দিক। বাকীটা তাঁরা তলোয়ারের জোরে পুনরধিকার করবেন। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে চূড়ান্ত মিটমাটে সম্মত হবেন না। আপাতত আপস করবেন, যদি কংগ্রেস এ্যাওয়ার্ড মেনে নেয়। আরো উচ্চাভিলাষী যাঁরা তাঁদের মতবাদ প্যান-ইসলামিজম। খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তার মরক্কো থেকে ইণ্ডোনেশিয়া। সেটা অবশ্য সময়সাপেক্ষ। মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর তারা বেরিয়ে পড়বেন তুর্কী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে। তার পরের ধাপ স্পেন পুনর্বিজয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সামিল হয়েছে যেসব মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড সেসব ভূখণ্ডের উপরেও তাদের দাবী আছে। কিন্তু তার আগে তাঁদের আরো বলসঞ্চয় করতে হবে। ইরান, ইরাক, সীরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতিকে দলবদ্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, রোমানিয়া, বুলগারিয়া, গ্রীস প্রভৃতিও তাদের চাই। মুসলিম অধ্যুষিত বলে নয়, পূর্বপুরুষের বিজিত বলে। আমি তো ভেবে দেখছি জিন্নাই সব চেয়ে কম উচ্চাভিলাষী। সবচেয়ে বেশী মডারেট। আফটার অল, তিনিও আমাদের মতো একজন ব্যারিস্টার।"

মীর সাহেব হো হো করে হাসেন। "সেইজন্যে যতরকম কুযুক্তি পেশ করে বড়লাটের কান ভারী করেছেন। একজন কংগ্রেস মুসলিমকেও বড়লাটের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে দেবেন না। পারতপক্ষে গভর্নরের সঙ্গেও না। ওঁদের স্থান জেলে। ওঁরা জেলেই ফিরে যান।"

"ওঁরা তো ইংরেজদের বোঝাচ্ছেন কংগ্রেস মুসলিমরা হিন্দুদের স্টুজ। মুসলমান সেজে মুসলিম নেশনের শিবিরে ঢুকেছেন।" দীপিকাদি দুঃখিত।

"আর ওঁরা কার স্টুজ? ইংরেজদের? জিন্না সাহেব নন, তিনি যথার্থই স্বাধীনচেতা। নাইটও নন, নবাবও নন। জমিদারও নন, চাকরিও করেননি। নেতা হবার যোগ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁদের নেতা তাঁরা ত্যাগের জোরে নয় কষ্ট স্বীকারের জোরে নয়, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভোটের জোরে। ভোট তারা না বুঝেই দিয়েছে। যেদিন ওদের চোখ ফুটবে সেদিন এঁরা থাকবেন কোথায়?" মীর সাহেব রহস্য করেন।

"এঁদের চেয়ে আরো কট্টর মুসলিম রাজনীতিতে নামবে। আমি এঁদের সঙ্গেই আপসের পক্ষপাতী। তার জন্যে যদি আজাদকে বিসর্জন দিতে হয় তাও না হয় দেওয়া যাবে। তাতে করে যদি গৃহযুদ্ধ এড়ানো যায়।" স্বপনদার আশা।

"তাতে করেও গৃহযুদ্ধ এড়ানো যাবে না, গুপ্ত সাহেব। ওঁদের দাবীর ফিরিস্তি কি ওই একটিতে সীমাবদ্ধ?" মীর সাহেব এক কথায় হেসে উড়িয়ে দেন। "যেখানে ওঁরা মেজরিটি সেখানে ওঁরা চান মেজরিটির সুখ-সুবিধা। যেখানে ওঁরা মাইনরিটি সেখানে ওঁরা চান মাইনরিটির সেফগার্ড। হেডস্, আই উইন। টেলস্, ইউ লুজ। কারণ? কারণ তাঁরা মুসলমান।"

দীপিকাদি সুধান, "কিন্তু আপনিও তো মুসলমান।"

"আমি নিজের পায়েই দাঁড়িয়েছি, মুসলমান হিসাবে কিছু চাইনি বা পাইনি। কংগ্রেসের কাছেও না, ইংরেজের কাছেও না।" মীর সাহেব উত্তর দেন। "মুসলমান হিসাবে কিছু চাওয়া উচিত নয়, পাওয়া গৌরবের নয়। কিন্তু মুসলমান বলেই যদি একজন গুণী ব্যক্তিকে তার উচিত পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে আমি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব, তাতে ফল না হলে প্রতিরোধ করব। কারো উপর যেন তার ধর্মের দরুন অবিচার বা অত্যাচার করা না হয়। এক্ষেত্রে হিন্দুদেরও দোষ আছে। না থাকলে বাঙালীতে বাঙালীতে এমন মসীযুদ্ধ বেধে যেত না। কর্পোরেশনে, ইউনিভার্সিটিতে স্বরাজ বলতে বোঝায় হিন্দুরাজ। তাকে বর্ণ হিন্দুরাজ বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। ওয়ার্কিং মডেল অভ্ স্বরাজ দেখে যদি মুসলমানদের মনে সংশয় জাগে যে সারা ভারতেও স্বরাজ বলতে বোঝাবে বর্ণ হিন্দুরাজ তা হলে তাদের সংশয় দূর করা সহজ নয়। তারা ভাবে ভাগ বাঁটোয়ারার পথই এর সমাধানের পথ। সেই পথ ধরে চললে সমাধানের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে দেশ ভাগ প্রদেশ ভাগ। কিন্তু পাকিস্তানেও কি হিন্দু থাকবে না, হিন্দুস্থানেও কি মুসলমান

থাকবে না? যে যার পাওনা দাবী করবে না? না পেলে সেও তো প্রতিবাদ করবে, তাতে ফল না হলে প্রতিরোধ করবে। হিন্দুরাজের পাল্টা মুসলিম রাজ নয়। লোকে বলবে এর চেয়ে ব্রিটিশ রাজ ছিল ভালো। ওরাই মোটের উপর ন্যায়বিচার করত। এমন এক রাষ্ট্রের পত্তন করতে হবে যার হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি বা ভেদনীতি নেই, যে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। নামে নয়, কামে। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইংরেজ আমলই তার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ। ওরা খ্রীস্টান বলে এ দেশ শাসন করেনি, তা হলে তো আমরা বলতুম খ্রীস্টান আমল। করেছে ইংরেজ বলে। ওদের দলে বিস্তর ইহুদী। খোদ বড়লাট লর্ড রেডিং। ওদের যেটা দোষ সেটা ধর্মগত নয়, চর্মগত। তুমি যদি নৈকষ্য শ্বেতাঙ্গ না হও তা হলে উচ্চতম পদ কোনোকালেই পাবে না, যতই যোগ্য হও না কেন। ওদের চোখে হিন্দু মুসলমান সমান কালো। ভারতীয় খ্রীস্টানও কম কালো নয়। ওদের সঙ্গে বিরোধটার মূলে বর্ণবৈষম্য। এই কলকাতা শহরেই এমন কয়েকটা ক্লাব আছে যেখানে মেম্বর হতে হলে একজন দেশীয় খ্রীস্টানেরও ধর্ম যথেষ্ট নয়, কর্ম যথেষ্ট নয়, চর্ম শ্বেতবর্ণ হওয়া চাই। তবে তিনি বাবুর্চি খানসামা বেয়ারা হতে পারেন। ভাগ্যবান হলে অতিথিও হতে পারেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী এই বৈষম্যের তীব্রতা সর্ব স্তরে অনুভব করেন। তার প্রতিকার খুঁজতে গিয়েই তিনি হন সত্যাগ্রহী। সেইসূত্রেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নেতা হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের মন্দ ছাড়া ভালো দেখছেন না। এটাও একটা পরিবর্ধিত দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে একদল শ্বেতাঙ্গের মুঠোয়। বিশেষ করে আর্মিতে। তাঁর মতে সেটা আর্মি অভ্ অকুপেশন। তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে হিন্দু মুসলিম শিখ সৈন্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়।”

কংগ্রেস যেটি করবে লীগ তার উল্টোটি করবে। এটাই তো রেওয়াজ। কংগ্রেস কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে যাচ্ছে, সুতরাং লীগ যাচ্ছে না। যেহেতু কংগ্রেসের নতুন প্রেসিডেন্ট নেহরু জানান কংগ্রেস আগে থেকে কোনো স্কীম মেনে নেয়নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানিয়েছেন যে নেহরুর উক্তি তাঁদের দ্বারা অসমর্থিত। জিন্না কিন্তু কংগ্রেসকেই দায়ী করেন।

কংগ্রেস যখন ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিচ্ছে না তখন উল্টোটি করার জন্যে লীগের তো যোগ দেওয়াই উচিত। লীগ যাবার জন্যে তৈরি, এমন

সময় বড়লাট ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন স্থগিত রেখে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। এটার অর্থ কংগ্রেস যদি না থাকে লীগও থাকবে না। কী অপমান! জিন্না বলেন বড়লাট লীগকে কথা দিয়ে কথা রাখেননি। বড়লাট বলেন তিনি অমন কোনো কথা দেননি। জিন্না তাঁর কথার ভুল অর্থ করেছেন। জিন্না তা স্বীকার করেন না। তখন বড়লাটের সঙ্গে আড়ি।

কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে কংগ্রেস যায়, যাক, খোলা মাঠে গোল করুক। কিন্তু লীগ যাবে না। আর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যাবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। সেখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। লীগ তা হলে কী করবে? ওয়েটিং রুমে বসে অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না ট্রেন আসে, কংগ্রেস ওঠে, তার সঙ্গে একজন কংগ্রেস মুসলিমও ওঠেন। হিন্দুর স্টুজ। না, লীগ উঠবে না। ওয়েটিং রুমে বসে থাকা বৃথা। বড়লাটকে বিশ্বাস নেই, লেবার গভর্নমেণ্টকে বিশ্বাস নেই। অসহযোগ। টাইটেল বর্জন। আরো অনেক কিছু।

মীর সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হয়। এবার তাঁর ওখানেই।

"যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই হলো। লাহোর প্রস্তাবের পর বোম্বাই প্রস্তাব মুসলিম লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। লাহোরে স্থির হয়ে যায় তার উদ্দেশ্য পাকিস্তান অর্জন। বোম্বাইয়ে স্থির হলো উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন। উদ্দেশ্য আর উপায় দুটোই স্থির।" তিনি বলেন।

"কাগজে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।" স্বপনদা জানতে চান, "কবে থেকে শুরু? দিন ধার্য হয়েছে?"

"শুনছি ১৬ই আগস্ট।" মীর সাহেব যতদূর জানেন।

"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় সুহরাবর্দী সাহেব এসব বেআইনী কার্যকলাপ চলতে দেবেন? আফটার অল, তিনি একজন ব্যারিস্টার।" স্বপনদা বলেন।

"হো হো! আপনি আবার সেই কথা বলছেন। ব্যারিস্টার তো জিন্না সাহেবও। শহীদ পড়ে গেছে দোটানায়। শ্যাম রাখি না কুল রাখি? লীগ রাখি না উজিরি রাখি? লীগ ছাড়লে উজিরীও ছাড়তে হয়। নয়তো পার্টিই ওকে তাড়াবে। আর উজিরী ছাড়লে রাজনীতিও ছাড়তে হবে। সেটা ওর পক্ষে আত্মহত্যা।" মীর সাহেব গম্ভীরভাবে বলেন। "আর তাতে লাভটা কী হবে? শহীদের জায়গায় বড় উজীর হবেন সার নাজিমউদ্দীন। এখন মিস্টার নাজিমউদ্দীন। তিনিও তো ব্যারিস্টার। হা হা!"

স্বপনদা শুনে ব্যথিত হন যে প্রধানমন্ত্রীই বেআইনী কার্যকলাপ চলতে দেবেন সরকারী ছত্রছায়ায়। যদিও তিনি একজন ব্যারিস্টার। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত। সেখানে বেশ নাম করেছিলেন। প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবারে জন্ম।

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি ওঁর দোটানার কারণ। এই সেদিন প্রথম বার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। ভোগ যথেষ্ট হয়নি।" স্বপনদা নরম হন।

বড়লাট এতদিন চিন্তা করছিলেন কী করে বন্ধ তালা খোলা যায়। তিনি নতুন এক প্রস্তাব পাঠান। কংগ্রেস যাকে চায় তাকে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য মনোনয়ন করতে পারে. কংগ্রেসের সেই অধিকারে লীগ হস্তক্ষেপ করবে না। তেমনি, লীগ যাকে চায় তাকে সদস্য মনোনয়ন করতে পাবে, কংগ্রেসও লীগের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর সব আগের মতো থাকবে।

কংগ্রেস সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ও ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগদানের সম্মতি জানায়। কিন্তু লীগ তার বিপরীতটি করে। জিন্না বড়লাটকে জানিয়ে দেন যে কংগ্রেস যদি একজন মুসলিম মনোনয়ন করে তবে লীগ তাঁর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে না। বড়লাট আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখেন না। নেহরুকে আমন্ত্রণ করে গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার দেন। নেহরু যাবেন প্রথমে জিন্নার কাছে যোগদানের অনুরোধ করতে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া হয় তো সেই অনুসারে গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে। নয়তো লীগের জন্যে কয়েকটা আসন শূন্য রেখে নেহরু তাঁর ইচ্ছামতো গভর্নমেণ্ট গঠন করবেন।

নেহরু জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অটল অনড়। কংগ্রেস মুসলিমকে নিলে লীগ মুসলিম আসবে না। লীগের সম্মতি পেতে হলে কংগ্রেস মুসলিমকে বর্জন করতে হবে। নেহরু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন ও বড়লাটকে জানান। তখন কাকে কাকে নেওয়া হবে স্থির করার জন্যে সময় নেন। ইতিমধ্যে ১৬ই আগস্ট এসে পড়ে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে।

মুসলিম লীগ এই দিবসটির জন্যে তোড়জোড় করছিল। নাজিমউদ্দীনের 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া' দৈনিকপত্রে কলকাতার কর্মসূচী প্রকাশ করা কয়েকদিন আগে থেকে শুরু হয়। মীর সাহেব একদিন একখানা কপি নিয়ে স্বপনদাকে দেখাতে যান। বলেন, "গুপ্ত সাহেব, চার বছর বাদে হতে যাচ্ছে একটা অশুভ অধ্যায়ের সূচনা। এরা কেউ ইংরেজের গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে

না, গুন্ডীর ভয় আছে। কিংবা তার সম্পত্তির গায়ে হাত দিতে। জেলের ভয় আছে। হিন্দুর উপরেই, শিখের উপরেও। এঁরা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যাচ্ছেন। হিন্দু ও শিখ ঠাওরাবে সব মুসলমানই এর জন্যে দায়ী। কে যে লীগপন্থী, কে যে নয় তা গণনা করবে না। বহু নিরীহ মুসলমান মার খাবে, মরবে। শহীদকেও হিন্দুরা বিশ্বাস করবে না। অর্ধেক বাঙালীকে অর্ধেক বাঙালীর গায়ে লেলিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর বদনাম হবে। তাঁর মানে মানে পদত্যাগ করা উচিত। নয়তো গভর্নর তাঁকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হবেন। গভর্নর শাসনভার স্বহস্তে নেবেন। সে এক কেলেঙ্কারি। নাজিমউদ্দীনের কী! তাঁর তো কিছু হারাবার নেই। গভর্নর যে তাঁকে ডেকে নিয়ে গদীতে বসাবেন সেটা নির্বোধের প্রত্যাশা। যদি না তিনি এ আন্দোলন থামিয়ে দিতে পারেন। সেটুকু সৎসাহস কি তাঁর আছে? তিনি যে জিন্না সাহেবের পরম অনুগত সেবক। আমি যে অশান্তি বোধ করছি তা কী করে প্রকাশ করব? হিন্দুরা হয়তো আমাকেও দোষ দেবেন, আমি কেন ডাইরেক্ট অ্যাকশনবিরোধী স্টেটমেণ্ট দিয়ে মুসলমানদের নিবৃত্ত করিনি। আমি কেন নীরব। ধরে নেবে মৌন সম্মতিলক্ষণ। কিন্তু তা হলে যে আমাকে ঘোর বিপদে পড়তে হবে। আমার পরিবারকেও। ন্যাশনালিস্ট মুসলিমদের দু'দিক থেকেই বিপদ। হয় রামে মারবে, নয় রাবণে মারবে। আমরা মারীচ কুরঙ্গ।"

স্বপনদা তাঁকে অভয় দেন। "না, না, ইংরেজ থাকতে অমন কোনো মারামারি হতে দেবে না। গভর্নর আছেন কী করতে? বড়লাট আছেন কী করতে? পুলিশের আনুগত্য তাঁদেরই কাছে। বেশী বাড়াবাড়ি হলে আর্মি আসবে। আর্মির আনুগত্যও তাঁদেরই কাছে। জিন্না, লিয়াকৎ, শহীদ, এঁরা সবাই ব্যারিস্টার। এঁরা কখনো আইন হাতে নেবেন না।"

"কেন? গান্ধী, নেহরু, পাটেলও কি ব্যারিস্টার নন? ওঁরাই তো পথ দেখিয়েছেন। জিন্না দেখছেন কংগ্রেসকে অনুসরণ করলেই তিনি তাঁর সাধের পাকিস্তান পাবেন। তবে তিনি অহিংসার ধার ধারেন না। মুসলিম লীগের গর্ব সে হিংসায় বিশ্বাস করে। জিন্না বিপক্ষের সবাইকেই শাসিয়েছেন যে তার হাতেও পিস্তল আছে। কথা হচ্ছে পিস্তল বলতে যদি ভায়োলেন্স বোঝায় আর বিপক্ষ বলতে যদি ব্রিটিশ সরকার বোঝায় তবে তিতুমীরের এই অভিযান ব্যর্থ হবে। তবে কি হিন্দু বোঝায়? সেইটেই আমার আশঙ্কা। এটা

নামে আইন অমান্য, অসলে মারদাঙ্গা। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এই ওদের স্লোগান।"

দীপিকাদি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "ওরা ভেবেছে কী? লড়াই কখনো একতরফা হয়? আরো একটা তরফ থাকে। সেই আরেক তরফ যদি ইংরেজ হয়ে থাকে আমাদের কিছু বলবার নেই। ইংরেজকে যেই হোক একজন তাড়ালেই হলো। আমি বরং মনে মনে তিতু মীরের সাফল্য কামনা করব। কিন্তু তিনি যদি হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে হিন্দুরাও দেখিয়ে দেবে যে তাদের হাতে পিস্তল নয় স্টেন গান আছে। ইংরেজ যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে জিৎ হবে হিন্দুদেরই।"

মীর সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, "সেটা তো যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো প্রমাণিত হয়নি। এবার হতেও পারে, না হতেও পারে। মুসলমানদের ধারণা এক একজন মুসলমান সৈনিক তিন তিনজন হিন্দু সৈনিকের সমান।"

দীপিকাদি গর্জে ওঠেন, "আরবরাও তো ভেবেছিল স্পেনে তাদের রাজত্ব আবহমানকাল বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু আটশো বছর রাজত্বের পরে তারা স্পেন থেকে নির্মূল হয়। পড়ে থাকে কয়েকটি অতি সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন। তাজমহলের মতোই অপূর্ব। আর মোতি মসজিদের মতোই অমূল্য। আমরা সেগুলি সযত্নে রক্ষা করব। কিন্তু লড়াইতে জিতলে লীগপন্থী আরবদের আমাদের স্পেন থেকে সমূলে উচ্ছেদ করব।"

মীর সাহেব ব্যথা পান। বলেন, "আর লড়াইতে হারলে?"

"হারতেই প্যারিনে। হিন্দু আর শিখ শৈন্যসংখ্যা মুসলিম সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশী। আমাদের দিকে গুর্খারাও থাকবে। তারা একাই একশো। জানেন ভিক্টোরিয়া ক্রস কারা সব চেয়ে বেশী পেয়েছে? যারা জার্মানীতে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছে, আফ্রিকায় গিয়ে ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে, মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে তুর্কদের সঙ্গে লড়েছিল তারা পারবে না পাঞ্জাবী মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে? তা ছাড়া পাঠানরা আমাদের বিপক্ষে নয়।"

মীর সাহেব ওঠেন। "এ লড়াই কিন্তু সৈনিকে সৈনিকে নয়। ইংরেজ সরকারের অফিসারদের হুকুম না পেলে ওরা লড়বে না। এ লড়াই গুণ্ডায় গুণ্ডায়। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষও তাদের হাতে মরবে। তবে ইংরেজ চলে গেলে সৈনিকে সৈনিকে বাধতে পারে। ফলাফল অনিশ্চিত। কংগ্রেস কি সে ঝুঁকি নেবে?"

দীপিকাদি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় সেদিন শুতে যান। স্বপনদার সেদিকে নজর ছিলো না। তিনি কতকটা আপন মনে বলে যান, "মুসলমানরা ফ্লেশ অভ মাই ফ্লেশ, ব্লাড অভ মাই ব্লাড। ওদের সঙ্গে কি আমি লড়তে পারি? আর ইংরেজদের সঙ্গে আমার অ্যাফিনিটি যে একজন প্রিয়জনের মতো। তাদের সঙ্গেও কি আমি ঝগড়া করতে পারি? বিশেষত ওরা যখন আপনা থেকেই যাচ্ছে।"

দীপিকাদি ফেটে পড়েন। "তুমিও একজন প্রচ্ছন মুসলমান ও প্রচ্ছন্ন ইংরেজ। তোমার মতো ম্লেচ্ছ ও যবনের সঙ্গে শুলে আমার পাপ হবে। আমি ভারতীয় আর্য নারী। তোমাকে বিয়ে করা একটা হিমালয়ান ব্লাণ্ডার। বিলকুল ভুল। চললুম আমি ও ঘরে শুতে।"

স্বপনদা তো হতভম্ব। বলেন, "যা বলবার তা বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় বল। ইংরেজী আর ফার্সীর ফোড়ন দিচ্ছ কেন? ওসব তো ম্লেছ ও যবনদের বুলি।"

"তা হলে কী বলব? হিমালয়সদৃশ প্রমাদ। সম্পূর্ণ ভ্রম।" দীপিকাদি একটু অপ্রস্তুত হয়ে আবার শুয়ে পড়েন।

"রানু, তুমি কি জানো আমি কখনো স্বীকার করিনি যে, East is East and West is West and never the twain shall meet, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনই আমার ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব পত্তনের উদ্দেশ্য। সেই ক্লাবেই তোমার সঙ্গে আমার চার চোখের মিলন। সেই সুবাদে তোমার সঙ্গে আমার জীবনের মিলন। তেমনি, আমি কখনো মেনে নিইনি যে, হিন্দু হচ্ছে হিন্দু আর মুসলমান হচ্ছে মুসলমান, কখনো এদের মিলন হবে না। তা হলে তো ভারতীয় জাতির অস্তিত্বই থাকে না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটা মায়া। আমরা মায়ামৃগের পাশ্চাতে ছুটেছি। জিন্নাই ঠিক আর গান্ধী, নেহরু ও সুভাষ বেঠিক। আমার কথা যদি বল আমি প্রচ্ছন্ন মুসলমান, প্রচ্ছন্ন খ্রীস্টান তথা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। একই কালে আমি প্রচ্ছন্ন ইংরেজ, প্রচ্ছন্ন ফরাসী তথা প্রচ্ছন্ন জার্মান। আমার বোমদের কথা সত্য হলে আমি এদেশের টুর্গেনিভ, তাই প্রচ্ছন্ন রাশিয়ান।" স্বপনদা বলেন আবেগভরে।

"বুঝেছি, তুমি একটি বহুরূপী। তুমি হিন্দুও নও, ভারতীয়ও নও. তোমার সঙ্গে শোওয়া আর নয়। তোমার তাতে কষ্ট হবে না। তুমি স্বপ্নে বরনারী সঙ্গ পাবে। বরনারী কেন, পরনারী।" এই বলে দীপিকাদি দুম করে বিছানা থেকে নেমে দড়াম করে দরজা বন্ধ করেন। কুকুরটা

আটকা পড়ে কুঁই কুঁই করে। তখন দরজা খুলে সেটাকেও নিয়ে যান। উর্বশীর মেষ।

স্বপনদা চেঁচিয়ে বলেন, "উর্বশী, উর্বশী, ফিরে এস।"

দীপিকাদি বলেন, "গুড নাইট। শুভরাত্রি। কাল দেখা হবে।"

পরের দিন আবার সদ্‌ভাব। কিন্তু রাতের বিছানা যায় যার ঘরে। দীপিকাদি শুভরাত্রি জানিয়ে বলেন, "স্বপনমোহন, তুমি তোমার স্বপন দেখ। তেল আর জল মিশ খেয়েছে। কালো আর ধলো ভেদ ভুলেছে। মায়ামৃগ ধরা পড়েছে। ওদিকে একটা শো-ডাউনের তোড়জোড় চলেছে। আচ্ছা, শো-ডাউন কথাটার বাংলা কী?"

স্বপনদা রসিকতা করেন, "শো মানে শোও। ডাউন মানে নিচে। স্ত্রীরা স্বামীদের নিচে শোয়। প্রকৃতির বিধান।" দীপিকাদি রাঙা মুখে পালান।

॥ একুশ ॥

সুকুমার সপরিবারে বিলেত ফিরে যাবার সময় যে চিঠি লিখেছিল তার জবাবে মানস বলেছিল, "ভালোই করেছ। দেশটা এখন একটা আগ্নেয়গিরি। যে কোনো দিন লাভাবর্ষণ শুরু হতে পারে। তার আগেই ইংরেজরা সরে পড়বে মনে হচ্ছে। এই তো সেদিন এই স্টেশনের শেষ ইংরেজটিও বদলী হয়ে গেলেন। পুলিশ সাহেব। তাঁর জায়গায় এলেন একজন মুসলমান। পূর্বপরিচিত। অসাম্প্রদায়িক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তেমনি অসাম্প্রদায়িক মুসলমান। কিন্তু আমাদের সকলেরই অগ্নিপরীক্ষার দিন আসবে, যেদিন পলিটিসিয়ানদের বিরোধ সম্পূর্ণ অমীমাংস্য হবে। এক উত্তরাধিকারী না দুই উত্তরাধিকারী এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হবে। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তাদের ডাক দিলে কেউ হাঁক দেবে, 'আল্লা হো আকবর', কেউ হাঁক দেবে, 'সৎ শ্রী অকাল', আবার কেউ হাঁক দেবে, 'দুর্গামাতা কী জয়।' একজনও হাঁক দেবে না, 'বন্দে মাতরম্' বা 'ভারতমাতা কী জয়।' জানো তো, গতবার যুদ্ধে যাবার সময় এরা কেউ দেশের নামে প্রাণ দিতে যায়নি। রাজার নামেও নয়। রাজার প্রতি আনুগত্যের স্থান নিয়েছে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। বিপ্লববাদিনী

মধুমালতী আর সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে এখন সিপাহীদের উপর শেষ ভরসা রেখেছেন। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাবার আগে যদি উত্তরাধিকারী কারা হবে এই প্রশ্নের সর্বসম্মত মীমাংসা না করে যায় তবে ধর্ম অনুসারে বিভক্ত সিপাহীরা পরস্পরের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করে এর একটা ধর্মসম্মত মীমাংসা করবে। ভারত স্বাধীনও হবে, বিভক্তও হবে। মধুমালতী কি এ রকম একটা সমাধান চান? কেন তবে সিপাহীবিদ্রোহের স্বপ্ন দেখছেন? শুধু তিনি নন, বামপন্থীদের অনেকেই। জনগণকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেননি, সেই অভাব পূরণ করতে চাইছেন জওয়ানগণকে সঙ্গে নিয়ে। নৌসেনাবিদ্রোহ তারই প্রথম ধাপ। মধুমালতী ঘটনাচক্রে সেই ধাপে পা দেন। পা ভুল জায়গায় ফেলেছিলেন। ফিরে গিয়ে ভালোই করেছেন।"

এর উত্তরে সুকুমার এক লম্বা চিঠি লেখে। তার সঙ্গে গোঁজা ছিল একটা ছোট চিঠি। মিলি লিখেছে যূথিকাকে। "ছ'বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে দেখি আমি আর একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল। বিদেশই আমার কাছে দেশ, দেশ আমার কাছে বিদেশ। ভুল ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তবে একটা বিষয়ে আমি ভুল করিনি। লক্ষ করেছি ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। আর কংগ্রেসওয়ালারা গদী ছাড়বে, তবু মুসলমানদের ছাড়বে না। কংগ্রেস নেতারা একজন মুসলিমকে সঙ্গে না নিয়ে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে আসবেন না। বরং ওয়েভেলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন। ওয়েভেলের এর পরে কর্তব্য কী? জিন্নাকে কথা দিয়ে কথা না রাখা? জিন্না সেই অভিযোগই করেছেন। কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করা? ওয়েভেল সেই পন্থাই ধরেছেন। এটা তৃতীয় পন্থা। কিন্তু এ পথে কারো সঙ্গেই মিটমাট হতে পারে না। তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই থাকবে। সকলেই বলাবলি করছে এবার কংগ্রেস করবে কী? গণ সত্যাগ্রহ? লীগ করবে কী? গণ হত্যাগ্রহ? রাজদ্রোহ নয়। সেটা তার ইংরেজ মিতারা বরদাস্ত করবেন না। বেড়াল তা হলে কোন্‌দিকে ঝাঁপ দেবে? জানো তো ভিতরের খবর দিয়ো। জুলি তো তার বরকে নিয়ে মেতে আছে। তা ওরা সুখী হোক। রণকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। সে কেবল দাদু দিদুর কথাই বলছে। তাঁদের খুঁজছে।"

মিলির চিঠি যূথিকাকে দিয়ে মানস সুকুমারের চিঠি পড়তে বসে।

সুকুমার লিখেছে, "জাহাজে এবার বিষম ভিড়। সাহেব মেমসাহেব

বোঝাই। আমরা ক'জন কালা আদমী একেবারে কোণঠাসা। আলাদা একটা ডাইনিং টেবিলে দ্বীপান্তরিত। আমাদের মুখোমুখি যাঁদের আসন তাঁরা এক গুজরাটী মুসলিম দম্পতি। সুলেমান সোমজী ও আয়েশা সোমজী। আমরা তখন ধর্মসচেতন নই, চর্মসচেতন। ইংরেজীতেই কথাবার্তা চালাতে হয়, তাই বেপরোয়াভাবে সাহেবলোকের বর্ণবিদ্বেষের নিন্দাবাদ করতে পারিনে। বরং একটু অনুকম্পা বোধ করি। আহা, বেচারিরা ছ'সাত বছর পরে দেশে ফিরছে। ডেকে যখন বেড়াই একসঙ্গে বেড়াই। সেইসূত্রে মনের কথা খুলে বলি। ওঁরা মধ্যবয়সী। যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্যে লণ্ডনে। মাস ছয়েক থাকবেন। ভদ্রলোক একটা গুজরাটী পত্রিকার সম্পাদক। সেটার কয়েক পাতা ইংরেজী।

বললেন, "গান্ধীও গুজরাটী, জিন্নাও গুজরাটী, বল্লভভাইও গুজরাটী, মুন্‌শীও গুজরাটী, আমিও গুজরাটী। আমরা পরস্পরের জ্ঞাতি। তা হলে দুই নেশন বলে দাবী করতে যাই কেন? মেজরিটি মাইনরিটি কোন্ দেশে নেই? তা বলে কি তারা দুই নেশন? এটা যুক্তিসহ নয়। তবু অর্থবহ। আসলে যা হয়েছে তা এই যে বৃদ্ধ বাদশাহ শাহ্ জাহান এখন মুমূর্ষু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে বেধে গেছে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। মোগলদের মধ্যে এমন কোনো নিয়ম ছিল না যে জ্যেষ্ঠপুত্রই হবে পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী, অন্যেরা হবে তাঁর অধীনস্থ অনধিকারী। এই নিয়ে প্রত্যেকবারই গোলমাল বাধে। এর নিষ্পত্তি হয় গায়ের জোরে। জোর যার মুলুক তার। শাহ্ জাহানের নিজের বেলাও তাই হয়েছিল। এখন আমাদের সামনেও আছে একই প্রশ্ন। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে ইংরেজরা চলে যাবার সময় ক্ষমতার হস্তান্তর করে যাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার মেজরিটির হাতে। মেজরিটি রুল একটা বিদেশী কনভেনশন। এদেশে সেটা প্রথাসিদ্ধ বা বিধিবদ্ধ হয়নি। কংগ্রেসকে আমরা একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে পারিনে। এ যুগের আওরংজেব এ যুগের দারাকে আপসে দিল্লী ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু দারাকেও আপসে কলকাতা আর লাহোর ছেড়ে দিতে হবে।

তা শুনে আমি চমকে উঠি। বলি, জানেন না, কলকাতা হচ্ছে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ডেন। বাঘের বাচ্চারা কেউ বা টেররিস্ট, কেউ বা কমিউনিস্ট। দারার কথায় আওরংজেবকে ওরা ওদের আস্তানা ছেড়ে দেবে কেন? উনি বলেন, ইংরেজরা যদি যাবার আগে এ্যাওয়ার্ড দিয়ে যায়? আমি

বলি, তা হলে প্রথম কামড় বসবে ইংরেজদেরই ঘাড়ে। ওদের রাজত্ব তো যাবেই, বাণিজ্যও যাবে। দ্বিতীয় চোট পড়বে লীগপন্থী মুসলমানদের গায়ে। ওঁরা কেমন করে রাজত্ব করে দেখে নেবে বামপন্থীরা। তিনি বলেন, এ তো বড়ো অন্যায়! আমরা গুজরাটী মুসলমানরা রাজ্য চাইনে, বাণিজ্য চাই। বোম্বাই হাতছাড়া হলে কলকাতাই হতো আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র। কলকাতা না থাকলে পাকিস্তান কাণা হয়ে যাবে। আমি বলি, তা হলে পার্টিশনের দাবী তুলে নিন। কোয়ালিশনের জন্যে চেষ্টা করুন।

ওদিকে আয়েশা বেগমের সঙ্গে মিলির খুব ভাব। বেগম বলছিলেন, লণ্ডনে আমরা মহামান্য আগা খানের অতিথি হব। তিনি আমাদের ধর্মগুরু। তাঁর অসংখ্য হিন্দু শিষ্য। তাদের কাছে তিনি বিষ্ণুর দশম অবতার। আমরা হিন্দুবিদ্বেষী নই।

লণ্ডনে ফিরে আমার প্রথম কাজ হলো ক্যাবিনেট মিশনের ভারত রওনা হবার মুখে ক্রিপসের অন্তরঙ্গ মহলে খোঁজ খবর নেওয়া। ওঁরা কি কোনোরকম এ্যাওয়ার্ড হাতে করে নিয়ে যাচ্ছেন? তাই যদি হয় কলকাতা কার ভাগে পড়বে? জানেন তো ওটা টেররিস্ট আর কমিউনিস্টদের আস্তানা। তারা সবাই বাঙালী হিন্দু। ওঁরা আমাকে আশ্বাস দিলেন মিশন এখনো মনঃস্থির করেননি, বিভিন্ন পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব দিক বিবেচনা করে তাঁদের এ্যাওয়ার্ড নয়, সুপারিশ ঘোষণা করবেন। এখন থেকে ও এখান থেকে বলতে পারা যায় না কী কী সুপারিশ। তবে ব্রিটিশ পলিসির সার কথা কী সেটা বলতে বাধা নেই। এককালে ব্রিটিশ পলিসি ছিল, র‍্যালি দ্য মডারেডটস। তার পরে হয়, র‍্যালি দ্য মুসলিমস। যুদ্ধের পর থেকে হয়েছে, র‍্যালি দ্য রাইটিস্টস। এখন সব চেয়ে বড়ো আপদ হয়েছে বামপন্থীরা। চন্দ্র বোস নেই, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণ আছেন। তাঁর পেছনে আছেন পণ্ডিত নেহরু। নেহরুর পিঠে চেপে রয়েছেন সিন্ধবাদ নাবিকের সেই বৃদ্ধ। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আর কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে চান না, অথচ ব্রিটেনের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে একমাত্র তারই হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করতেও অনিচ্ছুক। শেষপর্যন্ত হয়তো তাঁরা ক্ষমতার হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করবেন। তার পরে ভারত যদি এক থাকে তবে ভারত সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি দ্বিধা হয় তবে দুই সরকারের সঙ্গে সন্ধি, যদি তিন হয় তবে তিন সরকারের সঙ্গে সন্ধি। আমি বলি, তিন কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলেন, শিখদেরও আলাদা

একটা রাষ্ট্র থাকতে পারে। পাটিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা প্রভৃতি শিখ রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত জেলা জুড়ে জুড়ে শিখিস্থানও কি গড়ে উঠতে পারে না? শিখেরা পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে চাইবে কেন? আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে বাঙালী, অসমীয়া ও পাঞ্জাবী হিন্দুকেও পাকিস্তানের মাইনরিটি হতে বাধ্য করা হবে না। এসব সমস্যার মীমাংসার জন্যে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন ডাকা হবে। অ্যাসেম্বলীর তৈরি শাসনতন্ত্রই ব্রিটেন গ্রহণ করবে। যদি সর্বসম্মত হয়। মেজরিটির ভোটে মাইনরিটির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না। তা সে শিখ মাইনরিটিই, হোক আর মুসলিম মাইনরিটিই হোক, আর হিন্দু মাইনরিটিই হোক।

সুকুমার আরো লিখেছে, ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ কংগ্রেস তার আপত্তিসত্ত্বেও মেনে নিয়েছে দেখে প্রীত হয়েছি। এ না হলে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীই বসত না। কিন্তু বড়লাটের আপ্রাণ প্রয়াসসত্ত্বেও কংগ্রেস তাঁর ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে না শুনে মর্মাহত হয়েছি। আমার বাজীর ঘোড়া তো নেহরু। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী না হন তো আমিই বা কার ভরসায় চাকরির খোঁজে স্বদেশে ফিরব? একা মুসলিম লীগ যোগ দিয়ে আখের গুছিয়ে নেবে। কিন্তু শুনে অবাক হয়েছি যে বড়লাট ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন স্থগিত রেখে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করছেন, তাতে শুধু অফিসিয়ালরাই থাকছেন। খোঁজ নিয়ে শুনতে পাই তিনি জিন্নাকে ডিফেন্স আর লিয়াকৎ আলী খানকে হোম দিয়ে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে শিখদের ও কংগ্রেস সদস্যদের যোগদানের পথ রুদ্ধ করবেন না। তাঁদের জন্যে দুয়ার খোলা রাখাই তাঁর পলিসি। জিন্না বলছেন, বড়লাট তাঁকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছেন। বলবেনই তো। পারফিডিয়াস আলবিয়ন বলে একটা প্রবাদ আছে না? এখন তিনি কী করবেন? বিদায় করেছ যারে নয়নজলে আবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে?

ইতিমধ্যে যমুনা নদীর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। জিন্না সাহেব এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী ও ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট। শুধু তাই নয়, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছেন। আগস্ট মাসের দু'দিন আগে হলেও এই তাঁর আগস্ট প্রস্তাব। গান্ধীজীর আগস্ট প্রস্তাবের মতো এটাও বোম্বাইতে গৃহীত। কিন্তু কী আশ্চর্য! কেউ তাঁকে বা তাঁর ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করে নজরবন্দী করেনি।

উল্টে বড়লাট তাঁকে আবার আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু তাঁকে কংগ্রেস মুসলিমদের একজনকে বড়লাটের ক্যাবিনেটে নেওয়ার উপর ভীটো জারি করতে দেননি। এটা যে কেবল কংগ্রেসের উপরেই নিষেধাজ্ঞা তাই নয়, বড়লাটের উপরেও নিষেধাজ্ঞা। মুসলিম লীগ তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও কংগ্রেস না করেনি। কংগ্রেস মুসলিম লীগের উপর কোনোরকম ভীটো জারি করেনি। বড়লাট কংগ্রেসের নতুন সভাপতি জবাহরলাল নেহরুকে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার দেন, কিন্তু নিজে সাক্ষীগোপাল হতে নারাজ হন। তিনি ব্রিটিশ পার্লমেণ্টের কাছেই দায়ী থাকবেন, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে নয়। সে দায় কংগ্রেসের। লীগ থাকলে লীগেরও। মতবিরোধ বাধলে নেহরু সদলবলে পদত্যাগ করতে পারেন। বড়লাট তাঁকে ঢালা অনুমতি দিলেও জিন্নার সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেন। জিন্না যদি তাতে রাজী হন তা হলে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে। সেটাই বড়লাটের অন্বিষ্ট। আপাতত না হলেও পরে হয়তো সেটা সম্ভব। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করলেও মুসলিম লীগের সাত খুন মাফ।"

চিঠি দুটো পড়ে যুথিকা বলে, "আমি তো দেখছি ইংরেজদের আর ভারতশাসনে রুচি নেই। ওরা মানে মানে ক্ষমতার হস্তান্তর করে দেশে ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। তবে, হ্যাঁ, ভারতের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক পাতাতেও চায়। যাতে তাদের বাণিজ্যে হাত না পড়ে, যাতে তাদের শত্রুরা ভারতে এসে তাদের স্থান না নেয়। তারা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে কানু বিনে গীত নেই, কংগ্রেস বিনে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট নেই। এককভাবে মুসলিম লীগের সে কর্ম নয়। তাই কংগ্রেসের অবর্তমানে মুসলিম লীগকে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব দেয়নি। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসকেই তারই শর্তে দিতে হয়েছে। তার ভাগ থেকে একটি আসন সে একজন মুসলমানকে দিতে পারবে, বিশেষত যখন একটা প্রদেশ কংগ্রেস মুসলিমরাই শাসন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁদের কি কোনো প্রতিনিধি থাকতে মানা? মানা করছেন যিনি তাঁরই তো অনধিকার।"

মানস স্বীকার করে। "কিন্তু জিন্নার ধারণা মুসলিম ঐক্যের খাতিরে মুসলিম লীগকেই একমাত্র মুসলিম প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে। কংগ্রেস মুসলিমরা কুইসলিং। নরওয়ের নাৎসী সমর্থক কুইসলিংএর অনুরূপ। এই মহান সত্যটা চার্চিল হলে মেনে নিতেন, অ্যাটলী মানতে রাজী নন।

নেহরুকে বন্ধুরূপে পেতে হলে নেহরুর বন্ধুকেও বন্ধুরূপে পেতে হবে। মওলানা আজাদও নেহরুর মতো যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন, যদি গান্ধী বিমুখ না হতেন। আর ইউনিয়নিস্টরা তো অকৃপণ সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের কেমন করে কুইসলিং বলে গণ্য করা যায়? বড়লাট তাঁদের একজনকে একটা আসন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, জিন্নার আপত্তি থাকায় তিনি পেছিয়ে যান। নইলে এক বছর আগেই ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হতো। ইংরেজদের দিক থেকে অনিচ্ছা ছিল না, কংগ্রেসের দিক থেকে অনিচ্ছা ছিল না, ইউনিয়নিস্ট মুসলিমদের দিক থেকে অনিচ্ছা ছিল না। একমাত্র মুসলিম লীগের দিক থেকেই ছিল অলিখিত এক ভীটো। লেবার গভর্নমেণ্ট অস্বীকার করেছেন। এইটেই ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত কারণ। জিন্নার বোধ হয় ধারণা ছিল যে এবারেও তিনি বড়লাটকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। কিন্তু ঘটনার গতি বড়লাটকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের রদবদল জরুরি। ইউরোপীয় অফিসাররা ছ'সাত বছর হলো দেশে ফেরার অনুমতি পাননি। পাবেন পয়লা জানুয়ারি থেকে। স্ত্রীদের পাঠাতে আরম্ভ করেছেন, তাই জাহাজে এত ভিড়। ক্ষমতা হস্তান্তরের তাড়াহুড়ো ইউরোপীয়দের মধ্যেই বেশী। জিন্না সাহেব ডাইরেক্‌ট আকশনের হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু গান্ধীজী হুমকি না দিলেও সকলে জানে যে তিনি আবার গণ সত্যাগ্রহের ডাক দিতে পারেন। সেটা আরো মোক্ষম।"

যূথিকা তা শুনে তর্ক করে। কিন্তু ইংরেজ যদি স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়ে তবে আবার গণ সত্যাগ্রহের কী প্রয়োজন? সঙ্গে সঙ্গে যদি গৃহযুদ্ধ বেধে যায় গণ সত্যাগ্রহ কোন কাজে লাগবে? দেখতে দেখতে সেটা গণ হত্যাগ্রহে পরিণত হবে। তখন তাকে থামানোই দায়। তাতে মুসলিম লীগেরই সুবিধে। হিন্দুদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা যদি মরে মুসলিম জওয়ানরাও যুদ্ধে নামবে। শহরকে শহর লুট করবে, পুড়িয়ে দেবে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রাণ নিয়ে পালাবে। তখন সেই সব ছেড়ে আসা জায়গা নিয়ে পাকিস্তান হবে। অহিংসা দিয়ে তা রোধ করতে পারা যাবে না। সারা দেশে একশো জন সত্যিকার অহিংসাবাদী আছেন কি-না সন্দেহ। সৌম্যদা পর্যন্ত ডাইনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়েছেন। মানুষ মরেনি, এই তাঁর সাফাই। যারা রেল স্টেশন পুড়িয়েছে তারাও তো সেই সাফাই দেবে। না, এক মুঠো সত্যিকার সত্যাগ্রহীকে নিয়ে গণ সত্যাগ্রহ হয় না। ইণ্ডিয়ান আর্মিকে ইংরেজদের হাত

থেকে নিজেদের হাতে নিতে হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে এই বোঝায়। মুসলিম রেজিমেণ্টগুলো কংগ্রেসের হাতে পড়তে রাজী হবে না, তারা লীগকেই পছন্দ করবে। শিখ রেজিমেণ্টগুলোর বোধহয় শিখিস্থানের উপর ঝোঁক। সময় এসেছে রিয়ালিস্ট হবার। ইংরেজের সঙ্গে আপস করতেই হবে। কিন্তু মানে মানে আপস। অ্যাটলী কংগ্রেসের মুখ রেখেছেন, লীগের মুখ রাখেননি। তাই লীগ ক্ষেপেছে। কিন্তু ইঙ্গ-কঙ্গ এক হলে রণে ভঙ্গ দেবে। কী ভাগ্য লেবার ক্ষমতায় এসেছে! সূর্যের আলো থাকতে ঘর ছেয়ে নাও। চার্চিল ফিরে এলে পশতাবে! পাঁচ বছর পরে লেবার থাকবে কি-না কে বলতে পারে! আরো আগেই যাবে, যদি আবার যুদ্ধ বেধে যায়। বার্লিন নিয়ে বাধতে পারে।"

একেই বলে কান্তাসম্মিত। মানস হাসে, "এই প্রথম শুনছি যে তুমি আপসের পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে আপস তো মুসলিম লীগের সঙ্গেও আপস। লীগ মুখে যাই বলুক তার পিস্তল একজন ইংরেজেরও গায়ে লাগবে না। লাগলে লাগবে শত শত হিন্দুর গায়ে। হ্যাঁ, জিন্না বলছেন তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। তিনি আর কনস্টিটিউশনাল উপায়ে আন্দোলন করবেন না। গৃহযুদ্ধ বাধাবেন। গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্যে তাঁকে আপসে কতক জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে। আর নয়তো লিঙ্কনের মতো এস্পার কি ওস্পার না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে। সে দায়িত্ব কংগ্রেস নেবে না। সে সত্যাগ্রহই শিখেছে, হত্যাগ্রহ শেখেনি। চরিত্রও হারাবে, যুদ্ধেও হারতে পারে। ওদেশ ছিল স্বাধীন দেশ, এদেশ তা নয়?"

দিনকয়েক পর খাদি কর্মী বঙ্কিম কর দেখা করতে আসেন। বলেন, "সৌম্যদার বার্তাবহ হয়ে এসেছি। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ওদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। ও দফায় দফায় নিমন্ত্রণ করছে ওর পুরনো সহকর্মীদের। উদ্দেশ্য বৌদির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উনি তো গান্ধীমার্গে নবীন আগন্তুক। আমরা কারা, কী আমাদের সাধনা, কেন সত্যাগ্রহ, গঠনকর্মের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বৌদিকে খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তাঁকে বোঝাতে হচ্ছে বীরত্বের আরো একরকম অর্থ আছে। অন্যায়ের যে প্রতিরোধ করে, অথচ করতে গিয়ে নিজে অন্যায় করে না, সেও একজন বীর পুরুষ বা বীরাঙ্গনা। গত পঁচিশ বছরে আমি বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি। এক এক করে বিবরণ দিই। বৌদি আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। তার পর

সৌম্যদার সঙ্গেও তাত্ত্বিক আলোচনা চলে। আমরাও একজাতের ডায়ালেকটিকসে বিশ্বাস করি। ডায়ালেকটিকাল ননভায়োলেন্স। এইসব নিয়ে দিন সাতেক কেটে যায়। বাঃ! চিঠিখানাই দিতে ভুলে গেছি। এই নিন।"

মানস চিঠিখানা খুলে পড়ে। সৌম্যদা লিখেছে, "আমাদের খবর বঙ্কিমের মুখে শুনবে। আমরা নতুন বাসায় এসে নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। কিন্তু সামনে আসছে এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। এত বড়ো চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে আর আসেনি। জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কথা বলছি। উনি নাকি নিজেই বলেছেন যে ওটা কেবল ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধে। এ তো বড়ো মজার কথা! কংগ্রেস কি জিন্না সাহেবকে আশা দিয়ে আশাভঙ্গ করেছে? কংগ্রেস তো চায়নি যে বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা কমুক। তাদের সংখ্যা কমেওনি। নিজের সদস্যদের একজন হিন্দু না হয়ে মুসলিম হোন এটাই তার অনুরোধ। বড়লাট তার অনুরোধ রক্ষা করেননি বলে কংগ্রেস ওঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কংগ্রেস কী করে জানবে যে বড়লাট মুসলিম লীগকে গভর্নমেণ্ট গঠনের ভার না দিয়ে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করবেন? এটাই বা কী করে সে জানবে যে তার একজন মুসলিম কর্মীকে নিজের ভাগের একটি আসন দেবার অধিকার তার আছে এটা বড়লাট তাঁর পরবর্তী প্রস্তাবে মেনে নেবেন? এর ফলে বড়লাটের শাসন পরিষদে মুসলমান সংখ্যাই তো একটি বেড়ে গেল। হিন্দু সংখ্যা তো একটি কমে গেল। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা সমান সমান হলো। অন্যায়টা হলো কোথায় ও কার প্রতি? মুসলমানরা সম্প্রদায়ই হোক আর নেশনই হোক তাদের প্রতি বড়লাট বা কংগ্রেস কেউ কোনো অন্যায় করেননি। কিন্তু মুসলিম লীগ যদি দ্বিমুখী ডাইরেক্ট অ্যাকশন চালায় তবে ইংরেজ ও হিন্দু উভয়েরই বিপদ। যদি না অহিংসা পালিত হয়। এঁরা যদি একই মুদ্রায় শোধ দেন তবে দুই পক্ষেই অন্যায় হবে। আমরা পড়ব মুশকিলে। সত্যাগ্রহ বলতে এতদিন আমরা বুঝেছি একপক্ষে অন্যায় ও অপর পক্ষে ন্যায়। আমরা ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছি। এবার সম্ভবত হবে দুই পক্ষেই অন্যায়। দুই পক্ষেই বহু নিরীহ মানুষ হতাহত হবে। আমরা তবে কোন্ পক্ষে দাঁড়াব? কোনো পক্ষেই না। আমাদের কর্তব্য হবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়কে থামানো ও থামাতে গিয়ে উভয়ের হাতে মার খাওয়া। হয়তো মার খেয়ে

মরা। বলা বাহুল্য আমরা আর ক'জন? এইটুকুতে কি গৃহযুদ্ধ থামবে? যেখানে ইংরেজরাও স্বীকার করছে যে কংগ্রেসের অধিকার আছে সেখানে ন্যায় তো কংগ্রেসেরই পক্ষে। কিন্তু হিংসার দুষ্ট বৃত্তে জড়িয়ে পড়লে অন্যায় দুই পক্ষেই হবে। হিংসার উত্তর অহিংসভাবেই দিতে হবে। সহিংসভাবে নয়। এ এক প্রাণান্তকর পরীক্ষা। আমরা এ পরীক্ষায় সফল না হলে গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যর্থ হবে। তিনি কি আর বাঁচতে চাইবেন?"

চিঠিখানা যূথিকার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মানস বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আলাপ করে। জিজ্ঞাসা করে জুলিকে তিনি কেমন দেখলেন।

"ঝি চাকর রাখেননি। নিজেই যাবতীয় গৃহকর্ম করেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, মেজে নিকোনো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তরকারি কোটা, রান্না-বান্না করা সমস্তই তাঁর একার কাজ। আশ্রমের কর্মশালায় গিয়ে সুতো কাটেন, কাপড় বোনেন, লঙ্গরখানায় গিয়ে পরিবেশন করেন, কারো অসুখ করলে সেবা করেন। আশ্রমে একটা লঙ্গরখানা আছে। নিখরচায় কর্মীরা সবাই দুপুরবেলা খেতে পায়। ডাল, ভাত, একটা ছকা, তার সঙ্গে চাটনি ও স্যালাড। পুরুষেরা সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। কী হিন্দু, কী মুসলমান। কী ব্রাহ্মণ, কী হরিজন। তেমনি মেয়েদের সবাই এক সারিতে। একটু তফাতে। পরিবেশনটা মেয়েরাই করে। রান্নাটা পুরুষেরা। সবাই স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকা। কামার আছে, কুমোর আছে, তাঁতী আছে, কাটুনী আছে, তেলী আছে। আর আছে ছুতোর মিস্ত্রি। তবে সৌম্যদার সহকর্মীরা অনেকে সরে পড়েছেন। তাঁদের কেউ বা এখন কমিউনিস্ট, কেউ বা নেতাজী ভক্ত, কেউ বা সাবারকর শিষ্য। কয়েকজন এখনো টিকে আছেন শত প্রলোভন ও নির্যাতন সত্ত্বেও। আশ্রমের কাজকর্ম সঙ্কুচিত হয়েছে। কয়েকটা বিভাগ উঠে গেছে।" বঙ্কিমবাবু দুঃখ করেন।

যূথিকা জানতে চায়, "জুলি কি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, ছেড়ে দেননি। কিন্তু ওঁর স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। হিংসা আর অহিংসা এদের মধ্যে মাত্র একটি অক্ষরের ব্যবধান। তবু তা গভীর ও দুস্তর। উনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন স্বামীর রাজনীতিকে নিজের রাজনীতি করতে। তবে ওঁর নিজেরও তো একটা সাধনা আছে। উনি চান একই পুরুষের বৌ হতে, বোন হতে, মা হতে, বান্ধবী হতে, প্রেমিকা হতে, সঙ্গিনী হতে। অথচ বিপ্লবের ভূত ওঁর ঘাড় থেকে নামছে না। উনি চান

ওঁর বন্ধু বাবলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে, চাষানীর সঙ্গে চাষানী, মজুরনীর সঙ্গে মজুরনী। অমনি করে শ্রেণীচ্যুত হয়ে বিপ্লব ঘটাতে। ওঁর মাথায় কি একটু ছিট আছে?" বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বলেন।

"শুধু ওর মাথায় কেন? ওর পতিদেবতার মাথায়ও।" যূথিকা খিল খিল করে হাসে। "উনি ভেবেছেন শহীদিয়ানা দিয়ে উনি হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করবেন। এদেশে চল্লিশ কোটি ভারতীয়, আর ইংরেজ মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার। চল্লিশ কোটি ইচ্ছা করলে চুয়াল্লিশ হাজারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। ইঙ্গ-ভারতীয় সমস্যা তো একটা সমস্যাই নয়। অপর পক্ষে হিন্দু মুসলিম সমস্যা একটা অমীমাংস্য সমস্যা। আমরা ওদের তাড়িয়ে দিতেও পারিনে, আপনার করতেও পারিনে, রাজা করতেও পারিনে, প্রজা করতেও পারিনে। ওরাও আমাদের তাড়াতেও পারে না, কনভার্ট করতেও পারে না, রাজা করতেও পারে না, প্রজা করতেও পারে না। সেই যে আরব আর তার উট তারই মতো ব্যাপার। আরব ছিল তার তাঁবুতে। কাঁপতে কাঁপতে উট এসে আশ্রয় চায়! প্রথমে ঢোকায় মুখ, তার পরে গলা, তার পরে সামনের দুটো পা, তার পরে ধড়, তার পরে পেছনের দুটো পা। আরব হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবু ছেড়ে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। তেমনি, এদেরও কি দাবীর অন্ত আছে? এক এক করে কত কা না পেয়েছে, এবার চায় পাকিস্তান। সেইখানেই কি ইতি? না, পরে একদিন বলবে, 'হিন্দুস্থান হামারা। ভাগো হিঁয়াসে। ইংরেজদের মতো আমরাও তাড়া খেয়ে পালাব। কিন্তু কোথায়? দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়তেই হবে একদিন না একদিন। সেদিন ক'জন অহিংস থাকতে পারবে, শহীদ হতে পারবে?"

বঙ্কিমবাবু নিরুত্তর। চা শেষ করে বিদায় নেন।

জিন্নার সঙ্গে জবাহরলালের সাক্ষাৎ নিষ্ফল হয়। এখন ষোলই আগস্টের প্রতীক্ষা। তার দু'দিন আগে দেবাদিদেব গুহ এসে গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসেন। মুখ ফুটে একটি কথাও বলেন না। শুধু একখানা খবরের কাগজ পড়তে দেন। তেরোই তারিখের 'স্টার অভ্ ইণ্ডিয়া'। খাজা নাজিমউদ্দীনের দৈনিকপত্র। তাতে ছিল 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' কেমন ভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ। শেষের দিকে কলকাতা জেলা মুসলিম লীগ সেক্রেটারির আবেদন:

"I appeal to the Musalmans of Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas to rise to the occasion and make the rally a unique success. We are in midst of the rainy season and the month of Ramazan fasting. But this is a month of real Jehad of God's grace and blessings, spiritual armament, and the moral and physical purge of the nation. It is a supreme occasion of our trial. Let Muslims brave the rains and all difficuties and make the Direct Action Day meeting a historic mass mobilisation of the Millat.

Muslims must remember that it was in Ramazan that the Quran was revealed. It was in the Ramazan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and Heathenism was fought and won by 313 Muslims and again it was in Ramazan that 10,000 under the Holy Prophet conquered Mecca and established the kingdom of Heaven and the commonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting the action in this holy month."

মানসও গম্ভীর মুখে কাগজখানা যূথিকার হাতে বাড়িয়ে দেয়। একটি কথাও বলে না। যূথিকার মুখও গম্ভীর। চারদিক নিঃশব্দ।

"তবে আসি।" গুহ্ ওঠেন। কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ভরেন। অনেক সাধাসাধির পর এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান।

মানস বলে যূথিকাকে, "এর শুরু কোথায় ও কবে তা তো জানা গেল। সারা কোথায় ও কবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। জিন্নাহ্‌ও জানেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে, কিন্তু মীমাংসা এর ফলে হবে না। মীমাংসার পথ এ নয়।"

"মীমাংসা কি ওরা সত্যি সত্যি চায় যে মীমাংসা হবে? ওরা চায় বল-পরীক্ষা। বেশ তাই হোক। হিন্দুরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে।" যূথিকা বলে দৃপ্ত কণ্ঠে।

॥ বাইশ ॥

মাস মোবিলাইজেশন ? বদরের লড়াই ? মক্কার যুদ্ধ ? এ কি সেই ধরনের যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব ? কার সঙ্গে কার যুদ্ধ ? হীদেনের সঙ্গে মুসলিমের ! হীদেন কারা ? ইংরেজরা নয় নিশ্চয়। এমনিতেই তারা মুষ্টিমেয়। তাদের বিরুদ্ধে মাস মোবিলাইজেশন যেন মশা মারতে কামান দাগা। তা ছাড়া তাদের হাতে যেসব মারাত্মক অস্ত্র আছে তা দিয়ে একশোটা জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায়। মিঞা সাহেবরা পলাশীর পুনরাবৃত্তি চাইবেন না। তা হলে এটা হিন্দুদেরই উপর আক্রমণের তোড়জোড়।

তাই যদি হয়ে থাকে বাংলার গভর্নর কী মনে করে ষোলই আগস্ট পাবলিক হলিডে ঘোষণা করলেন ? এটা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানদের কারো পরব নয়। রাজার জন্মদিন বা ব্যাঙ্কের হিসাবের দিনও নয়। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের এমন কী গুরুত্ব ? ওরা হরতাল করতে চায় তো করুক। আর-কেউ হরতাল করবে কেন ? কিন্তু পাবলিক হলিডে হলে সরকারী আপিস আদালতও বন্ধ থাকবে, সেটাও প্রকারান্তরে সর্বজনীন হরতাল। মানসের মতো অফিসারদেরও। সেদিনকার জন্যে যেসব মামলার শুনানি নির্দিষ্ট রয়েছে সেসব মুলতুবি রাখতে হবে। আরো একটা দিন খুঁজে বার করতে হবে। দায়রার মামলা দিনের পর দিন লাগাতর ভাবে চলে। শুক্রবারের বকেয়া মামলা শনিবার শুনতে হবে, শনিবারের বকেয়া মামলা সোমবার শুনতে হবে। সোমবার থেকে তো অন্য এক মামলা। একটা শেষ না হলে তো আরেকটা শুরু হতে পারে না। একটা দিন হঠাৎ বন্ধ হলে কত লোকের সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট ! সাক্ষী, আসামী, জুরি। আসামী যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তবে কেনই বা বেচারা জেলে আরেকদিন আটক থাকবে ? জুররদের কি নিজেদের কাজকর্ম নেই ? আর সাক্ষীরা কোথায় রাত কাটাবে ? এ ছাড়া উকীলদেরও অসুবিধে আছে।

গভর্নরকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি মন্ত্রীদের প্রত্যেকটি পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি পাবলিক ইণ্টারেস্ট দেখবেন। পাবলিক

বলতে শুধু মুসলিম পাবলিক বোঝায় না। এটা লীগ মন্ত্রীমণ্ডল। এঁদের ম্যাণ্ডেট পাকিস্তান হাসিল করা। আর পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভিন্ন আর কারো স্বার্থে নয়। অন্তত আর কেউ সেই দাবী নিয়ে নির্বাচনে নামে নি। গভর্নর হয়তো ইউরোপীয়দের নিরাপত্তার খাতিরে তাঁদেরই পরামর্শে পাবলিক হলিডে ঘোষণা করেছেন। এতে তাঁদের মুখরক্ষা হয়। নয়তো আপিসে গেলে তাঁরাও মার খেতেন, দোকান খোলা রাখলে তাঁদেরও দোকান লুট হতো। হিন্দু নেতারা মির্জাপুর পার্কে সভা করে জানিয়ে রেখেছেন যে হিন্দুরা নিজেদের ক্ষতি করে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য নয়। হরতাল যারা করতে চায় তারা করুক, কিন্তু যাঁরা নারাজ তাদের উপর যেন জোর জুলুম না হয়। হলে নেতারা বাধা দেবেন। আইন তাঁদেরই পক্ষে। পাবলিক হলিডেতে প্রাইভেট দোকানপাট খোলা থাকা তো বেআইনী নয়। অন্যান্য পাবলিক হলিডেতে খোলা রাখাই রেওয়াজ। সরকারী অফিসারদের উপরে সরকার নির্দেশ জারি করতে পারেন, বেসরকারী সাধারণের উপরে নয়। তারা কি তাজা মাছ কিনে খেতে পারবে না?

মানসের ঘুম আসে না। সে অনেক রাত অবধি তার কুঠির দোতালার লম্বা বারান্দায় নিঃশব্দে পায়চারি করে। মুসলিম লীগ তা হলে এমনি করে ওয়ার অভ্ সাকসেসন শুরু করে দিচ্ছে। পার্লামেণ্টারি ইলেকশন যথেষ্ট হলো না। কনস্টিটিউশনাল মীন্স যথেষ্ট হলো না। জিন্না সাহেব বলেছেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে। এবার তিনি পিস্তল হাতে নিচ্ছেন। ষোলই আগস্ট তাঁর সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের দিন। বলা যেতে পারে সেটা তাদের D-Day. যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইঙ্গ মার্কিন ফরাসী বাহিনীর নর্মাণ্ডির উপকূলে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট দিবস।

দেশের অবস্থা এখন অগ্নিগর্ভ। একটি দেশলাইয়ের কাঠিও একটা দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। জিন্না এ করছেন কী! গোটা দেশটাই যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর সাধের পাকিস্তান কি আস্ত থাকবে? তিনি কি জানেন না যে শিখ বলেও একটি সম্প্রদায় আছে, তারও ধারণা সেও একটি নেশন, তারও একটা হোমল্যাণ্ড চাই। প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড চায় তো দেশে দু'ভাগ কেন বহু ভাগ হবে। আর নেশন কি কেবল ধর্ম অনুসারে হয়, ভাষা অনুসারে হয় না? মতবাদ অনুসারে হয় না? ইউরোপের ইতিহাস কী বলে? ভারত যদি একবার ভাঙতে আরম্ভ করে তো পাকিস্তানও

পরে একদিন ভাঙতে পারে। তার আগে বাংলাদেশ যে অবিভক্ত থাকবে তা নয়। পাঞ্জাবও না। এসব যদি হবার থাকে তো কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে বসেই হোক। কেন ইংরেজদের সহায়তায় হতে চাওয়া? তাদের রোয়েদাদ যদি সবাই মেনে না নেয়? তবে কি গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়েই যেতে হবে? বেশ, তাই সই। কিন্তু ষোলই আগস্ট থেকেই তা শুরু হবে কেন? তবে কি এটা ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট ঠেকিয়ে রাখার জন্যে হচ্ছে? অমন করে কি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নিবৃত্ত করা যায়? কিংবা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে? ওয়েভেল বার বার ওয়েভার করছেন, কিন্তু তিনিও উপলব্ধি করেছেন যে কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট দিয়ে আর চলছে না। বড়ো রকম রদবদল চাই। মেজরিটিকেই তার উদ্যোগ নিতে হবে। মেজরিটি মাইনরিটিকে ডেকে আনবে। যেমন অন্যত্র হয়ে থাকে।

কংগ্রেস ও লীগের বিবাদটাই হিন্দু মুসলিম বিবাদে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাদটা আসলে কংগ্রেস-মুসলিমের সঙ্গে লীগ-মুসলিমের বিবাদ। হতে পারে কংগ্রেস-মুসলিমরা সংখ্যায় কম, লীগ-মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশী। তা বলে কি তাদের পক্ষে একবিন্দুও সত্য নেই? এমন কথা কি বলতে পারা যায় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা, ১৯৪১ সালের সত্যাগ্রহ মিথ্যা? ওরা গত নির্বাচনেও ভোটে জিতে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেছে। তার মানে ওরা ভারতেই থাকতে চায়, পাকিস্তানে থাকতে চায় না। কংগ্রেস তার মনোনীত একজন মুসলমানকে নিজের ভাগের একটি আসন দিতে বদ্ধপরিকর। বড়লাট যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট আকাঙ্ক্ষা করেন তো তাঁকে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে। এ ছাড়া তিনি আর কী করতে পারতেন? কংগ্রেস লীগের বিবাদের মূলে রয়েছে আরো এক কারণ। সেটা আরো ফাণ্ডামেণ্টাল। লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সমান আসন, সমানসংখ্যক পোর্টফোলিও, সমান গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও, সমান মর্যাদা দাবী করে। যেন সে আইন সভায় মাইনরিটি নয়, সারা ভারতেও মাইনরিটি নয়। বড়লাট ওয়েভার করতে করতে শেষকালে এ দাবীটাও মেনে নিতে নারাজ হয়েছেন। নয়তো কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের আশা ছাড়তে হতো। লীগের শেষ তুরুপের তাস পাকিস্তান, বিকল্পে গ্রুপিং। বাংলাদেশের সঙ্গে আসামও গোষ্ঠীভুক্ত হবে। পাঞ্জাবের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও গোষ্ঠীভুক্ত হবে। কে না জানে যে অসমীয়াতে বাঙালীতে আদায় কাঁচকলায়? তেমনি,

পাঠানে ও পাঞ্জাবীতে ভাষা নিয়ে, রেস নিয়ে রেষারেষি। প্রাদেশিক সরকার বন্ধনীভুক্ত হতে অনিচ্ছুক, তবু অনিচ্ছুকের উপর গ্রুপিং চাপিয়ে দিতে হবে। এই প্রশ্নে বড়লাট পুরোপুরি কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারছেন না, বিবাদটা ফেডারল কোর্টের ব্যাখ্যার জন্যে ঝুলে থাকছে। জিন্না সাহেবের আশঙ্কা—বড়লাটেরও আশঙ্কা—ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের ভাষায় গলদ আছে। কংগ্রেস তার সুযোগ পাবে। কিন্তু কোর্টের বিচারের উপর কথা বলা চলে না। বড়লাট অপেক্ষা করবেন না, গভর্নমেণ্ট ঢেলে সাজবেন। জিন্না অপেক্ষা করবেন না, কংগ্রেস গদীতে বসার আগেই তিনি যুদ্ধে নামবেন। যুদ্ধটা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধেও বটে, কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধেও বটে। শ্বেতাঙ্গদের গায়ে হাত দিতে সাহসে কুলোবে না, হিন্দুদের মাথায়ই বাড়ি পড়বে, হিন্দুদের পিঠেই ছোরা বসবে।

মনটা খারাপ হয়ে যায়, উদ্বেগে ভরে যায়। এই কি ভারতের স্বাধীনতার মাশুল? এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ? জাতীয়তাবাদের কতটুকু এই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত থাকবে? এটা কি কোনো মতেই এড়ানো যায় না? থাকুক না ইংরেজরা আরো কয়েক বছর। কিন্তু তাতে কি সমাধান সুগম হবে? না সাম্প্রদায়িকতা আরো জোরদার হবে? সময় কার পক্ষে? কংগ্রেস-মুসলিমদের পক্ষে না লীগ-মুসলিমদের পক্ষে? গত দশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস-মুসলিমদের জোর কমছে, লীগ-মুসলিমদের জোর বাড়ছে। কংগ্রেসে মুসলিম সদস্যসংখ্যা বাড়ছে না, কমছে। দশ বছর পরে কংগ্রেস সত্যি সত্যি মুসলিমবর্জিত দল হবে। দু'জন কি তিনজনই ততদিন কংগ্রেসে থাকবেন। যদি ততদিন বাঁচেন। এটা এক নিদারুণ সত্য যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের কাছে ততখানি আকর্ষণীয় না, যতখানি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই ওরা জাতীয়তাবাদ বলে ভ্রম করছে। এ ভ্রমটাতে মেজরিটি বনবার প্রত্যাশা। আজকাল সব রাষ্ট্রেই মেজরিটিই তো ক্ষমতাসীন। ডিকটেটরশাসিত রাষ্ট্র পর্যন্ত মেজরিটির মুখ চেয়ে কাজ করে। আমাদের মুশকিল এইখানে যে লোকে রাজনীতিক্ষেত্রেও ধর্মকে টেনে আনতে অভ্যস্ত। মুসলমান বলে বা শিখ বলে পরিচয় না দিলে নির্বাচনে নামতে দেওয়া হয় না, নির্বাচনেকেন্দ্রেই ভেদবুদ্ধি। চাকরির ক্ষেত্রেও তাই। সেকুলার স্টেট আমাদের কল্পনাতীত। সে রকম একটা রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশন রচনা করতে দিচ্ছে কে? ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা একধার থেকে বাধা দেবে।

জিন্না এখন থেকেই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী বয়কট করছেন। কেবল ইন্টারিম গভর্নমেন্ট নয়। দশ বছর সময় দিলে কি তাঁর সেকুলার স্টেটে রুচি হবে? হবে না, কারণ ধর্মের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব। তাঁর দলের পক্ষে সেটা একটা জীবন মরণ প্রশ্ন, গান্ধী নেহরু আজাদের দলের পক্ষে নয়। মুসলিম লীগ যেমরণ কামড় দেবে এটাই ধ্রুব। কালহরণ এক্ষেত্রে নিষ্ফল।

জিন্না সাহেবের নির্দেশে মুসলিম লীগ যে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছে সে আগুন নেবানোর সামর্থ্য বা ইচ্ছা ইংরেজদের নেই। তাঁরা দমন নীতি অবলম্বন না করে তোষণ নীতিই অবলম্বন করবেন। তা হলে দমন নীতি অবলম্বন করবে কে? আটটি প্রদেশের কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট গভর্নমেণ্ট। মুসলিম জনতা যদি বেপরোয়া হয়ে খুন জখম ঘর জ্বালানো ইত্যাদি অপরাধ করে তবে তাকে শায়েস্তা করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। অপোজিশনে থাকলে মুসলিম লীগ এতে উস্কানি দেবেই। তার হারাবার কী আছে? সে যদি জানত যে সেও একদিন গভর্নমেণ্ট গঠন করবে বা কোয়ালিশনের পার্টনার হবে তা হলে সে সংযত হতো ও সংযম শেখাত। কংগ্রেস থাকতে তার কি সে রকম কোনো আশা ভরসা আছে? কংগ্রেসও এটা বোঝে। সেও এটা এড়াবার জন্যে পদত্যাগ করে অপোজিশনে যেতে তৈরি। কিন্তু ইংরেজ থাকলে তো? কংগ্রেসের উৎপত্তি ইংরেজের অপোজিশন হিসাবে। সে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে মুসলিম লীগের অপোজিশন হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লক্ষ্য তার ভারতবর্ষের স্বরাজ। আর মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন, নয় যেখানে সম্ভব সেখানে স্বতন্ত্র গভর্নমেণ্ট গঠন। এক এক করে পাঁচটি কি ছ'টি প্রদেশে। পরে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রুপে। অবশেষে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এক কথায়, মুসলিম লীগের লক্ষ্য হয় পার্টনারশিপ, নয় পার্টিশন। পার্টনারশিপ ইংরেজ থাকতে হয়নি, ইংরেজ গেলেও যে হবে তেমন অঙ্গীকার নেই, যেমন দেখা যাচ্ছে সে চিরকাল অপোজিশনেই থাকবে, কেন্দ্রে তো বটেই, অধিকাংশ প্রদেশে। তা হলে পার্টিশনই একমাত্র গতি। আর সেটা ইংরেজ থাকতেই সমাধা হোক।

এর প্রতিকার কি পাল্টা পার্টিশন? বাংলা ভাগ? পাঞ্জাব ভাগ? আসাম ভাগ? মানস তা মনে করে না। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে যারা প্রাণ দিয়েছে, ধন দিয়েছে, জীবিকা দিয়েছে, জেলে গেছে, আন্দামানে

গেছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে, তাদের উত্তরপুরুষ যদি আবার সেই বঙ্গভঙ্গকেই সাদরে বরণ করে। কিন্তু মুসলমানদের মনোভাব আঁচ করে সে গভীর বেদনা বোধ করছে। এরা কি পাকিস্তানী হতে চায়, না বাঙালী থাকতে চায়? এরা কি বুঝতে পারছে না যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ সমার্থক নয়? বাংলাদেশ বাঙালীমাত্রের দেশ। একে কেবল মুসলমানের দেশ করতে গেলে বিহার থেকে, যুক্তপ্রদেশ থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, ওড়িশা থেকে মুসলমান এসে বাঙালী হিন্দুকে ভিটেছাড়া করবে। মানস ভাবতেই পারেনি যে পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশে এত বেশী ভোট পড়বে ও তার ফলে মুসলিম লীগ একটি গভর্নমেণ্ট গঠন করবে। সঙ্গে একজন তফশীলি হিন্দু। পেছনে কয়েকজন ইউরোপীয় বণিক। বাঙালী হিন্দুরা এমনিতেই তাদের প্রাপ্য ক্ষমতার ভাগ থেকে বঞ্চিত, তার উপর তাদের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত তাদের দখলে না থাকার আশঙ্কা। এতদিন ইংরেজই ছিল তাদের একমাত্র বৈরী, এখন দেখছে ব্রিটিশ রাজ গেলে মুসলিম রাজ হবে। ইসলামী স্বার্থ ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না। বাংলাদেশ তার কাছে আর একটা আরব কি ইরান কি আফগানিস্থান।

দুই নেশন তত্ত্ব অসত্য হলেও দুই রাষ্ট্র তত্ত্ব অসত্য নয়। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগ চিরকাল অপোজিশনে থাকতে পারে না, তার পক্ষে যদি অধিকাংশ মুসলমান ভোট দিয়ে থাকে তবে অধিকাংশ মুসলমানও চিরকাল রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। এরূপ স্থলে কোয়ালিশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তা যদি অকেজো হয় তবে পার্টিশনের ব্যবস্থাও থাকা যুক্তিযুক্ত। মানস এইপর্যন্ত লীগপন্থীদের সঙ্গে একমত হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে উপায় তারা অবলম্বন করতে যাচ্ছে তা কখনো সহ্য করা যায় না। সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুর সম্পর্ক অহিনকুল সম্পর্ক নয়। ঝগড়া মাঝে মাঝে বেধেছে, ঝগড়া মিটেও গেছে, তারপর ওরা একসঙ্গে বাস করেছে। একসঙ্গে চাষ করেছে। একসঙ্গে মাছ ধরেছে। একসঙ্গে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করেছে। এখন এমন কী হয়েছে যে ওরা বরাবরের মতো পরস্পরকে ছেড়ে ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যাবে। মুসলিম ও হীদেন এই ভেদবুদ্ধি কেন? হীদেনকে মুসলিম করাই ছিল সেকালের নীতি। সেটা কি একালেও অনুসৃত হবে?

আর ওই যে মাস মোবিলাইজেশন ওর পরিণাম তো মধ্যযুগের। ফ্রান্সের

সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে মানসকে আতঙ্কিত করে। বাংলাদেশের হিন্দুরাও কি ফ্রান্সের প্রটেস্টাণ্টদের মতো ঝাড়ে মূলে সাবাড় হবে? মাইনরিটি বলে যদি কারো অস্তিত্ব না থাকে তবে মাইনরিটি সমস্যা বলেও কোনো সমস্যাই থাকে না। আরবে ইরানে তুরস্কেও নেই। তুরস্ক থেকে আর্মেনিয়ানদের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। গ্রীকদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার হবে পাকিস্তান থেকে, যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশন সফল হয়।

পরের দিন পনেরোয় আগস্ট। মানস কোর্টে গিয়ে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকে। ফাঁকতালে একদিন ছুটি পাচ্ছে বলে অনেকেই উৎফুল্ল। যারা রোজা রাখছে তাদের তো কথাই নেই। কেউ বিশ্বাস করে না যে ষোলই আগস্ট অঘটন কিছু ঘটবে। ঘটলে কলকাতায় ঘটবে, এ শহরে নয়। শহরে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। মুসলমানরাও শান্তিপ্রিয়। গ্রামে অবশ্য মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, কিন্তু খুনোখুনি হরদম হলেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নয়। তবে ইদানীং একটি গঞ্জে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট যারা লুট করে পুড়িয়ে দিয়েছে তারা মুসলমান। কারণটা বোধহয় অর্থনৈতিক। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যদি হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় তবে তার প্রধান হেতু অর্থনৈতিক। জমিদার, মহাজন, নায়েব, পেয়াদা কে না তাদের শোষণ করেছে? কিন্তু শুধু কি তাদের? হিন্দুদেরও কি নয়?

কোর্ট থেকে উঠে সে যখন চেম্বারে যায় তখন নাজির সাহেব এসে তাকে সেলাম করেন। বলেন, "সার, অনুমতি পাই তো একটা কথা নিবেদন করি। কালকের বাজারটা আজকেই করে রাখলে ভালো হয়। শুনছি হিন্দুরাও কাল হরতাল করবে। পাছে দোকান পাট লুট হয় কি পুড়ে যায়। সাবধানের মার নেই।"

মানস মনে মনে চটে যায়। বলে, "কেন, ওরা কি মগের মুলুকে বাস করছে? সরকারকে ট্যাক্স দেয় না? সরকার ওদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য নয়? ডি. এম. কী করছেন? এস. পি. কী করছেন?"

নাজির নিরুত্তর। তখন মানস টেলিফোন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজের সার্ভিসের বাঙালী সিনিয়র অফিসার মির্জা আফজল সিরাজীকে। "শুনছি কাল শহরসুদ্ধ সব দোকানপাট বন্ধ থাকবে। জেলা জজও শাক সবজি কিনতে পারবেন না। তাঁকেও কি সপরিবারে রোজা রাখতে হবে?"

সিরাজী লজ্জিত হয়ে, বলেন, "পাবলিক হলিডেতে আপিস আদালত বন্ধ হয়। হাটবাজার কখনো বন্ধ হয় না। আমিও শুনছি সে রকম কিছু হবে। এটা কিন্তু সরকারের হুকুমে নয়, মল্লিক। হুকুম যদি কেউ জারি করে থাকে তবে সে এখানকার মুসলিম লীগ জেলা কমিটির সেক্রেটারি শফিকুদ্দীন। সে এবার জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। আমার সঙ্গে ভারিক্কি চালে কথা বলে। তা কাল সকালেই শাক সবজির বোঝা নিয়ে একজন ফেরিওয়ালী হাজির হবে। আপনারা যেটা খুশি কিনবেন। নো প্রব্লেম। সপরিবারে রোজা রাখতে হবে কেন? ইউ আর নট আ মুসলিম। আমিও কি রাখছি নাকি? রোজা রাখি তো অত খাটব কী করে?"

এর পরে মানস পুলিশম্যানকে ফোন করে। ইনি ওর পূর্ববর্তী কর্মস্থলে ওর প্রতিবেশী ছিলেন। টুর করে বেড়াচ্ছেন, বাড়ীতে স্ত্রীর প্রসবব্যথা। অন্য কোনো স্ত্রীলোক নেই যে সাহায্য করে। জজ গৃহিণী খবর পেয়ে ছুটে যান। রাত জেগে সেবা যত্ন করেন। ডাক্তার ডাকতে হয় না। সুপ্রসব হয়। সেই থেকে ওঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রমোটেড অফিসার। পাঞ্জাবী মুসলমান। চিয়াং কাইশেক যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর স্পেশাল ট্রেনের ডাইনিং কারের ওয়েটার সেজেছিলেন ফিদা হোসেন খান্। রাজপুত বংশীয় বলে গৌরব বোধ করেন। বংশের একটি শাখা এখনো হিন্দু। দুই শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে। কন্যা ধর্মান্তরিত হয় না। এটা নাকি ওই বংশেরই প্রথা। পাকিস্তান পছন্দ করেন না। তাঁর মতে জিন্না নিজে সাচ্চা মুসলমান নন।

"হরতাল হবে, শুনছি। মীটিং, প্রোসেসন এ' কিছু হচ্ছে না তো? আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে কমিউনাল মোড় নিতে পারে, খান্। জানি, আপনি সব সময় সতর্ক। আপনাকে সতর্ক হতে বলা অনাবশ্যক। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড।" মানস তাঁকে টেলিফোন করে।

পুলিশ সাহেব তাকে আশ্বাস দেন যে শান্তিভঙ্গের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। "আজ সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে প্রোসেসনের অনুমতি দেওয়া হবে কি-না। দশ হাজার লোকের মিছিল যদি বেরোয় আমার অত লোকবল নেই যে সামলাতে পারব। ওরা যদি হাতিয়ার হাতে নিয়ে বেরোয় তবে ওদের নিরস্ত্র করাও তো দুষ্কর। তবে মিটিং-এর ঝুঁকি

নেওয়া যেতে পারে। ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন নাকি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে মামলা হলে জেলে যাওয়ার মুরোদ একজনেরও নেই। আর হিন্দুবিরোধী আস্ফালনে মুসলমানের কতটুকু লাভ? নেহরু যাচ্ছেন ইন্টারিম গভর্নমেণ্টের প্রধান মেম্বর হয়ে। তিনি কি বেঙ্গলের হিন্দুদের প্রোটেকশন দেবেন না? বড়লাটও দেবেন। গভর্নরও দেবেন। দেখবেন কলকাতায় কাল নর্মাল থাকবে। গোলমাল বাধতেই দেওয়া হবে না। বাধলে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। তবে একটা খবর আপনাকে জানিয়ে রাখছি। বাইরে থেকে এখানে হিন্দু এজেন্ট প্রোভোকেটর এসেছে। স্থানীয় হিন্দু জনতাকে উস্কানি দিতে।"

পরের দিন ষোলই আগস্ট। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি দিক্‌নির্ণয়ক দিবস। মুসলিম লীগের লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় ছ'বছর আগে লাহোরে। আজ কলকাতায় স্থির হবে লক্ষ্যভেদের উপায়। গোলমাল হয়তো হবে না। না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। স্বয়ং গভর্নর রয়েছেন, ফোর্ট উইলিয়ামে আর্মি রয়েছে, লালবাজারে পুলিশ রয়েছে। সুহরাবর্দী একজন সুদক্ষ প্রশাসক। পরিস্থিতিকে তিনি আয়ত্তে রাখতে পারবেন। তিনিও জানেন যে দিনকয়েক বাদে নেহরু সদলবলে ক্ষমতায় আসছেন। জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রথম ভুল ইন্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা। তাঁর হাতের তাসের ট্রাম্প করার শক্তির অনুপাতে তিনি অত্যধিক 'কল্‌' দিয়েছেন। ব্রিজ খেলার পরিভাষায় একে বলে 'ওভারকল্‌'।

কিন্তু মাস মোবিলাইজেশন যদি হয় তার ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী। কার সাধ্য কে সেই ধর্মোন্মাদ জনতাকে আয়ত্তে রাখবে? তারা মারবে, মরবে, সামনে যাকে পাবে তাকেই। কী ইংরেজ, কী হিন্দু। গভর্নরের প্রশ্রয়ে সুহরাবর্দী মন্ত্রীমণ্ডল যা করছেন তা আগুন নিয়ে খেলা। আজকের এইদিনটা শান্তিতে কাটলেই রক্ষা। মানস ও যুথিকার মনে একটা কী হয় কী হয় ভাব। মানস কিছু লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় পেলেও মুড পায় না। সাত পাঁচ ভাবে।

টেনিসের সময় হলে সে ছটফট করে। খেলতে গিয়ে খেলবে কার সঙ্গে? কেউ কি আজ আসবে? খেলাতেই বা মন লাগবে কেন? এমন দিনে কি খেলা যায়? রেডিও খুলে বসে থাকে যদি কলকাতার কোনো খবর দেয়। তেমন কিছু পায় না। নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। নেই খবর তো ভালো খবর।

সন্ধ্যাবেলা পাবলিক প্রোসিকিউটর রায় শরদিন্দু নিয়োগী বাহাদুর আসেন দেখা করতে। বলেন, "শুনলুম আপনি খুবই চিন্তিত। তাই জানাতে এলুম আজকের দিনটি শান্তিতে কেটেছে। হিন্দুরাও উৎসাহের সঙ্গে হরতাল পালন করেছে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা সাজে না। এখানে একজনও ইংরেজ অফিসার নেই, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ সাহেব দু'জনেই মুসলমান। দু'জনেই প্রো-হিন্দু। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির সভায় আমাকেও ডাকা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয় মিছিল বেরোতে দেওয়া সমীচীন কি না। আমি বলি, আলবৎ। তবে তাকে কণ্ট্রোলের মধ্যে রাখতে হবে। আমি থাকব মিছিলের সঙ্গে। হিন্দুরা যে যোগ দিচ্ছে এটা জানলে তাদের মনোভাব বদলাবে। হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরোধী নয়। মোগল রাজত্বেরও বিরোধী ছিল না। তবে রাজপুতদের মতো তাদেরও বিশ্বাস করতে হবে, বড়ো বড়ো পদ দিতে হবে, তাদের উপর জিজিয়া বসানো চলবে না। আমি আল্লাহো আকবরও বলেছি, পাকিস্তান জিন্দাবাদও বলেছি। মিছিল শহর ঘুরে আসে। কারো উপরে হামলা করে না। মীটিংও হয়েছিল। সেখানেও আমি একজন বক্তা। শফিকুদ্দীন ইংরেজদের বাঁচিয়ে বক্তৃতা দেয়, জানে যে ইংরেজ চটলে গভর্নরস রুল হবে, তখন আমিই ওঁকে প্রোসিকিউট করব। হিন্দুদের উপরেই গায়ের ঝাল ঝাড়ে। বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর উপরে। কিন্তু শ্রোতারা তারিফ করে না। আমার উকীল বন্ধু আবু হেনা তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, গান্ধীজী কুইট ইণ্ডিয়া না বললে কি কায়দে আজম ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট বলতেন? ইংরেজরা কুইট না করলে কি মুসলমানরা পাকিস্তান পাবে? সভার লোক শুনে শান্ত হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"কলকাতার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, রায় বাহাদুর। তবু ভালো যে এখানকার সব খবর ভালো।" মানস এতে খুশি।

"কলকাতা আমার এলাকা নয়, তার জন্যে আমার কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই। সেটা যাঁদের এলাকা তাঁরাই ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবেন। আমরা কেন ধরে নেব যে কলকাতায় এমন কিছু ঘটবে যেটা ইতিহাসের স্রোত ঘুরিয়ে দেবে। বাংলাদেশ বাংলাদেশই থাকবে, যদিও এর নতুন নাম হয়তো হবে পূর্ব পাকিস্তান। হোক না, তাতে কী এসে যাবে। গোলাপকে আপনি যে নামেই ডাকুন সে গোলাপই থাকবে। হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের নাম কি হিন্দু ছিল? সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও কি এর উল্লেখ আছে? আমাদের

বাসভূমির নাম কি হিন্দুস্থান ছিল? প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও পড়েছেন এ নাম। তা হলে পাকিস্তান আর পাকিস্তানীতে এত আপত্তি কেন? পাকিস্তানের পাঁচটি কি ছ'টি প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল বা বাংলাদেশও থাকবে। অধিবাসীরা বাঙালীই থাকবে। আমরা হিন্দু মুসলমান মিলে তামাম পাকিস্তানে মেজরিটি হব। পশ্চিমারা যদি ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল না করে তবে আমরাই কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করব, প্রধানমন্ত্রী হব, প্রেসিডেণ্ট হব। মিলিটারি পাওয়ার হয়তো ওদের হাতে থাকবে, সিভিল পাওয়ার আমাদেরই হাতে। ঝগড়া যদি করতে হয় পশ্চিমা মুসলমানের সঙ্গে করব, বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে কদাচ নয়। আমাদের হাতে যে তাস আছে সে তাস বুদ্ধিমানের মতো খেললে পাকিস্তানের রাজধানী হবে কলকাতা। কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমান আছে তাঁরা বাঙালী বলে পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। পাছে কেউ মনে করে নেটিভ মুসলমান। ওঁদের মতে ওঁরা আরব ইরান আফগানিস্থান থেকে এসেছেন বিজয়ীর বেশে। চেহারাটা কিন্তু আমাদেরই মতো।" রায় বাহাদুর হাসেন।

যূথিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় মানস। তিনি বলেন, "আপনার ছেলে আর আমার নাতি একই স্কুলে ও একই ক্লাসে পড়ে। ওরা অন্তরঙ্গ বন্ধু। একদিন আমাদের কুটিরে পায়ের ধূলো দিলে কৃতার্থ হব।"

আপ্যায়নের পর তিনি বিদায় নেন।

এখানে কোনো অনর্থ ঘটেনি জেনে মানস ও যূথিকা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্র বা ভূমিকম্পের এপিসেণ্টার তো কলকাতা। কলকাতায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটলে এখানেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। তাই ভাবনা থেকে যায়।

রাত ন'টায় রেডিওতে শোনায় কলকাতায় হাঙ্গামায় পাঁচ হাজার জন হতাহত। লুটপাট। অগ্নিসংযোগ। কারফিউ জারি হবে।

"St. Bartholomew's Day Massacre!" মানস বলে ওঠে।

যূথিকার মুখ চূণ। তার মা বাবা যদিও তাকে ত্যাজ্য কন্যা করেছেন তবু সে তো তাঁদের ত্যাগ করেনি। তাঁরা অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। কে জানে তাঁদের কী অবস্থা। সে কান্না চাপতে পারে না।

"ও কী। তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো খুব শক্ত মেয়ে। কখনো কাঁদ না। ছি। কাঁদতে নেই। যাও, শুতে যাও।" মানস নিজে কিন্তু শুতে যায় না।

অর্ধেক রাত অবধি পায়চারি করতে করতে ভাবে হিন্দু মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব কি একদিনেই থামবে? গড়াবে অনেক দিন, যতদিন না একটা রাজনৈতিক সমাধান পাওয়া যায়। দুই পক্ষই দোষী, কোনো এক পক্ষকে নির্দোষ বলা যায় না। কিন্তু সে কি মহাযুদ্ধের মতো গৃহযুদ্ধের বেলাও নীরব সাক্ষী হবে?

॥ তেইশ ॥

রাত দুটোর সময় শুতে গিয়ে সে দেখে যূথিকা তখনো জেগে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বিছানা ভিজে গেছে।

"ও কী। তুমি কাঁদছ এখনো? এক গঙ্গা অশ্রুধারায়ও হিন্দু মুসলমানের রক্তের দাগ মুছবে না। এ রক্ত বাঙালীর বুকের রক্ত। বাংলাদেশের কলিজার লহু।" মানস সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলে।

যূথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "তোমার বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। তার উপর কাব্যি করা শুরু হলো।"

মানস বুঝতে না পেরে বোবা হয়ে থাকে। তখন যূথিকাই মুখোমুখি হয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কান্না পাচ্ছে, তাই কাঁদছি। পাঁচ হাজার হতাহত। আরো কত হবে কে জানে! মা বাবার কথা ভেবে কান্না পাবে না? বাড়ী কিনেছেন পার্ক সার্কাসে। চার দিকে মুসলমান গিজ গিজ করছে। ওরা ক্ষেপে না গেলে চমৎকার লোক। কিন্তু ক্ষেপে গেলে চণ্ডী।"

"না, না, কেউ ওঁদের গায়ে হাত দেবেন না। স্বয়ং কায়দে আজমের সঙ্গে সিমলায় ওঁদের দহরম মহরম ছিল। সেখানকার ডাইসরিগাল লজে। জিন্না সাহেবের নিশ্চয়ই সেসব দিনের কথা মনে পড়বে।" মানস স্তোক দেয়।

"তাঁকে জানাবার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। তোমার যদি দয়ামায়া থাকে তুমি একবার ট্রাঙ্ক কল্ করে খবরটা নাও তাঁরা বেঁচে আছেন কি-না। বেঁচে থাকলে নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন কি-না।" যূথিকা ব্যাকুলভাবে বলে।

সে এর আগে কখনো এমন কোনো অনুরোধ করেনি, পাছে মানস ভুল বোঝে। তার বাবা তার স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,

জামাতা বলে স্বীকার করতেই রাজী হননি। তার মা তো গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন। সম্পর্ক যখন কেটে গেছেই তখন আবার জোড়া দিতে যাওয়া কেন?

মানস বলে, "আচ্ছা, কাল সকালেই আমি ট্রাঙ্ক কল্ করে খবর নেব। কিন্তু আমার নয়, তোমার নামে।"

"না, না, আমার নামে নয়, আর কারো নামে। বিল অবশ্য আমরাই মেটাব।" যুথিকা ভেবে পায় না কার নামে।

মানস পরের দিন ট্রাঙ্ক কল্ বুক করতে গিয়ে শোনে কলকাতার লাইন খারাপ। শত খানেক কল্ জমে আছে। নতুন কল্ বুক করা বন্ধ। তখন একটা প্রি-পেড টেলিগ্রাম ডাকঘরে পাঠায়। চাপরাশি ফিরে এসে জানায় টেলিগ্রামও কলকাতায় যাচ্ছে না। লাইন খারাপ। অনুমতি নিয়ে নাম ঠিকানা দিয়েছিল ক্লাবের অনরারি সেক্রেটারি পরমেশ মিত্রের। তিনি ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কেরও এজেন্ট। সর্বজনপ্রিয় পরোপকারী ভদ্রলোক।

এখন কী উপায়? মনে পড়ে যায় যে পুলিশ সাহেবের হেফাজতে পুলিশ ওয়্যারলেস আছে। সেখান থেকে কলকাতা ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠানো সম্ভব। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কেবল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পক্ষে। মানস তখন ফিদা হোসেনকে অনুরোধ করে লালবাজারে ওয়্যারলেস করে ওয়্যারলেসে উত্তর আনিয়ে নিতে। তিনি নিজের নামেই মেসেজ পাঠান, কিন্তু লালবাজার সাড়া দেয় না। বার বার তিনবার নিরুত্তর।

খবরের কাগজ আসেনি, আসবেও না। কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়েনি। একই কারণে চিঠিপত্রও আসেনি, আসবেও না। যাত্রীরাও অসেনি, আসবেও না। মুখে মুখে কতরকম গুজব রটে যায়। কোর্টে গেলে একজন উকীল বলেন, "কলকাতায় কাল পঞ্চাশ হাজার জন মারা গেছে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার হিন্দু।" আরেকজন উকীল এসে জানান, "ষাট হাজার লোক মারা গেছে, তাদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার মুসলমান।" ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুজব পল্লবিত হয়। কেউ বলে, "পাঁচটা মন্দিরে গোরুর মাথা পাওয়া গেছে।" কেউ বলে, "দশটা মসজিদে শূয়োর ঢুকেছে।" গির্জার কথা কিন্তু একজনও বলছে না। যদিও ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।

"হদিস পেলে?" যুথিকা জিজ্ঞাসা করে। মানসকে ফিরতে দেখে।

"পুলিশম্যান নিজের নামে মেসেজ পাঠিয়েছেন তাঁর বন্ধু শামসুল হুদার নামে। তিনি ডেপুটি কমিশনার। থাকেন পার্ক সার্কাসেই। তাঁর পক্ষে অনুসন্ধান সোজা। কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তো তাঁর চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। তাঁকে তাগাদা দিয়েও সাড়া মেলেনি। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।" মানস কৈফিয়ৎ দেয়।

যুথিকা মুখ ভার করে থাকে। "মিসেস সরকার কী করে খবর পেলেন? বলে গেলেন সরকার পরিবারের সবাই নিরাপদে আছে।"

"ওঁদের তো টাকার অভাব নেই। বোধ হয় রেডিও ট্রান্সমিটার আছে। তা ছাড়া আর কোন সূত্রে মিসেস সরকার খবর পেলেন?" মানস চিন্তা করে।

দিনের বেলা রেডিওতে যা শোনা যায় তা কতকটা স্থিতাবস্থার। রাত ন'টায় জানায় বাইরে থেকে সৈন্য এসে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করছে। কিন্তু ক'জন হতাহত তার উল্লেখ নেই।

"তার মানে অবস্থা আরো খারাপ।" যুথিকার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

মানস তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে? সেও তো শঙ্কিত স্বপনদার জন্যে, বৌদির জন্যে। তাঁদের বাড়ীর পেছনে মুসলমানদের বসতি। তাঁদের বাবুর্চি ও ড্রাইভার মুসলমান। বেয়ারা ও মেড হিন্দু। ঝিকে ওঁরা মেড বলেন। তার আরো কয়েকজন প্রিয় বন্ধুও তো কলকাতায় নিযুক্ত। প্রকাশকরাও কলকাতানিবাসী।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানস রাত জেগে পায়চারি করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় যে তার নিজের কর্মস্থলে তেমন কোনো বিপদ নেই। তবু বলা যায় না। গুজব যে ভাবে পল্লবিত হচ্ছে সেখানেও কলকাতার প্রতিক্রিয়ায় মারামারি বেধে যেতে পারে। এক পক্ষ মার দিলে কি অপর পক্ষ তার শোধ দেবে না?

তবে ভরসার কথা সিরাজী আর খান্। দু'জনেই অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির অফিসার। তাঁদের কারো বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ শোনা যায় না। তবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের উপরে শফিকুদ্দীনের মতো মোড়লদের চাপ একেবারেই কি পড়বে না?

কিন্তু এই দুই অভিজ্ঞ অফিসারের নিশ্চয় খেয়াল আছে যে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্ট আজ বাদে কাল গঠিত হবে ও তাতে মুসলিম লীগ থাকবে না, কংগ্রেস থাকবে। কাজেই দিল্লী থেকে যে চাপ পড়বে সেটাই কলকাতার

মন্ত্রীমণ্ডলকে ও তাঁদের স্থানীয় মোড়লদের অফিসারদের উপর চাপ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করবে। অফিসাররা আইন মোতাবেক কর্তব্য করে গেলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, ট্রেন আসে না। রবিবার চিঠি আসার প্রশ্নই ওঠে না। টেলিগ্রাফ বন্ধ, ট্রাঙ্ক টেলিফোন বন্ধ। পুলিস ওয়্যারলেস নিরুত্তর। মানস কোর্টে যায় না, কিন্তু গুজব তার কাছে পায়ে হেঁটে আসে। কলকাতায় নাকি দস্তুরমতো যুদ্ধ চলছে। মুসমানরা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। একহাতে তলোয়ার, আরেক হাতে কোরান। ডাক ছাড়ছে, "আল্লাহো আকবর।" হিন্দুরা নাকি বোমা ফাটাচ্ছে। কারো কারো হাতে স্টেনগান। হাঁক ছাড়ছে "জয় মা কালী কলকত্তা-ওয়ালী।" ওদিকে শিখেরাও কৃপাণ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভবানীপুরকে ওরা মুসলিমমুক্ত করবে। গোরা সৈনিকরা চারদিকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু গুলী গোলা এখনো চালায়নি। গোরা পুলিশও নিরপেক্ষ।

এসব গালগল্পের উৎস কী? বারোজনের আড্ডা? না কোনো চোরাই রেডিও ট্রান্সমিটার? না লণ্ডনের বি বি. সি.? মানস এসব গুজবে কান দেয় না। যুথিকাকেও বলে কর্ণপাত না করতে। কিন্তু অশ্রুপাত তা সত্ত্বেও থামে না।

শেষকালে পুলিশ থেকে একজন কনস্টেবল মেসেজ নিয়ে এসে দেখায়। কলকাতা থেকে পুলিশ ওয়্যারলেসে এসেছে। "রায়চৌধুরী পরিবার পুলিশের গাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। নিরাপদে আছেন। হুদা।" পুলিশ সাহেব তার উপরে লিখেছেন "শো জজ।"

মানস যুথিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। যুথিকা হেসে বলে, "ছাড়ো। ছাড়ো। দেখছে।' পুলিশের লোক পালায়। মুচকি হাসে।

দীপক আর মণি ছুটে আসে। কী হয়েছে? কী হয়েছে? তখন তাদের খুলে বলতে হয় যে তাদের দাদামশায় ও দিদিমা বেঁচে আছেন। তারা অবাক হয়। তাঁদের কথা তো মা কোনোদিন বলে না। প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যায়। দীপকের বোঝবার বয়স হয়েছে যে বলবার মতো নয়। সে আর ও প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু মণি মাঝে মাঝে বায়না ধরে। যুথিকা নিরুত্তর।

রেডিওতে দিনের বেলা যা বলে তা আশাপ্রদ নয়। দাঙ্গা থামেনি। সরকার আরো কড়া ব্যবস্থা করেছেন। রাত ন'টায় শোনায় দাঙ্গা এবার

ভাঁটার মুখে। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা দেয় না। আর শুনেই বা কী হবে? হিন্দু মুসলমানের শ্রান্তি না এলে ইংরেজদের কিসের গরজ? সে তো আরো দশ বিশ বছর সুস্থ শরীরে ও বহাল তবিয়তে রাজত্ব করতে পারবে। সাম্রাজ্যের উপর সূর্য অস্ত যাক এটা কি সত্যি ওরা চায়? ওরা যদি চলে না যায় স্বাধীনতাও হবে না, পার্টিশনও হবে না। না হবে হিন্দুস্থান, না পাকিস্তান। আর কিছু না হোক, পূর্ববঙ্গের হিন্দু মাইনরিটি নিরাপদ।

পরের দিনও খবরের কাগজ আসে না, চিঠিপত্র আসে না। ট্রাঙ্ক কল বুক করে না, টেলিগ্রাম পাঠায় না। তেমনি অচল অবস্থা। তবে বিকেলের দিকে দু'চার জন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে পৌঁছয়। যত সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাহিনী ছড়ায়। তাদেরই হাত থেকে কয়েকখানা দু'পাতার পত্রিকা ধার করে এনে নাজির দেখান মানসকে। হিন্দুদের কাগজে লিখেছে মুসলমানরা হিন্দুদের ধরে নিয়ে গিয়ে নাখোদা মসজিদের প্রাঙ্গণে কোরবানী করেছে। আর হিন্দুরা মুসলমানদের ধরে নিয়ে গিয়ে কালীঘাটের কালীমন্দিরে বলি দিয়েছে। খুঁটিনাটি সমেত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মানস তো হাঁ! এ কি কখনো সম্ভব! বাঙালী হিন্দু মুসলমান কি এত নিচে নামতে পারে। বিশ্বাস হয় না। অথচ হয়ও। যুদ্ধে কী না সম্ভব? ত্রিশ বছরের যুদ্ধে জার্মানীর ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টরা নাকি মানুষের মাংস খায়। সে ঐতিহ্য এখনো লুপ্ত হয়নি। গত মহাযুদ্ধে নাৎসীরা লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মেরেছে, তবে খায়নি। হিন্দু মুসলমান যদি এ গৃহযুদ্ধ এক্ষুনি না থামায় তা হলে কার কপালে কী আছে তা কেউ জানে না। হার জিৎ তো সব যুদ্ধেই থাকে, কিন্তু এই যে ব্রুটাল 'জেশন এর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। মানস যুথিকাকে এসব কথা জানায় না। ছেলে-মেয়েকেও না।

পরের দিন 'স্টেটসম্যান' পায়, হেডলাইন হলো 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। ভিতরে লিখেছে কলতাতায় যা ঘটে গেল তা ইউরোপের মধ্যযুগের মতো একটা 'ফিউরি' (Fury)। সীমাহীন উন্মত্ত ক্রোধ। আগুন এখনো নেবেনি। থামেনি। তলে তলে ধোঁয়াচ্ছে। 'অমৃতবাজার' গভীর পরিতাপ প্রকাশ করে হিন্দু মুসলমান উভয়কে দোষ দিয়েছে। এ তোমার এ আমার পাপ। এ রকম যদি চলে তবে স্বাধীনতা দূর অস্ত। সভ্যতাও থাকে কি না সন্দেহ।

রাস্তায় ঘাটে রাশি রাশি শব। বিস্তর শব গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়েছে তাই সঠিক বলতে পারা যাচ্ছে না কত লোক মরেছে। হিন্দু কত, মুসলমান কত। লুটপাট অজস্র হয়েছে। গৃহদাহের সংখ্যাও কম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের মতো দৃশ্য। শকুন উড়ে এসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সরকার ও মিউনিসিপাটি নাজেহাল। আর্মি এসে শব তুলে নিয়ে সৎকার করছে। নইলে মড়ক।

মানস যূথিকাকে দেখাবে কি দেখাবে না? সে ওৎ পেতে থাকে, ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তি কে কে নিহত তাঁদের নাম তন্ন তন্ন করে দেখে। না, তার বাবা মার নাম নেই। বিশিষ্টরা গা বাঁচিয়েছেন, গরিবেরা মরেছে। যারা দিন আনে দিন খায়, পথে না বেরিয়ে পারে না। আর যারা বস্তিতে থাকে।

ওরা দু'জনেই স্থির করে যে একদিন অনশনে থেকে নিহতদের জন্যে শোক করবে। ছুটির দিন দেখে। সেদিন তাদের মোর্নিং ড্রেস।

এর পরে কাগজ খুললে যথারীতি গালাগালি বর্ষণ। যত দোষ সুহরাবর্দী, যত দোষ বারোজ, যত দোষ জিন্না, যত দোষ ওয়েভেল। গান্ধী নেহরুও বাদ যান না। রোম পুড়ছে, নীরো বেহালা বাজাচ্ছেন। গান্ধী বাঙালীকে কোনোদিন ভালোবাসেননি, জবাহরলাল তো বাঙালীকে ঘৃণাই করেন।

"সত্যি, বাপু কেন একবার কলকাতায় এলেন না?" যূথিকার ধারণা তিনি এলেই সবাই শান্ত হতো।

"ওদিকে ওয়েভেল আবার ওয়েভার করছেন। শান্তির জন্যে লীগকে কিছু কনসেসন দিতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস-মুসলিমদের ডুবিয়ে দিতে হবে। নেহরুকে বল জোগাবার জন্যে বাপুকে থাকতে হচ্ছে দিল্লীতে। সেটাই তো প্রথম কর্তব্য। দেশের স্বাধীনতাই তো সকলের আগে।" মানস যতদূর বোঝে।

মাসের শেষে হঠাৎ বাবলী আর তার বান্ধবী আসে দেখা করতে। তারা তেভাগা আন্দোলন উপলক্ষে এ জেলায় পর্যটন করছে। কলকাতার অবস্থা কী রকম জানতে চাইলে বলে, "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়াইয়ের ফলে কলকাতা এখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের এলাকায় পা দিতে ভয় পায়। আমরা তৃতীয় পক্ষ বলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। আমাদের পার্টি কার্ডই আমাদের পাশপোর্ট।"

মানস ও যূথিকা সুধায়, "স্বপনদার খবর কী? বৌদির কী খবর?"

বাবলী উত্তর দেয়, "সেইকথাই তো বলতে এসেছি। ওঁরাই জানাতে বলেছেন। ওঁদের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে দিয়েছে। এখন ওঁরা হিন্দুস্থান পার্কে সুবিনয় তালুকদারের অতিথি। ইচ্ছে ছিল সাত আট দিনের মধ্যে অবস্থা শান্ত হলে বালীগঞ্জ পার্কে ফিরবেন। কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্ট থাকতে হয় কোয়ালিশন, নয় গভর্নরস রুল দুটোর একটা হলেই ওঁরা ফিরবেন, নয়তো অন্য কোথাও একটা খালি ফ্ল্যাট ভাড়া করবেন। পরের বাড়ীতে চাকর ও কুকুর নিয়ে থাকা যায় না, বান্নার উপরেও এক্তিয়ার নেই। কিছুদিন রাঁচীতে কি দেওঘরে গিয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু বৌদির ভয় বেওয়ারিস পেয়ে বাড়ীটা বস্তির মুসলমানরাই বেদখল করে নেবে। ওদের জ্বালাতেই আধ ঘণ্টার নোটিসে বাড়ী থেকে পালাতে হলো।"

"সে কী কথা! আধ ঘণ্টার নোটিসে।" মানস ও যূথিকা হতবাক।

"সংক্ষেপে বলি। উর্দুকে বাংলায় তর্জমা করে বলছি। ষোল তারিখ রাত্রে ওঁরা যথানিয়মে শুতে গেছেন। ঘুমিয়েও পড়েছেন। হঠাৎ এলফের অবিরাম চীৎকার শুনে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। বেয়ারা ছুটে এসে বলে, ডাকাত পড়েছে। জানালায় মুখ গলিয়ে দেখেন মশাল আর নিশান হাতে বারো তেরো জন লুঙ্গী পরা লোক চেঁচিয়ে বলছে, দরজা খোল। নইলে দরজা ভাঙব। স্বপনদা দু'তিনজনকে চিনতে পারেন। বস্তিতেই থাকে। মাঝে মাঝে চাঁদা নিতে আসে। আপদে বিপদে আইনের পরামর্শও চায়। ব্যাপার কী, চাঁদ মিঞা? এত রাতে কী মনে করে? স্বপনদা সুধান। সালাম আলায়কুম, সাহেব। উত্তর কলকাতার হিন্দুরা মুসলমানদের মেরে খেদিয়ে দিয়েছে, কেটেও ফেলেছে কয়েক হাজারকে। দক্ষিণ কলকাতায় তাদের জায়গা দিতে হলে হিন্দুদেরও মেরে খেদিয়ে দিতে হয়, দরকার হলে কেটেও ফেলতে হয়। আপনি আমাদের মুরুব্বি, আপনাকে মারতেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, খেদিয়ে দিতেও কি পারি? না, সে রকম বেইমান আমরা নই। কিন্তু মেহেরবানি করে বাড়ীটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আজকেই সমস্তটা নয়, শুধু নিচের তলাটা। আপনারা তো দোতালাতেই থাকেন, আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকুন। কাল যেখানে পারেন চলে যাবেন। মালপত্তর, চাকরবাকর, কুকুর বেড়াল সব কিছু নিয়ে। আমরাই বয়ে নিয়ে ট্রাকে তুলে দেব। দাদা দেখেন তর্ক করা বৃথা। ধাঁ করে

টেলিফোনের ঘরে গিয়ে রিং করেন। কিন্তু লাইন এনগেজড। পুলিশের আশা ছেড়ে দিয়ে বৌদির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকান। বৌদি চেঁচিয়ে বলেন, রামদীন, বন্দুক নিকালো। জানালায় মুখ গলিয়ে বলেন, গোলী চলেগি। দো আদমীকো জান জায়েগা। ওরা বিশ্রী ভাষায় বৌদিকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দেয়। শাসিয়ে যায় যে কাল আবার আসবে, সঙ্গে সব রকম অস্ত্রশস্ত্র ও আরো অনেক জন। লাট সাহেব ওদের পক্ষে, বড়া উজীর ওদের পক্ষে। গোলী চলেগি তো দোনো তরফসে চলেগি। দাদা ততক্ষণে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। বৌদি দাপটের সঙ্গে বলেন, বড়লাট আমাদের পক্ষে, মিলিটারি আমাদের পক্ষে। ট্যাঙ্ক চালিয়ে বস্তি বিলকুল সাফ করে দেবে। পরের দিন সকালে মীর সাহেব পুলিশের গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। বলেন, যশোবিকাশ রায়কে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবার জন্যে বেরিয়েছি। তাঁর মেয়ে টুকটুক আমাকে খবর দিয়েছে যে আপনারাও বিপন্ন। আপনাদের বেয়ারা তার সঙ্গে দেখা করে কালকের ঘটনার বর্ণনা শুনিয়েছে। কী লজ্জার বিষয়। শহীদকে রিং করতেই তিনি পুলিশের গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটি পরিবারের জন্যে জায়গা আছে। আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। জান বাঁচাতে চান তো অবিলম্বে তৈরি হোন। ইতিমধ্যে রায় পরিবারকে নিয়ে আসি। ওঁদেরও আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। কোন ঠিকানায় যাবেন মনঃস্থির করুন। আগে থেকে টেলিফোনে খবর দিন। মনে করুন এটা মিলিটারি ইভাকুয়েশন। সাত আট দিন পর বাড়ী ফিরবেন। যাবার সময় বন্দোবস্ত করে যান কে চার্জে থাকবে। গাড়ীতে চড়ে তিনি উধাও হন।" বাবলী বলে যায়।

"এ যে রীতিমতো নাটক!" মানস কৌতূহলী হয়।

"উঃ। কী দুঃখের। নিজ বাসভূমে পরবাসী!" যূথিকা ব্যথিত হয়।

"টুকটুকের এটা নোবল রিভেঞ্জ, স্বপনদা বলেন। বৌদি শিউরে ওঠেন ডবল ডাইভোর্সীর সঙ্গে একগাড়ীতে যেতে হবে? আমার তো ভয় করছে ওর মতলব ভালো নয়। কিন্তু কী করা যায়! বিপাকে পড়লে বাঘে হরিণে এক ঘাটে জল খায়। বৌদি কী কী সঙ্গে নেবেন চট করে স্থির করে ফেলেন। স্বপনদা কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবেন ভেবে পান না। তাড়াতাড়ি যা হাতের কাছে পান তাই নিয়ে গাড়ীতে ওঠান। সব দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করা হয়। বেয়ারা থাকে চার্জে। বাবুর্চিকে ছুটি দেওয়া হয়। ড্রাইভারটিও মুসলমান। তাকে নিলে অকারণে ঝুঁকি নেওয়া হয়। হিন্দুরা হয়তো মেরেই

ফেলবে। বৌদি নিজেও গাড়ী চালাতে জানেন। কিন্তু তালুকদারের ওখানে গারাজ পাবেন কোথায়? গাড়ী ও বাড়ী পাহারার বন্দোবস্ত করতে মীর সাহেবের সাহায্য চান। তিনি পুলিশের উপরে বরাত দেন। তালুকদারকে ফোন করা হয়। তিনি আশ্রয় দিতে খুশি হয়ে রাজী হন। এল্‌ফকেও স্বাগত জানান। গুপ্তদের হিন্দুস্থানে পার্কে নামিয়ে দিয়ে রায়েরা চলে যান রিজেণ্টস পার্কে। সেখানে দে পরিবারের অতিথি হবেন। সেখানেও গারাজ পাবেন না বলে নিজের গাড়ী বাড়ীতে রেখে গেছেন। পুলিশের গাড়ীতে উঠে স্বপনদা বলেন যশোবিকাশ রায়কে, আফটার অল, শহীদ ইজ আ ব্যারিস্টার অ্যাণ্ড অ্যান অকসোনিয়ান। যশোবিকাশ বলেন, ইয়েস। হী ইজ ওয়ান অভ্ আস অ্যাট হার্ট। বৌদি আর টুকটুক দু'জনেই ক্ষেপে যান। বৌদি বলেন, গোরু মেরে জুতো দান! টুকটুক বলেন, অক্‌সফোর্ড শু। হাসাহাসি পড়ে যায়। সেই থেকে ওঁরা দু'জনে দুই বান্ধবী। টুকটুক আর প্রেমে পড়তে চান না, বিয়ে করতে চান না। নাচ গান নিয়ে বাকী জীবনটা কাটাতে চান। রুক্মিণী দেবী অ্যারাণ্ডেলের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভাবছেন। আমি তো জানতুম না যে স্বপনদারা বাড়ী বদল করেছেন। ওঁর ওখানে গিয়ে রামদীন বেয়ারার মুখে বৃত্তান্ত শুনি। সে একপাল ভোজপুরীকে ডেকে এনে জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের সকলের হাতে ইয়া ইয়া লাঠি। তারপর তালুকদারদের ওখানে গিয়ে দেখা করি। উনি যখন শোনেন আমি তেভাগার তদারখ করতে মফঃস্বলে বেরোচ্ছি তখন আমাকে বলেন আপনাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা শোনাতে। স্বপনদার এখন লিখতে হাত কাঁপে, হাঁটতে পা কাঁপে। ডাক্তাররা বলছেন ট্রাউমা (trauma)' বৌদি বিষম ভাবনায় পড়েছেন। আচ্ছা, ওটা কি সারে না?" বাবলী . ায়।

মানস ভয় পায়, কিন্তু অভয় দিয়ে বলে, "সারে বইকি।"

বাবলী আরো বলে, "ওদিকে পুলিশের লোক গিয়ে রামদীনের কাছ থেকে সে রাত্রের ঘটনার বিবরণ শুনে লিখে নিয়ে গেছে। বস্তিতে হয়েছে ধরপাকড়। চাঁদ মিঞা এখন সদলবলে জেল হাজতে। মুসলিম লীগের উকীলরা ওদের জন্যে আদালতে জামিন প্রার্থনা করে বিফল হয়েছেন। গভর্নরের এখন টনক নড়েছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের উপর কড়া হুকুম জারি করেছেন। মুসলিম লীগ গভর্নমেণ্টে রয়েছে বলে গভর্নরের ছত্রছায়ায় থেকে আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে এটা তিনি সহ্য করবেন না।

যে কোনোদিন বরখাস্ত করবেন। নয়তো তাঁর নিজের আসন টলমল। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বললে ভুল হবে না, আবার হচ্ছে বললেও ভুল হবে। হিন্দুরা এখন ঘরপোড়া গোরু। তারা সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। মুসলমানদের মধ্যে যদিও বিস্তর সজ্জন আছেন, তাঁরা বহু হিন্দুকে রক্ষাও করেছেন, আশ্রয়ও দিয়েছেন তবু মুসলমানদের কাউকেই হিন্দুরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না। নখী দন্তী শৃঙ্গীদের মতো মুসলমানদের থেকেও ওরা শত সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চায়। যারা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে তারা আর পাড়ায় ফিরতে রাজী নয়। এ সমস্যার সমাধান গভর্নরের হাতে নয়। তিনি তাই কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের পক্ষপাতী। কিন্তু তার জন্যে জিন্নার অনুমতি দরকার। জিন্না সেটা কেন দেবেন যদি বড়লাট ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাঁর মুখ রক্ষা না করেন? বড়লাট কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করতে অনিচ্ছুক। ঝগড়া করতে হলে করতেন ব্রিটিশ স্বার্থে। কিন্তু মুসলিম লীগের স্বার্থে একটিও ইউরোপীয় জীবনকে তিনি বিপন্ন করবেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে কংগ্রেস আরেক দফা আন্দোলন শুরু করলে বামপন্থীরা গান্ধী, নেহরু কারো তোয়াক্কা রাখবে না। ইউরোপীয়দের পিটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানদের গায়ে হাত দেবে না। দেশ এখন আগুন হয়ে রয়েছে। বড়লাট মুসলিম লীগের স্বার্থে বড়ো জোর এইপর্যন্ত করতে পারেন যে নতুন গভর্নমেন্টে মুসলিম লীগের জন্যে পাঁচটি আসন সংরক্ষিত থাকবে, কিন্তু কংগ্রেসের জন্যে সংরক্ষিত আসন সে হিন্দুকে দেবে না মুসলমানকে দেবে সেটা কংগ্রেসের মর্জি। লীগের মর্জি নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই সামান্য পয়েন্টটুকু মেনে নিতে তাঁর দু' দু' মাস লাগল। শুনেছি কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশনের খাতিরে একজন কংগ্রেস-মুসলিমকে বাদ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, মওলানা আজাদ পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বাধা দেন। কংগ্রেস-মুসলিমদের স্বার্থত্যাগ কারো চেয়ে কম নয়। ত্যাগের দিন যাঁরা ত্যাগের সাথী ভোগের দিন তাঁরা ভোগের সাথী হবেন এটাই তো ন্যায়নীতি। তিনি বোধহয় অনুমান করতে পারেননি তার পলিসির পরিণাম কী হবে। হয়েছে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। যার ভুক্তভোগী অসংখ্য নিরীহ হিন্দু মুসলমান। শতকরা পঁচানব্বই জন গরিব মানুষ, যারা দিন আনে দিন খায়। আমরা এ পলিসি কী করে সমর্থন করি? এটা ন্যায়নীতি হতে পারে, রাজনীতি নয়। যাই হোক, এতে আমাদেরই লাভ হয়েছে। আমরাই এখন দুই সম্প্রদায়ের

মাঝখানে একমাত্র সেতুবন্ধ। নির্ভয়ে বিচরণ করি। উভয় পক্ষকেই অভয় দিই। আমাদের উপর লোকের আস্থা বেড়েছে। আজ যে আমরা এই মুসলিম-প্রধান জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা কি সম্ভব হতো যদি আমাদের পরিচয় হতো আমরা কংগ্রেসের লোক বা হিন্দু গান্ধীর শিষ্য? জুলি কি সে রকম পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের মন পেতে পারছে? সৌম্যদাও কি আজকের এই পরিস্থিতিতে সেতুবন্ধন করতে পারছেন? সেতুভঙ্গ তো চার বছর আগে টের করলেন।"

যুথিকা স্বপনদার জন্যে উদ্বিগ্ন। "ওঁর ব্রেন ঠিক আছে তো?"

"ষোল আনা ঠিক আছে। শকটা তো ব্রেনে নয়। প্রাণে। ওই যারা রাতের মাঝখানে এসেছিল তাদের হাতে ভাগ্যিস্ অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। থাকলে বৌদির দোনলা বন্দুক কতটুকু কাজে লাগত? হিংসা পরাস্ত হতো প্রবলতর হিংসার কাছে। বৌদির অপমানের সীমা থাকত না। আর দাদার তো প্রাণটাই যেত। কথাটা নির্জলা সত্য। আমিও চিন্তা করে দেখছি মুসলমানরা যে হিংসার মার্গ ধরেছে এই মার্গ যদি হিন্দুরাও ধরত তা হলে হিন্দুর সর্বনাশ যা হতো তার চেয়ে চার গুণ বেশী হতো মুসলমানের সর্বনাশ। ওরা লড়ে খুঁটির জোরে। ওরা লড়ছে ইংরেজদের জোরে। সে খুঁটিও আর আগের মতো জোরদার নয়। তার পরীক্ষা হয়ে গেল এবার কলকাতায়। কলকাতার তিনদিনের দাঙ্গাহাঙ্গামাকে যদি ব্যাটল অভ্ ক্যালকাটা বলেন তা হলে হিন্দুরাই জিতেছে, মুসলমানরা হেরেছে। প্রত্যেকবারই এ রকম হবে। এটা একটা ডিসাইসিভ ইভেন্ট। যেমন ব্যাটল অভ্ প্ল্যাসী। আমার খুব খারাপ লাগছে একথা ভাবতে যে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়েও হিংস্র হয়েছে। ওরা ছিল মাইল্ড হিন্দু। হয়েছে ওয়াইল্ড হিন্দু। বর্বরতার প্রতিযোগিতায় ওরাই পয়লা নম্বর। ওদের হাতে সমগ্র ভারত সঁপে দিয়ে যাবে কেন ইংরেজ? মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে ওদেরও একভাগ দিয়ে যাবে। এটা একরকম নিশ্চিত হয়ে গেল। তবে এটাও নিশ্চিত যে কলকাতা পাকিস্থানের ভাগে পড়বে না।" বাবলীর সিদ্ধান্ত।

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। তার তাৎপর্য কী বোঝো, বোন বাবলী? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তিন পুরুষের তপস্যা ব্যর্থ হবে। আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা গান্ধীপন্থী তাঁদের এক পুরুষের সাধনা মুছে যাবে। সৌম্যদা তার শাহাদাত দিয়ে কী করে এ তরঙ্গ রোধ করবে? আর তার বাপুর যা হবে তা কি বিয়োগান্ত নাটকের শেষে যা হয়?"

যূথিকা বেদনা বোধ করলেও হাসির ভাণ দিয়ে ঢেকে দেয়। "তোমরা থাকতে আমাদের ভাবনা কী? একটা বিপ্লব টিপ্লব কিছু ঘটাও। মানুষের মনটা এই মধ্যযুগের মিথ্যা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হোক। এরাও বুর্জোয়া, ওরাও বুর্জোয়া। যাঁহা কংগ্রেস তাঁহা মুসলীম লীগ। বুর্জোয়াতে বুর্জোয়াতে এক মুহূর্তেই কোলাকুলি হবে, যেই দেখবে লাল কেল্লার মাথায় লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। প্রতিবিপ্লবের জন্যে ওরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এককাট্টা হবে। আজকের নেতাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কী বল, ভাই? তোমার নামটি কী?"

"মাধুরী হোম। আমি এই শহরেরই মেয়ে। গাইড হয়ে এসেছি। কমরেড নই। রাজনীতি বুঝিনে। মেয়েদের স্কুলে পড়াই।" বান্ধবী বলে।

"ও:। আমার ধারণা ছিল তুমিও ঘরসংসার ফেলে বিপ্লব করে বেড়াচ্ছ। এসো একটু খাবার টেবিলে বসা যাক! আচ্ছা, বাবলী, বৌদিকে কেমন দেখলে বললে না তো। আর তাঁর এল্‌ফকে।"

"বৌদি হোমসিক। আর এল্‌ফ পরের বাড়ীতে এসে প্রতিক্ষণে অনুভব করছে সে আর স্বাধীন নয়। তার মুখে রা নেই। দেখে মায়া হয়। স্বপনদা তো বলছেন আর ওমুখো হবেন না। ওইসব লোকের মুখ দর্শন করবেন না। শেষে কি স্বামীস্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? কলকাতার দাঙ্গায় ওঁদের সোনার সংসার ছারখার হবে? এটাও কি কম ট্র্যাজিক?" বাবলী জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসার ভিতরেই উত্তর।

॥ চবিশ ॥

ভোজনের মাঝখানে মানস বলে, "বোন বাবলী, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি সোজা পথে কলকাতা ফিরে না গিয়ে বাঁকা পথে ঘুরে যেতে পারবে?"

"কেন পারব না? তবে পার্টির কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। জানো তো, পার্টি ফার্স্ট। কিন্তু ব্যাপার কী, বলো তো?" বাবলী বিস্মিত।

"তুমি স্বপনদাদের খবরটা জুলিদের একবার শুনিয়ে গেলে ভালো করতে। সেইসঙ্গে জুলির মায়ের খবরটাও।" মানস উত্তর দেয়।

"নিশ্চয়। আমি কালকেই রওনা হয়ে যাব। তার আগে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। জুলিটাকে দেখতে এত ইচ্ছে করে। দেখা হলে খুব ঝগড়া করব ওর সঙ্গে। লড়াই টড়াই ছেড়ে কেমন বর নিয়ে ঘরসংসার করছে।" বাবলী হাসে।

সবাই হাসাহাসি করে। যুথিকা বলে, "তা তোমাকেই বা মানা করছে কে? পার্টিতেও তো সুপাত্রের অভাব নেই। বিয়ের নজীরও তো রয়েছে।"

"আচ্ছা. যুথীদি, তুমি কি এদেশের মেয়ে নও? তুমি কি জানো না যে শ্বশুর শাশুড়ীর মত না থাকলে বিয়ে সুখের হয় না? জুলির শ্বশুর শাশুড়ী থাকলে বিয়েই হতো না। তার বদলে বিপ্লব হতো।" বাবলী রসিকতা করে।

"থাক, বোন বাবলী। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। ও প্রসঙ্গ থাক। এখন শোন। তোমার হাতে আমি একখানা চিঠি দিতে চাই। সেটা সৌম্যদার জন্যে। ওর মাথায় একটা ভূত চেপে রয়েছে, শাহাদাৎ! ও শহীদ হবে। তুমি কি ওকে বুঝিয়ে বলতে পারবে যে বিয়ের পরে শহীদ হওয়ার স্বাধীনতা ওর নেই? শহীদই যদি হবে তো বিয়ে করতে গেল কেন? অমন বৌ বহু ভাগ্যে মেলে। ও বেচারি শবরীর মতো কতকাল প্রতীক্ষা করেছে। ওর কি আর কারো সঙ্গে বিয়ে হতো না? পাত্র তো বিলেত থেকে বার বার ধাওয়া করে এসেছিল। ওই, যার সঙ্গে মিলির বিয়ে হলো।" মানস বলে।

"ওমা, তাই নাকি! মিলির বর জুলিকে বিয়ে করতে এসেছিল? কার সঙ্গে কার বিয়ে হয় প্রজাপতিই জানেন" বাবলী যেমন শুনেছে।

"সত্যি! আমিই কি জানতুম যে এই বরটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? ইনিও সৌম্যদার দোসর। ইনি নীরব দর্শক হবেন না। যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। কলকাতার দাঙ্গার খবর শুনে ছটফট করছিলেন, দাঙ্গাটাও তো একরকম যুদ্ধ। ইনি বলেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ। পদত্যাগের কথা তো হামেশাই বলেন। তা তুমি সৌম্যদাকে বুঝিয়ে বলবে যে দেশ তাঁর কাছে শহীদিয়ানা চায় না। ইংরেজরা এখন যাবার মুখে, তারাই ডেকে নিয়ে কংগ্রেসকে তাদের সিংহাসনে বসিয়ে দিচ্ছে। পরশু জবাহরলালের অভিষেক। কৈকেয়ী বাগড়া দিতে চেষ্টা করেছিলেন, ব্যর্থ হয়েছেন। কলকাতা ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কোনো কাণ্ডকারখানা হয়নি। আর কলকাতায় যা হয়েছে তা তো ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, ইংরেজদের সঙ্গে যারা এতকাল

লড়াই করে এসেছে সেই হিন্দুদের উপরেই অযাচিত আক্রমণ। গজনীর মাহ্‌মুদের মতো। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু অত সহজ নয়। ওদের গজনীতেই ফিরে যেতে হবে। ইংরেজরা যাচ্ছে, ওরাও যাক।" যূথিকা উত্তেজিত হয়ে বলে।

মানস মৃদু হেসে বলে, "গজনীতে ফিরে যেতে চাইলেও পাশপোর্ট লাগবে। ভিসা লাগবে। যতজন এসেছিল তাদের সংখ্যা নগণ্য। বাড়তে বাড়তে যতজন হয়েছে তাদের সংখ্যা আফগানিস্থানের মোট জনসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। তা হলে আফগানরা যাবে কোথায়? একই কথা মোগল বংশধরদের বেলাও। তা ছাড়া ন'কোটি মুসলমানের সবই তো আরব, ইরানী, তুর্ক, আফগান, মোগল বংশের নয়। তারা স্বীকার না করলেও তাদের চেহারা, তাদের ভাষা ধরিয়ে দেয় যে তারা ভারতীয় বংশধর। ধর্মান্তর বংশান্তর নয়। এখন এদের পা কী স্থানে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা কেউ দিতে পারো?"

"পাকিস্তানে।" যূথিকা, বাবলী, মাধুরী একসঙ্গে বলে ওঠে।

তখন মানস বলে, "কেউ ওদের যেতে বাধ্য করছে না। ওরাই পা তুলে বসে আছে। ইংরেজ যাচ্ছে, সুতরাং ওরাও যাবে। ইংরেজ যাবে তার হোমে, অতএব ওরাও যাবে ওদের হোমল্যাণ্ডে। যাওয়াটা দু'দশবছর পরে হলে চলবে না। একই সঙ্গে, একই সময়ে। বরং একদিন আগে। হিন্দু নেটিভদের আওতায় বা অধীনে একটা দিনও নয়। সেই দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে ওরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাধিয়ে দেবে। সে সংগ্রাম অস্ত্রশস্ত্র ও মশাল নিয়ে। হিন্দুরা যদি সমান সহিংস হয় তবে যা হবে তা সাধারণ দাঙ্গা নয়, মধ্যযুগের ইউরোপে যাকে বলা হতো 'ফিউরি'। অন্ধ আক্রোশে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য পশুর চেয়েও নৃশংস হওয়া। জিন্না সাহেব বছর পাঁচ ছয় আগে এডওয়ার্ড টমসনকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের জন্যে লড়াই বাধবে গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে শহরে শহরে মহল্লায় মহল্লায়। টমসন চমকে ওঠেন। এটা কি কখনো সম্ভব? জিন্না সাহেব দেখিয়ে দিলেন যে সম্ভব। আপাতত কলকাতায়। মুসলমানরা যদি জেতে তবে তো পাকিস্তান আদায় হবেই, যদি হারে তা হলেও পাকিস্তানের কেস মজবুত হবে। সম্রাটের দরবারে হিন্দুদের অত্যাচারের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান প্রার্থনা করা হবে। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবেও। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক যেন নর্মান ও অ্যাংলো-স্যাকসনের সম্পর্ক।

তেমনি পুরাতন। তেমনি অবিচ্ছেদ্য। কে যে নর্মান, কে যে অ্যাংলো-স্যাকসন তা কি এখন জোর করে বলবার উপায় আছে? একই রকম পোশাক পরলে, দাড়ি গোঁফ কামালে কেউ কি বুঝতে পারে কে মুসলমান, কে হিন্দু? হিন্দুরাও চোস্ত উর্দু বলে, মুসলমানরাও খাঁটি ভোজপুরী। মেয়েদের বেলা তো কথাই নেই। গ্রামে গ্রামে যখন লড়াই বাধবে তখন দেখবে রাতারাতি সবাই ভোল পালটেছে বা সদলবলে পালিয়েছে। এখন আমার ভাবনা কলকাতার মহামারী যেন পুব বাংলায় সংক্রামিত না হয়। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব মুসলমান হলেও কমিউনাল নন। তাঁরা শান্তিরক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমিও তাই। কিন্তু আমরা আর ক'জন! তবে আমাদের বিশ্বাস অধিকাংশ অধিবাসীই শান্তিপ্রিয়। তারা সহযোগিতা করবে।"

এর পর ওদের গল্প করতে বলে মানস চলে যায় ওর লেখার টেবিলে! চিঠি লেখে সৌম্যদাকে ও স্বপনদাকে। চিঠি দুটো বাবলীর হাতেই পাঠাবে। বাবলীকে অনুরোধ করবে সৌম্য ও জুলির সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ফিরতে।

সৌম্যকে লেখে, "স্টেটসম্যান যাকে বলছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আমি তাকে বলব সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। প্যারিসে যা ঘটেছিল প্রায় চার শতাব্দী পূর্বে। রাজমাতার প্ররোচনায় ক্যাথলিকরা প্রটেস্টাণ্টদের সদলবলে নিপাত কিংবা বিতাড়ন করে। বিতাড়িত প্রটেস্টণ্টরা ইংলেণ্ডে গিয়ে রানী এলিজাবেথকে জানায়। এলিজাবেথের প্রতিবাদে ক্যাথারিন ডি মেডিসি উত্তর দেন, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমিও তোমার প্রটেস্টাণ্টদের নিপাত কিংবা বিতাডন করতে পারো। তাই হয়। এখন আমার আশঙ্কা এদেশেও সেইরকম কিছু না ঘটে। অহিংসাবাদীদের অন্য রকম উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। যাতে হিন্দুও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। মুসলমানও বাঁচে আর স্বস্থানে বাস করে। বাপু বোধ হয় এটাকে সাধারণ 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে'র প্রশ্ন মনে করে ব্রিটিশ শাসকদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এটা তার চেয়েও সীরিয়াস? এটা একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। কলকাতার ঘটনার বিবরণ যা শুনছি ও পড়ছি তাতে মনে হয় হিন্দু মুসলমানের ক্রোধ এত প্রচণ্ড যে তারা বন্দুক বেয়োনেট হাতে পেলে তাও ব্যবহার করত। ডাইনামাইট হাতে পেলে তাও। দন্দ্বের এক দিকে হিন্দুদের ব্রুট মেজরিটি। অন্যদিকে মুসলমানদের ব্রুট ফোর্স। এর

কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই ভেবে বার করতে হবে। বাপু থাকতে আর কে সে কাজ করতে পারেন? আমরা যারা 'ল আণ্ড অর্ডার' বজায় রাখতে নিযুক্ত তাদের দৌড় ততদূর নয়। আর আমরাও তো হিন্দু মুসলমানে বিভক্ত। হিন্দু যদি ঝাঁকে ঝাঁকে মরে আমিও কি উত্তেজিত না হয়ে পারি? তেমনি, মুসলমান যদি কাতারে কাতারে মরে কোন্ মুসলিম অফিসার মাথা ঠাণ্ডা রেখে মন দিয়ে হিন্দু রক্ষা করতে পারবেন? বলা বাহুল্য ইউরোপীয় অফিসার এখানে একজনও নেই, থাকলেও তিনি হয়তো কলকাতার গোরা পুলিশের মতো নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকতেন। যতদূর শুনেছি। বাস্তবিক, তাঁরা তো যাবার মুখে। তাঁদের কী স্বার্থ, কেন তাঁরা হিন্দুর দিকে বা মুসলমানের দিকে ঝুঁকতে চাইবেন? ঝুঁকলে সমতা রাখবেন। সেটাই তাঁদের পলিসি। বেশী হিন্দু বা বেশী মুসলমান ধরলে বা মারলে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠবে। ওঁরা দু'পক্ষেরই গুডউইল চান। কোনো একপক্ষের নয়।"

স্বপনদাকে যা লেখে তা কতকটা একই প্রকার। তার সঙ্গে যোগ করে দেয়, "তুমি ফরাসী মানুষ। তুমি কী না দেখেছ? চারশো বছর আগে সেণ্ট বার্থোলোমিউজ ডে ম্যাসাকার। জনগণ দারুণ কমিউনাল ও মধ্যযুগীয়। তার দু'শো বছর বাদে তাদের উত্তরপুরুষরা আশ্চর্যরকম সেকুলার ও আধুনিক। রাজমাতার উত্তরনারী রাজরানী মারী আঁতোয়ানেতকেই তারা গিলোটিনে নিপাত করে। রাজত্বকেও উচ্ছেদ করে। ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে। চার্চের উপর থেকে পোপের আধিপত্য রহিত করে। চার্চের হাত থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নেয়। আইনকানুন বদলে দেয়। সব মিলিয়ে যা হয় তাকেই বলে ফরাসীবিপ্লব। অপেক্ষা করো আর দ্যাখো। এইটুকুকেই তোমার হাত পা কাঁপছে! আরো কত কী দেখতে হবে, তখন তো হৃৎকম্প হবে। যদি না নিজেকে সামলাতে সমর্থ হও। বৌদিই তোমাকে সামলাবেন। তিনি শক্তিমতী।

তোমার কর্তব্য দেশের লোককে বৃহত্তর ও মহত্তর ভূমিকার জন্যে প্রস্তুত করা। ভলতেয়ারের মতো, রুশোর মতো, দিদেরোর মতো। এনসাইক্লো-পীডিস্টদের মতো। হাত গুটিয়ে বসে না থাকলেই হাতের কাঁপুনি থেমে যাবে। পায়ের কাঁপুনিও থামবে সভায় সমিতিতে গেলে। উঠে দাঁড়াস্, উঠে দাঁড়াস্, ভেঙে পড়িস্ না রে।"

চিঠিখানা বাবলীর হাতে দেবার আগে মানস সবাইকে পড়ে শোনায়। বাবলী বলে, "যদি কিছু না মনে কর, মানসদা, তোমার থীসিসের বিসমিল্লাতেই গলদ। কংগ্রেস নেতারা তো বড়লাটের আহ্বানে ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে পা বাড়িয়েছিলেনই আজাদকে বাদ দিয়ে। কিন্তু গান্ধীজীর ধনুর্ভঙ্গ পণ আজাদকে বা অন্য একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো যাওয়া চলবে না। ওদিকে জিন্না সাহেবেরও অনমনীয় জেদ লীগপন্থী ভিন্ন অন্য কোনো মুসলমান গেলে লীগ নেতারা যোগ দেবেন না। বড়লাট একপক্ষকে তুষ্ট করতে গিয়ে অপরেক পক্ষকে রুষ্ট করতে চান না। তাই কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট গঠন করেন। সেটা নিতান্তই ঠিকা বন্দোবস্ত। শেষে মনঃস্থির করেন যে কংগ্রেসের শর্তে রাজী হবেন, একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে কংগ্রেসের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের একটা দেবেন। তার মানে গান্ধীর পণই বহাল রইল, জিন্নার জেদ খারিজ হলো। জিন্নার রাগটা পড়ল ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়ের উপরেই। রাগের মাথায় তিনি ডাইরেকট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন ও ঘোষণার দিন ধার্য করলেন। ব্যস্, অমনি বেধে গেল ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা। অন্যান্য স্থানে সে আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে ফেলা হয় কিংবা জ্বলতেই দেওয়া হয় না। ইংরেজ ও কংগ্রেস উভয়েরই পলিসি এক। ব্যতিক্রম একমাত্র কলকাতা। আর সে কী বিস্ফোরক ব্যতিক্রম! এটা বিলেতের লেবার গভর্নমেণ্ট পছন্দ করেননি, ভারতের বড়লাটও না। বাংলার গভর্নরও যে করেছেন তাও না। সুহরাবর্দীকে বিশ্বাস করতে গিয়েই এ ব্যাপার ঘটেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বাংলাদেশের আর কোনোখানেই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না। মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন একটা ফাঁকা আওয়াজ। কংগ্রেস একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে নিয়ে ইণ্টারিম নর্মেণ্টে যাচ্ছে। তবে ওটাও প্রোভিন্সনাল গভর্নমেণ্ট নয়। ওটাও ফাঁকি। ওয়েভেলের নায়েব হয়ে নেহেরু ইংরেজের জমিদারি চালাবেন। স্বাধীনতা না হাতী! বিপ্লব! বিপ্লব ছাড়া সাচ্চা আজাদী হতে পারে না। বিনা বিপ্লবে আজাদী ঝুটা আজাদী। এই হলো যথার্থ থীসিস। আর তোমার ওই ফরাসী বিপ্লবও সেকেলে বিপ্লব। একেলে বিপ্লব হচ্ছে রুশ বিপ্লব। তার জন্যে দেশকে তৈরি করতে হলে রুশো, ভলতেয়ার কোনো কর্মের নয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন পড়তে হবে, গণনাট্য অভিনয় করতে হবে। অমনি করে হবে গণ-

জাগরণ ও রণ আয়োজন। অহিংসা! হা হা! হো হো! হি হি! সৌম্যদার যা হাস্যকর উপায়! এটা একটা মীথ। মানে মিথ্যা।"

মানস চুপ করে থাকে। যুথিকা মুখ খোলে। "তোমরা কবে একেলে বিপ্লব ঘটাবে ততদিন ঘটনার স্রোত অপেক্ষা করবে না। ইনিশিয়েটিভ এতকাল গান্ধীজীর হাতেই ছিল, এখন জিন্না সাহেবের হাতে চলে গেছে। এই নির্মম সত্যকে বাপু কী ভাবে গ্রহণ করেন, কী ভাবে এর সঙ্গে মোকাবিলা করেন তার উপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ।"

বাবলী বিদায় নিয়ে পরের দিন সৌম্যর কর্মস্থলের অভিমুখে রওনা হয় ও সেইদিনই পৌঁছয়। সৌম্য তখন তার আশ্রমে উপস্থিত ছিল না। জুলি তার কুটিরের মেজের উপর আলপনা আঁকছিল। দিল্লীতে আজ প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!

জুলির সরল বেশ, সরল ভুষা, গৃহকর্ম নিপুণতা দেখে বাবলী রসিকতা করে, "তুই যে পুরোদস্তুর কস্তুরবা বনে গেলি রে! তোকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে তুই জুলি। পতিব্রতা বলে এতখানি পতিব্রতা! তুই যে সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতির একজন হয়ে গেলি রে। চিরন্তনী ভারত নারী। পরে যখন মা হবি তখন উমা হৈমবতী। অবাক করলি, জুলি।"

কলকাতার প্রসঙ্গ ওঠে। বাবলী স্বপনদাদের দুর্ভোগের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে শোনায়। এল্ফের কথাও ভোলে না।

"আমার মা কেমন আছেন? অনেকদিন খবর পাইনি।" জুলি সুধায়।

"দেখা হয়নি। খোঁজও নিতে পারিনি। তবে ও পাড়াটা এখনো পাকিস্তান হয়নি। সবাই নিরাপদ।" বাবলী অভয় দেয়।

এর পরে অনেক সুখদুঃখের কথা। জুলিকে মিলি দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর মা বাবার ভালোবাসার টানে সে ওঁদের ওখানে এতদিন ছিল, এখন ওর নিজের কুটিরে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু এদিকেও নিন্দুকের টিটকারী শুনতে হচ্ছে। দিশী কুঁড়ে ঘরে বাস করে, বিলিতী টয়লেটে মাৎ করে।

"ওদের চুকলিতে কান দিতে নেই, ভাই। গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আমারও কি কম অসুবিধে হচ্ছে? তা বলে তো কমোড আশা করতে পারিনে। তুই বোধহয় গ্রাম অঞ্চলে যাস্নি। শহরে বসেই গ্রাম উন্নয়ন

করছিস্। আজ হোক, কাল হোক তোকেও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। যদি সত্যি কস্তুরবা হয়ে থাকিস্। ওইটেই অ্যাসিড টেস্ট।" বাবলী খিল খিল করে হাসে।

"গ্রামে যাইনি তা নয়।" জুলি সঙ্কোচের সঙ্গে বলে। "দিনের বেলা চেপে রেখেছি। রাতের অন্ধকারে মাঠে জঙ্গলে গেছি। এখন বুঝতে পারি কেন এত নারীহরণ হয়। স্বরাজ তো হলো। এবার এর একটা স্থায়ী প্রতিকার চাই।"

"স্বরাজ তো হলো!" ব্যঙ্গ করে বাবলী। "রক্তবর্ণ শৃগাল ওই জবাহরলাল নেহরু। বিপ্লবও করেননি, জারকেও তাড়াননি, জারের অনুগ্রহে তাঁর শাসনপরিষদের পারিষদ হয়ে বলছেন ওটাই নাকি প্রোভিজনাল গভর্নমেণ্ট! দু'দিন বাদে লাথি মেরে বিদায় করে দেবে, অ-পদস্থ হয়ে জেলে ফিরে যাবেন, মুসলমানরা এমনি আনন্দের সঙ্গে 'মুক্তি দিবস' পালন করবে। আর জিন্না শাসাবেন, কংগ্রেস গদীতে ফিরে এলে আবার তুলকালাম কাণ্ড করব। লেনিনের ভাষায় কথা বললে কী হবে? লেনিন তো নন। গান্ধীও নন। আসলে উনি একজন ফেবিয়ান। লেবার গভর্নমেণ্টের বেশীর ভাগ সদস্যই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ওঁরাও যে শক্ত হয়ে গদীতে বসতে পারবেন তাও নয়। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া এক দিবাস্বপ্ন।"

এমন সময় সৌম্যর প্রবেশ। হাতে সাজিভরা লাল পদ্ম। বাবলী উঠে দাঁড়ায়। কী মনে করে আভূমি প্রণত হয়।

সৌম্য চমকে ওঠে! "ও কী! কমিউনিস্টরাও প্রণাম করে নাকি!"

"তোমার কাছে আমি কমিউনিস্ট নই, আমি ছোট বোন। তা ছাড়া তুমি একজন সাধু সন্ত। মাথা আপনি নত হয়ে আসে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো ওর পিঠে একটা কিল দিয়ে দেয় সৌম্য। বলে, "এই যে কুটিরটা দেখছ এটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্রাইঘাটের কুটিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। সাজানো হয়েছে। সিলিং থেকে শিকেয় করে ঝুলছে হাঁড়ি পাতিল। তাতে চিঁড়ে, মুড়ি, খই, পাটালি, বাতাসা, দুধ, দই, ছানা, চা, চিনি। দড়ি ধরে টান দিলে সুড় সুড় করে নেমে আসে। কোন্‌টা খাবে, বলো।"

বাবলী ইতস্তত করে। সৌম্য তখন ওর সঙ্গিনীর দিকে তাকায়। সেও প্রণাম করেছিল। "তোমার পরিচয় তো দিলে না।"

"মুরলারানী সরখেল। আমি এইখানকারই মেয়ে। বেহুলাদির গাইড হয়ে এসেছি। কিন্তু কমিউনিস্ট নই।" মেয়েটি বলে।

"বেহুলাদি! বেহুলাদিটি কে?" সৌম্য বাবলীর দিকে তাকায়।

"ওঃ! তোমরা জানো না যে আমাদের একটা ছদ্মনামও থাকে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হলে ও ছাড়া আর উপায় কী! লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কি, গর্কি এসব ছদ্মনাম ছাড়া আর কিছু নয়। আমারও তেমনি ছদ্মনাম বেহুলা। হিন্দুদের কাছে বেহুলা দেবী। মুসলমানদের কাছে বেহুলা বিবি। কিন্তু যতই যাই করি না কেন পুলিশ সব খবর রাখে।" বাবলী হাসে।

সৌম্য শিউরে ওঠে। "তুমি কি বোঝাতে চাও আমাদের আশ্রমেও?"

"হ্যাঁ, তোমাদের আশ্রমেও। তেমনি, পুলিশেও আমাদের লোক আছে। কোথায় নেই? প্রত্যেকটি আপিসেই। প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজেই। এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমরা সর্বত্র ঢুকেছি।" বাবলী হাসিমুখে বলে।

জুলি কৌতূহলী হয়ে সুধায় লখিন্দর বলে কেউ আছে কি-না। বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "কোন সাহসে লখিন্দর হবে? সাপের কামড়ে মরবে না? তখন ওকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে ভেলায় করে ভাসতে হবে নাকি?"

দড়ি টেনে একে একে নামানো হয় হাঁড়ি পাতিল। যে যার পছন্দ মতো খায় যেটা খুশি।

"তোরা আজ এইখানেই ভাত খেয়ে যাবি। সবাই মিলে একটু গল্প গুজব করা যাবে। রাজনীতি নয়।' জুলি নিমন্ত্রণ জানায়।

বাবলী রাজী হয়। তখন জুলি রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার উদ্যোগ করে। মুরলা তার সাথী হয়। কুটিরে আর একটি মেয়েও ছিল। আশ্রমিকা। কালী।

বাবলী সৌম্যকে স্বপনদার কাহিনী শোনায়। সেটা শোনানোর জন্যেই এখানে আসা। মানসের অনুরোধে। স্বপনদা নিজে তো লিখবেন না, হাত কাঁপে।

"স্বপনদা তো বৌদির মতে প্রচ্ছন্ন মুসলমান। ওঁর মাতুল বংশ মোগল আমলের রইস। তাঁদের লাইব্রেরীতে এনতার ফার্সী কেতাব। আদব কায়দাও অনেকটা অভিজাত মুসলমানদের মতো। তাঁদেরি মতো সেই দোষ দুটোও ছিল। সুরা ও সাকী। ওঁরা লখনউ থেকে, বেনারস থেকে বাঈজীদের আনিয়ে গান শুনতেন, নাচ দেখতেন। স্বপনদার শৈশবটা তো মুর্শিদাবাদের নবাবী আবহাওয়াতেই কেটেছে। সেই মানুষকে যে মুসলমানরাই ঘরছাড়া

করবে এটা কি কখনো ভাবা যায়? এর অভাবনীয়তাই তাঁকে বিহ্বল করেছে। বৌদিকে নয়।" বাবলী বিবরণ দিয়ে বলে।

সৌম্য দুঃখ প্রকাশ করে। "শুধু প্রচ্ছন্ন মুসলমানরা কেন, প্রকাশ্য মুসলমানরাও আজ দারুণ এক বিভীষিকার রাজত্বে বাস করছেন। ইংরেজ থাকতেই এই! ইংরেজ চলে গেলে মুসলিম লীগ যে কী না করবে তাই ভেবে মুসলমানরাও আতঙ্কিত। মৌলানা ইসমাইল হোসেন জালালাবাদীর নাম শুনেছ? খেলাফৎ আন্দোলনে তিনি ও আমি জেলবন্দী ছিলুম। সেদিনকার অনেকেই মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে ঘোরতর কমিউনাল হয়েছেন। কিন্তু মৌলানা সাহেব এখনো খাদি পরেন, চরকা কাটেন, গঠনের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যদিও গান্ধীজীর মতো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। এমন মানুষের উপরেও লীগপন্থীদের রোষ। কেন তিনি পাকিস্তান সমর্থন করেন না? কেন তিনি ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেননি? তাঁর নাম এখন হয়েছে কালো ভেড়া। মুসলমানরা আর সবাই শাদা ভেড়া। ওরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নামকা ওয়াস্তে একটা প্রস্তাব পাশ করেছে বলে ওরা নাকি লয়ালিস্ট নয়। ওরাই খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। মুসলিম ন্যাশনালিস্ট। আর মৌলানা সাহেব নাকি লয়ালিস্ট। তাঁকে ওরা একঘরে করেছে। পারলে ঘরছাড়া করবে। দিল্লীতে আজ যে রদবদল হচ্ছে তাতে থাকছেন আজাদের বদলে আসফ আলী। তিনি কি মুসলমান নন? আর থাকছেন আলী জহীর ও শাফাৎ আহমদ খান্। এঁরাও কি মুসলমান নন? শাফাৎ আহমদকে বার বার ছোরা মেরেছে এক লীগপন্থী মুসলমান যুবক। ভদ্রলোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বপনদার তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি নয়। প্রকাশ্য মুসলমান হলে সেই আশঙ্কা ছিল।"

বাবলী স্বীকার করে যে লীগপন্থীদের পয়লা নম্বর শত্রু এখন পাকিস্তান-বিমুখ অন্য দলের মুসলমানরাই। তবে কমিউনিস্ট মুসলমানদের কথা আলাদা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে মন খোলা রেখেছেন। হয় ভালো, না হয় ভালো। হলে তাঁরা পাকিস্তানেও থাকবেন, হিন্দুস্থানেও থাকবেন। কংগ্রেসীদের মতো পাকিস্তান ছাড়বেন না। এটা সুবিধাবাদ নয়, এটাই বাস্তববাদ।

জুলি আঁতকে ওঠে। "তুই কি বলতে চাস্ পাকিস্তান হলে আমাকেও এই আশ্রম, এই কুটির ছাড়তে হবে?"

"যদি কংগ্রেসে থাকিস তা হলে ছাড়তে হবে। নিছক গঠনের কাজ নিয়ে

থাকলে কেউ তোকে আশ্রম ছাড়তে, কুটির ছাড়তে বলবে না। কিন্তু তুই কি রাজনীতি ভুলতে পারবি?" বাবলী সন্দেহ করে।

সৌম্য নীরব থেকে কী যেন চিন্তা করে। তারপরে বলে, "না, বাবলী, আমি ভুলতে পারব না যে আমি একজন সত্যাগ্রহী। পাকিস্তান যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প হচ্ছে সত্যাগ্রহ। সঙ্গে আর কেউ না থাকলেও আমি সত্যাগ্রহ করব। সত্যাগ্রহী যে হবে তাকে শহীদ হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। জুলি একথা জানে, বিয়ের আগেই ওকে জানিয়েছি। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে প্রাণটা আমি সস্তায় বিকিয়ে দেব না। এর জন্যে প্রভূত মূল্য নেব। দেশের স্বাধীনতা বা বিশ্বের শান্তি বা হিন্দু মুসলমানের নিঃশর্ত মৈত্রী বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে নির্বৈর।"

জুলি এতক্ষণ মানসের চিঠিখানা দেয়নি। মনে পড়তেই জিব কেটে বলে, "ভুলে গেছলুম।"

সৌম্য মন দিয়ে পড়ে। তার পর ভাঁজ করে রেখে দেয়। বলে, "হুঁ। এখানেও কলকাতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। সতর্ক থাকতে বলেছে। হিন্দুরা সকলেই সতর্ক রয়েছেন। সেইজন্যে আজ তাঁদের একজনও আনন্দ প্রকাশ করছেন না। মুসলমানদের মতো তাঁরাও শোকদিবস পালন করছেন। আমাদের এই ঘরোয়া আয়োজনেও আমরা আশ্রমের লোককে ডাকিনি। নিজেরাই যৎসামান্য আনন্দ করছি। জানি এটা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। এমন কী আধখানা স্বাধীনতাও নয়। এর মহত্ত্ব এইখানে যে ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরীভাব দূর হয়েছে। ওদের করমর্দন আন্তরিক। আমাদের করমর্দনও আন্তরিক।"

"কিন্তু ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরীভাব দূর হলেই কি ইংরেজে মুসলিম লীগে মিত্রভাব দূর হবে? ওরা দু'পক্ষের মিত্র হয়ে দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দেবে। নিজেদের জন্যেও কিছু রাখবে। এ ছাড়া আর কী হতে পারে, সৌম্যদা? তুমি নৈতিক বিকল্পের কথা না ভেবে রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করো। কলকাতার গণহত্যার পর অনেকেই বলাবলি করছেন যে এর চেয়ে দেশভাগ ভালো, সেইসঙ্গে প্রদেশভাগও। সেটা ইংরেজরাই করে দিয়ে যাক। ওরা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। কংগ্রেসেরও সাধ্য নয়, লীগেরও অসাধ্য। জানিনে এ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক

সমাধান সম্ভব কি-না। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মুসলিম লীগ খারিজ করেছে। কংগ্রেসও যে সেটা মন খুলে গ্রহণ করেছে তা নয়। দেশের অবস্থা দিন দিন অগ্নিগর্ভ হচ্ছে। যে কোনো প্রদেশে, যে কোনো অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।" বাবলী হুঁশিয়ারি দেয়।

"তা বলে আমি বেঠিককে সমর্থন করব না। দেশভাগ বেঠিক। তার উত্তরে প্রদেশভাগও তেমনি বেঠিক, দুটো বেঠিক মিলে একটা ঠিক হয় না। ইংরেজদের কী? ওরা দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে, দুটোকেই সোভরেন ও স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দেবে, দুই রাষ্ট্রেই বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে। কতক লোকের লাভ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু জনগণের দুঃখের বোঝা বাড়বে। তখন আমি স্বাধীনভাবে সত্যাগ্রহও করতে পারব না। হিন্দুস্থানের নাগরিক হয়ে পাকিস্থানে বা পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে হিন্দুস্থানে সত্যাগ্রহ করা চলবে না।"

বাবলী আবেগের সঙ্গে বলে, "এই যে কতক লোকের মনে আনন্দ আর কতক লোকের মনে নিরানন্দ আজ আমরা দেখছি এর শেষ কোথায়? তুমি কি বুঝতে পারছ না, সৌম্যদা, যে যখন তখন যত্র তত্র দাঙ্গা বাধবে আর তা বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ হিমশিম খাবে? পুলিশ একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, আর্মিকে ডাকুন। আর্মিও কি দাঙ্গা বন্ধ করতে পারবে? ক'টা জায়গায় পারবে? আর্মিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, সত্যাগ্রহীদের ডাকুন। তখন পারবে তোমরা দলে দলে শহীদ হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করতে? তোমার যদি বাস্তববোধ থাকে তুমি সময় থাকতে মানবে যে দেশের অবস্থা সত্যাগ্রহীরাও শান্ত করতে পারবেন না। তার জন্যে চাই রাজনৈতিক সমাধান। সে সমাধান মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি। সেটা কার্যকর না হলে দেশ ভাগাভাগি। প্রদেশ ভাগাভাগি। ঠিক না বেঠিক। তবু শান্তির জন্যে একান্ত আবশ্যক।"

সৌম্য তর্ক করে না। স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছে ঘরে ঘরে নিরানন্দ। যেন স্বদেশী শাসন নয়, নতুন এক বিদেশী শাসন। জুলিকে বলে, "সন্ধ্যায় আজ দীপাবলী হবে না। শুধু প্রার্থনা সভা হবে।"

যাবার সময় বাবলী সৌম্যকে চুপি চুপি বলে যায়, "লক্ষণ যা দেখছি জুলি বোধহয় মা হবার পথে। শহীদ হতে গিয়ে ওকে তুমি পথে বসিয়ো না।

তোমার ভাবী সন্তানের খাতিরেও তোমাকে বাঁচতে হবে। শহীদ যদি কেউ হয় তো সে আমার মতো ভাগ্যবিড়ম্বিতা। সেটা কিন্তু বিপ্লবের দিন, বিপ্লবের প্রয়োজনে। সেদিন দেখবে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে গেছে। কেউ কারো গলা কাটছে না। বরং গলায় মালা দিচ্ছে। হাসছ যে? আসিবে সেদিন, আসিবে। তোমরাও সেদিন দেখবে সকলের মনে আনন্দ, নিরানন্দ কারো মনে নয়। যাদের মনে নিরানন্দ তারা পা দিয়ে ভোট দেবে।"

॥ পঁচিশ ॥

সুকুমার লণ্ডনে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। বি বি. সিতে জবাহরলালের অভিষেকের বার্তা শুনে লাফ দিয়ে ওঠে। মিলিকে বলে, "একটা দিনও দেরি করা উচিত নয়। আমি কালকেই প্লেন ধরে রওনা হচ্ছি। তোমরা জাহাজে করে ধীরে সুস্থে এসো। এখন চলি মেননের সঙ্গে দেখা করতে। নেহরু তাঁর সুপারিশ উপেক্ষা করতে পারবেন না।"

জবাহরলাল ইতিমধ্যেই কর্মপ্রার্থীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সুপারিশ যাঁরা করেছিলেন তাঁরাও এক একজন দিক্‌পাল বা দিক্‌পালিকা। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের তালিকাটিও ছোট নয়। তিনি নিজেও জানেন না তাঁর স্থায়িত্ব কতদিন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মতিগতি তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েও জানেন না। আর গান্ধীজীর মতিগতি বল্লভভাই, রাজেন্দ্র-প্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ হাই কমাণ্ডের triumvir হয়েও কতটুকু জানেন! পাকা ঘুটি কাঁচিয়ে দিতে ওই বৃদ্ধটি সিদ্ধহস্ত।

নেহরু কাউকেই কথা দেন না, সবাইকেই সবুর করতে বলেন। যাঁরা গোড়া থেকেই এদেশে রয়েছেন তাঁদের দাবীই অগ্রগণ্য। যাঁরা বিদেশে থেকে মদত গিয়েছেন তাঁদের দাবী তার পরে। সুকুমার তবু নাছোড়বান্দা। সে দিল্লীতেই ধর্না দিয়ে পড়ে থাকে। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভাতেও নিয়মিত যায়। একবার যদি গান্ধীজীর দূত হয়ে একখানা চিঠি নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে তবে কাগজে নাম উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে সেও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবে।

ওদিকে মিলিও অস্থির বোধ করছিল। বিলেত তার আর একটুও ভালো লাগছিল না। যুদ্ধকালীন সে প্রেরণা আর নেই। যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে যে একতা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল সে একতাও আর নেই। রণের শিক্ষা সমস্যা মেটেনি, তাই সেও আর অপেক্ষা করতে পারে না। আবার আকাশপথেই ফেরে। সঙ্গে রণ। কিন্তু বিলেতের ঘরকন্না গুটিয়ে নেয় না। দেশে কাজকর্ম না জুটলে ফিরতে হতে পারে। স্বকুমারও চাকরি ছাড়েনি। ছুটি নিয়েছে।

মুস্তাফীরা একদিন সৌম্যকে ও জুলিকে নিমন্ত্রণ করে এই স্বসমাচার শুনিয়ে দেন। তাঁদের মুখে আহ্লাদ ধরে না। জুলি কিন্তু পুলকিত হয় না। কাষ্ঠ হাসি হাসে। সৌম্য কূটনীতিবিদের মতো দুটি একটি কথা বলে। "তা আপনাদের তো সঙ্গ দরকার। নাতিকে নিয়ে খেলা করবার বয়স তো হলো। মিলিকে নিয়েই ভাবনা। সে বোধ হয় দিল্লী চলে যাবে।"

"স্বকুমার যদি কাজ পায়।" মুস্তাফী বলেন, "নেহরু কি আর সেই নেহরু? বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এখন মথুরার কৃষ্ণ। রাখাল বন্ধুদের যিনি চিনতে পারেন না।"

মিলির মা বলেন, "বেশ তো! মিলি এই সেবা প্রতিষ্ঠানেরই ভার নেবে। তোমারও উচিত জামাইকে বসিয়ে দিয়ে অবসর নেওয়া। কেন ওরা দিল্লী দিল্লী করবে? লণ্ডনে থাকারও কোনো মানে হয় না।"

জুলি প্রমাদ গণে। মিলি আর স্বকুমার যদি এখানেই গুছিয়ে বসে তা হলে আবার না ত্রিকোণ সম্পর্কের স্বত্রপাত হয়। সে মুখ ফুটে কিছু বলে না। সৌম্যর মুখের দিকে তাকায়।

"ওরা কি পাকিস্তানে থাকতে রাজী হবে, যদি পাকিস্তান হয়?" সৌম্য বলে।

বোমা পড়ার আওয়াজ হয়। মুস্তাফী বলেন, "তু তো গান্ধীজীর কাছের লোক বলেই শুনি! তোমার কি মনে হয় তিনি কংগ্রেসকে পার্টিশন মেনে নিতে দেবেন? পার্টিশন কি ভিভিসেকশন নয়?"

"যা বলেছেন, মেসোমশায়। তিনি বেঁচে থাকতে মেনে নিতে দেবেন না। কিন্তু যেমন দেখছি মুসলিম লীগ কিছুতেই কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করবে না। এমন অনর্থ বাধাবে যে ইংরেজকেই অনন্তকাল থেকে যেতে হবে। এত বড়ো একটা মহাদেশের মতো দেশকে তো অরাজকতার কবলে ফেলে রেখে যাওয়া চলে না। তাদেরও তো

বাণিজ্যিক স্বার্থ ব্যাহত হবে। যে কারণে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়েছিল সেই কারণেই হাতে রাখতে চাইবে। কংগ্রেস জেলে ফিরে গিয়ে ক'বছর অপেক্ষা করবে? আরো ছ'বছর? জেল থেকে বেরিয়ে কি দেখবে মুসলিম লীগের চিতাবাঘ তার দাগ মুছে ফেলেছে? পলিসি বদলেছে? নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের জিগীর তুলে কংগ্রেসী মুসলিমদের ভোটে হারাচ্ছে না? তাঁদের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে নিছক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জোরে মুসলিম ভোট পাচ্ছে? অত দূর যেতে হবে কেন, সামনেই তো নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীর অধিবেশন। ওরা যদি যোগ না দেয় অন্যের তৈরি শাসনতন্ত্র কি ওরা গ্রহণ করবে? ওরা চায় আলাদা একটা কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী। আলাদা এক শাসনতন্ত্র। তার তাৎপর্য আলাদা এক রাষ্ট্র। অধিকাংশ মুসলমানেরও যদি সেই দাবী হয় তবে তো ডিভিসেকশন অনিবার্য। কে ওদের উপর গায়ের জোর খাটাবে? গান্ধীবাদীরা তো গায়ের জোরে বিশ্বাসই করেন না। জাতীয়তাবাদীরা করেন, কিন্তু কোথায় তাঁদের গায়ের জোর? কামান বন্দুক তো উভয় পক্ষেরই আছে। সৈনিক আছে উভয় পক্ষের। আসুক মিলি। দেখুক এসে সিপাহী বিদ্রোহের মর্ম কী। সিপাহীর বিরুদ্ধে সিপাহীর বিদ্রোহও কি সম্ভবপর নয়?" সৌম্য উচ্চ স্বরে চিন্তা করে।

"বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও, সৌম্য। নেহরুর সরকারের সৈন্যদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ।" মুস্তাফী বোঝেন।

"জিন্না সাহেবকে সরকার গঠনের ভার দিলেও একই কথা। জিন্না সরকারের সৈন্যদের মধ্যেও অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। নেহরুর বেলা হিন্দু-শিখের বিরুদ্ধে মুসলিম। জিন্নার বেলা মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দু-শিখ। এক্ষেত্রে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টই ডিভিসেকশন এড়াবার একমাত্র উপায়। বড়লাট সেই চেষ্টাই এতদিন করেছেন, কিন্তু জিন্নার নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্যে সফল হননি। উল্টে কংগ্রেসকেই দোষ দিচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেস কেন গ্রুপিং সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করছে না? কেন তার ব্যাখ্যার জন্যে ফেডারল কোর্টে আবেদন করছে? পলিটিকাল ব্যালান্সের কি কোর্টে মীমাংসা হতে পারে? তাঁর মতে আসামকে নিক্তির পাল্লায় না চাপালে ব্যালান্স সমান হবে না। সত্যের খাতিরে আমাকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট চাই তো এক পক্ষের পাল্লা

ভারী হলে মিটমাট হবে না। উভয় পক্ষের পাল্লাই সমান ভারী হওয়া দরকার। এটা জরুরিও বটে। আসামের মায়া না কাটালে পার্টিশন অবশম্ভাবী। তা নয় তো সিভিল ওয়ার। সিভিল ডিসওবিয়েন্সে কাজ হবে না। শহীদ হয়ে আমি কীই বা করতে পারব? বাপুই বা কী করতে পারবেন?"

"শহীদ হবে কে? তুমি? পাগল! তোমার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে। সন্তানের সূচনাও লক্ষ করছি।" মুস্তাফী কানে তুলতে চান না। তাঁর স্ত্রীও না।

এতক্ষণে জুলির মুখ ফোটে। "এই, বাবলীকে তুমি সেদিন যা বলেছিলে তার সঙ্গে তোমার আজকের বক্তব্যের মিল কোথায়?"

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, "আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। নানা জনের সঙ্গে মিশছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার কারবার। তাই আমি আগে যা ভেবেছিলুম তার সঙ্গে এখন যা ভাবছি তার মিল থাকছে না। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করছি যে দেশের স্বাধীনতা একপক্ষের ইচ্ছাতেই সম্ভব হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের একত্ব অপরপক্ষের ইচ্ছাসাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে যেসব মুসলমান ছিলেন তাঁরাও কলকাতার দাঙ্গার পর আমাদের ছেড়ে গেছেন বা যাচ্ছেন। অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের অখণ্ডতা কিসের জোরে টিকবে? ইংরেজদের বেয়োনেটের জোরে? হিন্দু-শিখ তলোয়ারের জোরে? তা হলে অহিংসার মর্যাদা রইল কোথায়? অহিংসার ভবিষ্যৎ কী? বাপু বলবেন, মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তোমরা রামচন্দ্রের মতো বনবাসে যাও। বনবাসে যেতে আমরা রাজী আছি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বসিয়ে দিলে জাতীয়তাবাদের মর্যাদা থাকে না। অহিংসাবাদ হয়তো রক্ষা পেল, কিন্তু জাতীয়তাবাদ মরে গেল। যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে হার মানেনি তারা মুসলিম লীগপন্থীদের সঙ্গে লড়াই না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসরণ করবে। ওরা ভাববে আমরা দুর্বল, আমরা ভীরু, তাই রণছোড়। বলবে, দেখলে তো, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হাতে হাতে ফল। মুসলিম লীগ সিংহাসন জুড়ে বসে দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থে শাসন পরিচালনা করবে না, করবে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থে। তার মিত্র হবে রক্ষণশীল ইংরেজ আর প্রগতিবিমুখ আরব, ইরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি রাজ্য। গণতন্ত্র মেনে চললে অধিকাংশ প্রজার ভোটে আইন পাশ

করাতে হবে, ট্যাক্স ধার্য করতে হবে। সেসব কি সে করবে? আইনসভা ডাকবেই না, কনষ্টিটিউশন তৈরি করবেই না। গণতন্ত্রের মর্যাদা রাখবে না। ভারতের ঐক্য নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদেরও তো মূল্য আছে, গণতন্ত্রেরও তো মূল্য কম নয়। অহিংস নীতি নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু স্বাধীনতার এই পরিণাম দেখে ক'জন অহিংসবাদী অহিংসার ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখবে? আর আমি কি শুধু অহিংসাবাদী? সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদীও নই? গণতন্ত্রেও আস্থাবান নই? দেশ খণ্ড খণ্ড হবে, সেই আশঙ্কায় কি আমি নিজের অন্তরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড হতে দেব? বহু ত্যাগস্বীকারের ফলে আমরা দিল্লীতে প্রোভিজনাল গভর্নমেন্ট লাভ করেছি, বড়লাটের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালাবার এমন সুযোগ এর আগে পাইনি, কথাবার্তা নিষ্ফল না হলে আমরা ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকব। তার পরের দিন থেকে উত্তরাধিকারী হব। নিষ্ফল হলে অবশ্য গদী ছেড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়ব। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নয়। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগকেও ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে। তাতে ওদের মন না ভরলে রাজ্যের ভাগ দিতে হবে! হয়তো প্রদেশেরও ভাগ। যেসব অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি সেসব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হবে। নিরুপায়।"

"সে কী?" জুলি আঁতকে ওঠে! "সীমান্ত গান্ধীকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেবে? মহাত্মা গান্ধী রাজী হবেন?"

"আটকাচ্ছে তো সেইখানেই। পাঞ্জাবকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে সে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নেহরু ও পাটেল এতে রাজী হলে বাপু নিজের মত চাপিয়ে দেবেন না। সাধারণ অবস্থায় তিনি শুধু পরামর্শদাতা। অসাধারণ অবস্থায় সেনাপতি।" সৌম্য যত্ন করে বোঝায়।

মুস্তাফী মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস তো আর মুসলিম লীগ নয় যার এক হাতে পুলিশের ব্যাটন, আরেক হাতে গুণ্ডার ছোরা। কে কাকে ঠেকাবে? আমাদের কপালে কী আছে ভেবে ভয়ে ভয়ে রয়েছি। কংগ্রেস দিল্লীর মসনদে বসেছে বলেই এখনো এখানে বাস করছি, কংগ্রেস যদি মসনদ ছাড়ে আমরাও পূর্ববঙ্গ ছাড়ব। আশা করি কলকাতা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সেখানে আমাদের একটা আস্তানা আছে, জানো। কলকাতা যদি গুণ্ডাদের রাজধানী হয় তবে আমরা লণ্ডনে গিয়ে সুকুমারের আস্তানায় মাথা গুঁজব।"

দিন কয়েক পরে সুকুমার এসে সশরীরে উপস্থিত। সঙ্গে মিলি আর রণ। ওদের কলকাতায় রিসিভ করেছে সুকুমার।

ওরা একদিন কুটির দেখতে আসে। মিলি জুলিকে দুই হাতে জড়িয়ে চুমুর পর চুমু খায়। ''ওই চমৎকার ইভেণ্টটি কবে নাগাদ ঘটবে রে, মেয়ে? আহা, ব্রহ্মচর্যের কিবা মহিমা! ভার্জিন বার্থ নয়তো?''

জুলি ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দেয়। "নিজের কথা ভেবে ছাখ। কোথায় তোর চিরকুমারী ব্রত?"

দু'জনেই হাসাহাসি করে লুটোপুটি খা'। তার পর জুলি রণকে আদর করতে বসে। মিলি ঘুরে ফিরে দেখে। টয়লেট দেখে বলে, "বিলেতের কটেজেও এমনটি দেখা যায় না।"

ওর বাড়া সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? জুলি ধন্য হয়ে যায়।

ওদিকে সুকুমার বলছিল সৌম্যকে, 'না, ভাই, চাকরি জোটাতে পারিনি। মোগল যুগের দরবার। সব ধরাধরির ব্যাপার। কাকে ধরলে কী মেলে তা জানতে হলে আরো কয়েক মাস দিল্লীতে থাকতে হয়। ততদিন কংগ্রেস পরিচালিত গভর্নমেণ্টটাই থাকবে কি-না সন্দেহ। নেহরু এখন পরম অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। বড়লাট রোজ মনে করিয়ে দিচ্ছেন মুসলিম লীগকে বখরা না দিলে ওরা জেহাদ ঘোষণা করবে। মুসলিম রেজিমেণ্টগুলো কণ্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। দিল্লীর ভিতরের খবর মুসলিম লীগ ইণ্টারিম গভর্নমেণ্টে আসছে। ওরা এলে ওরাও চাকরির বখরা চাইবে। আমার কতটুকু আশা?''

সৌম্য আশ্বাস দেয়, ''চাকরির দরকার কী? তোমার শ্বশুরের প্রতিষ্ঠান তোমরাই চালাবে। তুমি হবে সেক্রেটারি, মিলি হবে ডাইরেক্টর, কিংবা মিলি হবে সেক্রেটারি, তুমি হবে ডাইরেক্টর। পারিশ্রমিক যা পাবে তাতেই তোমাদের চলে যাবে। একটিই তো সন্তান।"

"হুঁ। প্রস্তাবটা নতুন নয়। কিন্তু এই অধমেরও আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকতে পারে। সে ঘরজামাই হতে যাবে কোন দুঃখে। লণ্ডনে তার নিজস্ব আস্তানা রয়েছে। উপার্জন আছে। ক্রিপস থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাকে এক ডাকে চেনেন। ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের সে মেম্বর। ফেবিয়ান সোসাইটিতেও তাঁর যাতায়াত আছে। ইণ্ডিয়া অফিস আর ইণ্ডিয়া হাউস দুই জায়গাতেই তার কনট্যাক্ট রয়েছে। সে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম যদি উভয় পক্ষ মেনে না নেয় তবে পূর্ণাঙ্গ পাকিস্তানেরই

ভাগে পড়বে। তাই এখানকার সম্পত্তির উপরে তার একরত্তিও লোভ নেই। মিলি যদি রাখতে চায় রাখবে। বেচতে চায় বেচবে। আর মেসোমশায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা একটা পাবলিক ট্রাস্ট। ট্রাস্টীরা মেসোমশয়ের অবর্তমানে মিলিকে বা আমাকে সেক্রেটারি বা ডাইরেকটর পদে বহাল রাখবেন কি না তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ পাকিস্তানী আমলে। আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো ওটাকেও ওরা ইসলামাইজ করবে। পাকিস্তান মানেই তো মুসলিমদের জন্যে মুসলিমদের দ্বারা শাসিত মুসলিমদের রাষ্ট্র। স্থানীয় হিন্দু প্রধানরা এখন থেকেই কলকাতায় বাসা খুঁজছেন। তাঁদের আশঙ্কা এবার ঢাকায় বা চটগ্রামে হাঙ্গামা বাধবে।" সুকুমার এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"যাতে না বাধে তার জন্যেও স্থানীয় অফিসাররা সজাগ রয়েছেন। ডাইরেকট অ্যাকশন ডে এখানে শান্তিপূর্ণ ছিল। দোসরা সেপ্টেম্বরের শোকদিবসও শান্তিতে কেটেছে। তাঁরা সবাই চান কংগ্রেসের সঙ্গে আপস। কট্টর লীগপন্থীদের আপসবিরোধী পলিসি তাঁরা সমর্থন করেন না। হিন্দু মুসলমান বরাবর একসঙ্গে বাস করেছে, বরাবর একসঙ্গে বাস করবে। এটা যেমন আমাদের কথা, তেমনি ওদেরও কথা। কট্টর মুসলিমদের নিয়ে ওদের যেমন মুশকিল কট্টর হিন্দুদের নিয়ে আমদেরও তেমনি মুশকিল। এক হাতে তালি বাজে না। আরেক পক্ষ পাল্টা না দিলে দাঙ্গা জমে না। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বাধলে হিন্দুর পক্ষে শোচনীয় হবে, তাই হিন্দুকেই হতে হবে যথাসম্ভব অহিংস। রামকে রহিম মারলে রাম রহিমকে আত্মরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু মারতে পারে, কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্যে করিমকে বা আবদুল্লাকে মারবে না। নির্দোষ মুসলমানকে মারার মধ্যে বিন্দুমাত্র পৌরুষ নেই। তেমনি নির্দোষ হিন্দুকেও।" সৌম্য হিংসার সীমা বেঁধে দেয়।

কৃষ্ণ মেননকে জবাহরলাল তাঁর পর্যটক প্রতিনিধি করে নিউ ইয়র্ক ও মস্কো পাঠাতে চান। তার পরে চান লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার করতে। বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবরটা পেয়ে সুকুমার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে উড়ে যায়। মিলিকে ও রণকে মুস্তাফীদের হেফাজতে রেখে। মুরুব্বি না থাকলে বা লবিতে না ভিড়লে দিল্লীতে কিছুই হবার জো নেই। হবার থাকলে হাই কমিশনারের ব্যক্তিগত অনুরোধে হবে। নয়তো ইণ্ডিয়া হাউসেই মেনন ওকে কোনো এক চেয়ারে বসিয়ে দেবেন। ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে লিয়াজঁ রক্ষা করতে।

মিলি এর পর থেকে জুলির সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে। দু'জনায় গলাগলি ভাব। একদা ওদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারত, সুখী ভারত। যার জন্যে ওরা জীবন পণ করেছিল। সে স্বপ্নের কতটুকু বাস্তব হয়েছে? স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ততই বেড়ে যাচ্ছে। দেশ বোধহয় অখণ্ড থাকবে না, প্রদেশও খণ্ডিত হবে বোধ হয়। আর সুখ? একজনও কি আছে যাকে সুখী বলতে পারা যায়? সর্বক্ষণ ভয়। মিলির মা বাবা ভয়ে ভয়ে আছেন, প্রতিষ্ঠান ভয়ে ভয়ে চলছে। মিলি যদি এখানেই থেকে যায় ভয় নিয়েই ঘর করবে। জুলিই বা নির্ভয়ে থাকবে কী করে? নোয়াখালীতে কী হয়েছে শোনেনি?

নোয়াখালীর বিবরণ খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হবার আগেই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সৌম্যর কানে আসে। সে সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ নিয়ে নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। সেখানকার গান্ধীবাদী কর্মীদের সঙ্গে তার আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। বিবরণটা তারাই পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতার কাগজে লিখেছে পাঁচ হাজার হিন্দু খুন হয়েছে, তাদের সোনাদানা গোরু জরু লুট হয়েছে, বাড়ীঘর পোড়ানো হয়েছে। যারা প্রাণ হারায়নি তারা ধর্ম হারিয়েছে। ধর্মস্থান হারিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে ও ধর্ম বাঁচিয়েছে বিশ হাজার কি ত্রিশ হাজার। সম্পত্তির ক্ষতি অপরিমেয়। জমি বেদখল হয়েছে। হিন্দুদের সমূলে উৎপাটন করাই পলিসি। এটা বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই সাধিত হয়েছে। সহসা ঘটে গেছে তা নয়। পেছনে মাথা আছে। অথচ মুসলিম লীগ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এসব ওঁদের কাজ নয়, ওঁদের কোনো শত্রুর কাজ। তার জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

সৌম্য এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেছে। কাউকে দোষ দেয়নি। মুসলিম লীগকেও না, তার তথাকথিত শত্রুকেও না। সে সরেজমিনে তদন্ত করবে ও তার তদন্তের ফল সরাসরি দিল্লীতে বাপুকে জানাবে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। তার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরে আনতে পারেন। ব্রিটিশ শাসন তো এখনো হস্তান্তর হয়নি।

বাপু যে এতদিন দিল্লীতে আটক রয়েছেন এটার কারণ মুসলিম লীগকে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ভিতরে আনার জন্যে বড়লাটও সচেষ্ট, কংগ্রেসও সচেষ্ট, গান্ধীজীও সচেষ্ট। লীগের দিক থেকেও সাড়া পাওয়া গেছে, কিন্তু শর্তে

বনছে না। সেইজন্যে দেরি হচ্ছে। লীগ যেদিন গভর্নমেণ্টে যোগ দেবে বাপু তার পরের দিনই নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হবেন। ইতিমধ্যে লীগ একটা চমক দিয়েছে। তার জন্যে বরাদ্দ একটা আসন সে একজন হরিজনকে দিতে চেয়েছে। কংগ্রেস যদি একজন মুসলমানকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারে লীগও কেন একজন হরিজনকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারবে না? জিন্না সাহেব স্বয়ং যোগ দিতে চান না। বড়লাট দুঃখিত।

মোহিনীবাবুর মুখে মোনা লিসার হাসি। সৌম্য সুধায়, "এর অর্থ কী, কাকা? হর্ষ না বিষাদ?"

তিনি চোখ বুজে বলেন, "একই সঙ্গে দুই। গত দু'শ বছরের মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম পুরোপুরি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হচ্ছে। বড়লাটকে বাদ দিলে সব ক'জন ক্যাবিনেট মেম্বরই ভারতীয়। জঙ্গীলাটেরও আসন নেই। তাঁর উপরওয়ালা সর্দার বলদেও সিং। এই পরিবর্তনটি সাত বছর আগে ঘটলে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত মধুর হতো! এটা বিস্ময়কর অগ্রগতি, যদিও বিলম্বিত। এখন গভর্নমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া বলতে বোঝায় গভর্নমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়ানস। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে যে আমল ছিল সে আমলের পাঁচশো বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুদেরই স্থান ছিল না। আকবরের রাজত্বই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে জাহাঙ্গীরের দরবারেও হিন্দুদের প্রতিপত্তি ছিল। এখন হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী সবাইকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে। সবাই যদি ট্যাক্স দেয় তো সবাই পাবে ট্যাক্স ধার্য করার অধিকার। এরই নাম জাতীয় স্বাধীনতা। কত বড়ো পরিবর্তন! তার পর এটাও মনে রেখো। মুসলমানী আমলের আগে যতবার কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে ততবার শুধু উত্তর ভারতীয়দের নিয়েই। দক্ষিণের লোকের তাতে কোনো অংশ ছিল না। তা হলে দেখছ আড়াই হাজার বছরে এই প্রথম উত্তর-দক্ষিণবাসীরা পাশাপাশি বসে ভারত শাসন করছে। তার পর আরো আশ্চর্যের কথা, আর্যশাসিত ভারতে ক্ষত্রিয় রাজন্যরা অনার্য বা অস্পৃশ্যদের পায়ের তলাতেই রাখতেন। এখন দু'জন অস্পৃশ্য গদীতে চড়ে বসেছেন। তিন হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটল।"

সৌম্য স্বীকার করে। "তা হলে বিষাদ কেন?"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "ছাখো, সৌম্য, সরকার গঠন করা

যত না কঠিন তার চেয়েও কঠিন তাকে টিকিয়ে রাখা। সমবেত দায়িত্ব ছাড়া সরকার টেকে না। ঘোড়ার গাড়ীতে চারটে ঘোড়া জুততে পারা যায় কিন্তু চার ঘোড়া যদি চার দিকে দৌড়য় তবে গাড়ী ভেঙে খান্ খান্ হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার চালাবার জন্যে যোগ দেয়নি, বানচাল করবার জন্যেই ঢুকেছে। চালাবার উদ্দেশ্য থাকলে জিন্নাকে পাঠাত, নাজিমউদ্দীনকে পাঠাত। তাঁদের বদলে পাঠিয়েছে বান্দি মালকে। তা দেখে বড়লাট পর্যন্ত স্তম্ভিত। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুদক্ষ রাজনীতিক বা প্রশাসক নেই। এক লিয়াকৎ আলী খান্ বাদে।"

নোয়াখালী ঘুরে এসে সৌম্য বলে জুলিকে, 'যত রটেছে তত ঘটেনি। অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়ে বিহারী হিন্দুরা অতিমাত্রায় প্রতিশোধ নিয়েছে। কী করি, বলো তো? আমার বাড়ী বিহারের দেহাতে। আমার মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? কী তাদের অপরাধ? উদোর পিণ্ডি কেন বুধোর ঘাড়ে পড়বে? ভাবছি বিহারে গিয়ে দেখি কী করতে পারি। তোমার আপত্তি নেই তো, লক্ষ্মীটি?"

"সে কী কথা! তুমি বিহারের অন্নজলে মানুষ হয়েছ। তোমার প্রাথমিক কর্তব্য বিহারে গিয়ে হিন্দুদের শান্ত করা, মুসলমানদের অভয় দেওয়া। নোয়াখালীর প্রতিশোধ বিহারী হিন্দুরা নিয়েছে, যেমন কলকাতার প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালীর মুসলমানরা। এর পর কি পাঞ্জাবের মুসলমানরা নেবে বিহারের প্রতিশোধ? এই হিংসা প্রতিহিংসার কি সীমা আছে না শেষ আছে? বাপু এ বয়সে ক'টা জায়গায় যাবেন? ক'টা দিক সামলাবেন? তিনি বুড়ো হয়েছেন। তোমরা তাঁর জোয়ান ছেলেরাই তো ছোটাছুটি করবে। পারলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতুম। কিন্তু [illegible] পারছিনে তা তুমি জানো। যেটি আসছে ছোটাছুটি করে সেটিকে অকালে হারাতে চাইনে। আপত্তি নয়, অনুরোধ, আমাকে তুমি এখানে একলা ফেলে যেয়ো না, কলকাতায় মার কাছে রেখে যেয়ো।" জুলি বলে।

সৌম্য রাজী হয়। খবরটা শুনে মিলি ছুটে আসে ঝগড়া করতে। "এই মেয়ে, তুই তো আমার মায়ের কাছেই অনায়াসে থাকতে পারতিস্। সেবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তোর মতো মেয়েদের সেবা করতে। আমি রয়েছি তোকে সঙ্গ দিতে। না, আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছিনে। দেশের স্বাধীনতা আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। দাঙ্গাহাঙ্গামাই তো শেষ কথা নয়। স্বাধীনতাই শেষ

কথা। এর পরে যখন বিলেত যাব তখন স্বাধীন দেশের নাগরিক রূপেই যাব। ব্রিটিশ প্রজা রূপে নয়।”

“আমি, ভাই, ওসব এখন ভাবতেই পারছিনে। আমার বরের সঙ্গে এই প্রথম আমার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পারলে ওর সঙ্গে আমিও বিহারে যেতুম। দেশের মানুষকে আগে প্রাণে বাঁচতে দে। বেঁচে থাকলে তো স্বাধীনতার মুখ দেখবে। প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মানও বাঁচাতে হবে। আচ্ছা, ভাই, মেয়েগুলোর কী অপরাধ? ওদের কেন ধরে নিয়ে যায়? যেমন নোয়াখালীতে তেমনি বিহারে। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারছিনে। কেন তা তুই জানিস। এ অবস্থায় জ্বলে ওঠা কি ভালো?” জুলি ব্যাকুলভাবে সুধায়।

“না, ভালো নয়। সাবধানে থাকিস্ ও রাখিস্। শোন, আমি যা দেখেছি তা তুই দেখিস্ নি। মহাযুদ্ধ। এ যা দেখছিস্ তা মহাযুদ্ধ নয়, ছিঁচকে যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ তো। যুদ্ধে কী না হয়? অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ্ অ্যাণ্ড ওয়ার। খুন জখম, লুটতরাজ, ঘর জ্বালানো, নারীহরণ। সেকালে সীতাকেই উল্টে সাজা দেওয়া হয়েছে। একালে আমরা বিপ্লবী কন্যারা সে অবিচার উল্টে দিতে চাই। বিপ্লব বলতে বোঝায় ওলট পালট। অযোধ্যার লোকের ন্যায় অন্যায় বোধের ওলট পালট ঘটাতে হবে। উদ্ধারের পর সীতাদের কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে। কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। অগ্নিপরীক্ষা তো দূরের কথা। বনবাস তো কিছুতেই না। সসম্মানে পরিবারে ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাস্নে, জুলি। তুই গেলে আমি কার কাছে বল পাব?” মিলি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

॥ তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥